একটু উষ্ণতার জন্যে

বুদ্ধদেব গুহ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবল্যু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

ভবিষ্যতের কোনো এক পড়ন্ত পৌষের শান্ত সুন্দর বিকেলে, মৃত ব্যাঙের মত শীতল আমার স্তব্ধ হৃদয়কে যারা তাদের নির্দয় ঠোঁটে উপড়ে নিয়ে আছড়ে ফেলবে তোমার অন্তরের অন্তঃপুরের বন্ধ জানালায়, যারা তোমার উদ্দাম ইচ্ছার দূতী, তোমার হীন স্বার্থপরতার বাহক—সেই সব যূথবদ্ধ আশ্চর্য নিষ্ঠুর পিঙ্গল ঈগলদের উদ্দেশ্যে :

আমার স্পন্দিত হৃদয়ের অনুযোগহীন সমস্ত উষ্ণতার সঙ্গে ; অতীতের ক্বচিৎ উষ্ণতার স্মারক আজকের এই পাণ্ডুর পাণ্ডুলিপি।

"Sweet heart, do not love too long:
I loved long and long,
And grew out of fashion
Like an old song."
—W. B. YEATS

॥ এক ॥

দিনের শেষ গাড়ি মরা বিকেলের হলুদ অন্ধকারে একটু আগে চলে গেছে।

এখন প্লাটফর্মটা ফাঁকা।

এখানে ওখানে দু-একজন ওঁরাও মেয়ে-পুরুষ ছড়িয়ে আছে। কার্নি মেমসাহেবের চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। আসন্ন সন্ধ্যার অস্তমিত আলোয় প্লাটফর্মের ওপারের শালবনকে এক অদ্ভুত রহস্যময় রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে বেলাশেষের গান শোনা যাচ্ছে।

স্টেশানের মাস্টারমশাই বললেন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি বললাম, কি দরকার?

আরে তাতে কি? আপনি এখানের বাসিন্দা ত' নন, নতুন এসেছেন—জঙ্গলের পথঘাট ভাল জানা নেই। চলুন, চলুন, আমার কোনো কষ্ট হবে না, তাছাড়া আমি ত' হাঁটতে বেরোতামই,—এ বয়সে একটু হাঁটা দরকার।

বললাম, বেশ, চলুন তাহলে।

স্টেশান থেকে বেরিয়ে শেঠ মুঙ্গালালের দোকান পেরিয়ে হালুইকরের দোকানের সামনে দিয়ে পোস্টাফিসের গা-ঘেঁষে পেছনের মাঠটায় এসে পড়লাম আমরা।

মাঠের ওপারে দীপচাঁদের দোকানের আলো জ্বলে উঠেছে—।

বেশ অনেকখানি হাঁটতে হবে।

মাস্টারমশাই বললেন, শরীর কেমন বোধ করছেন আজকাল? এইসব পাকদণ্ডী পথ দিয়ে যাওরা আসা করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

আমি হাসলাম. বললাম, মান্দারের হাসপাতালের সাহেব ডাক্তার ত' বললেন, যতখানি পারি হেঁটে বেড়াতে, শরীর যে খারাপ হয়েছিল, কখনো বড় অসুখে পড়েছিলাম, এসব কথা একেবারে ভুলে যেতে।

ওঃ—। তাই বুঝি। তাহলে ভাল। তারপর আবার বললেন, এখানে সব উঁচু নীচু পাহাড়ি রাস্তা ত, তাই-ই বলছিলাম।

দেখতে দেখতে আমরা দীপচাঁদের দোকানের সামনে এসে পড়লাম, তারপর একটা ছোট বস্তী পেরিয়ে মোড়ের পোড়ো বাড়ির পাশ কাটিয়ে গ্রামের পাকদণ্ডীতে এলাম।

সামনে একটা বড় ঝাঁকড়া মহুয়া গাছ। মাঝে মাঝে পিটিস্ এবং ঝাঁটি জঙ্গল। পশ্চিমের পাহাড়ের কাঁধ বরাবর সন্ধ্যাতারাটা উঠেছে। সমস্ত আকাশ সেই একটি তারার আলোয় উজ্জ্বল।

হাতের লাঠি ঠকঠক করতে করতে আগে আগে চলতে চলতে মাস্টারমশাই বললেন, আপনি তখন নিশ্চয়ই কিছু মনে করলেন না? কি বলেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কই? কখন?

ঐ যখন ঘোষকে ধমক লাগালাম আমি।

আমি বললাম, ঘোষ মানে? শৈলেন ঘোষ?

উনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আমি বললাম, না, না, মনে করব কেন? তাছাড়া আপনাদের নিজেদের মধ্যের কথায় আমার মনে করার কি আছে?

মাস্টারমশাই উত্তপ্ত গলায় বললেন, নাঃ এ ছাওয়াল-পাওয়ালগুলোকে শুধরানো যাইব না—যা মাইনা পাইতাছে তা এই জাগায় খাইয়া পইড়্যা থাকার পক্ষে যথেষ্ট। অথচ এই চেঞ্জারদের দেইখ্যা দেইখ্যা ওদেরও কম্পিটিশনে নামন লাগব। জব্বর জব্বর জামা-কাপড়, লটর-পটর জুতা, কান ঝালাপালা ট্রানজিস্টর সবই ওদেরও চাই। কিছুই না অইলে নয়। নাই, নাই কইরাই এগো পরানডা গেল।

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলাম।

মাস্টারমশাই ফরিদপুরের লোক। কালীভক্ত, হোমিওপ্যাথী করেন; ব্যাচেলর।

চেঞ্জারদের উপর ওঁর খুব রাগ। এখানের এই নির্লিপ্ত খুশী জীবনে, চেঞ্জাররা এসে চাহিদার জ্বালা জ্বালিয়ে যায়। একথা তিনি প্রায়ই বলেন।

এবার সামনে সেই নালাটা এসে গেল। নালাটা পেরিয়ে অনেকখানি খাড়া উঠতে হয়। ও জায়গাটাতে এসে এখনও বুকে বেশ হাঁপ ধরে। এখানে এলে বুঝতে পাই যে, এখনো পুরোপুরি ভাল হইনি আমি, এখনও রাজরোগের রেশ ছাড়েনি আমাকে।

চড়াইটা উঠে এসেই সেই সাদা পোড়ো বাড়িটা। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারুণ দেখায়। এখানের অনেকে বলেন যে, এটা ভূতের বাড়ি। মাস্টারমশাই হাতের লাঠিটা উঁচু করে ওদিকে দেখিয়ে বললেন, এই যে সেই বাড়ি।

মাস্টারমশাইকে শুধোলাম, এখান দিয়ে রাতে একা যেতে আপনার ভয় করে না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই সায়ান্ধকারে কাঁচা-পাকা চুলেভরা প্রকাণ্ড মাথাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, বুঝলেন কিনা ভাই, আমি হইলাম গিয়া কালীভক্ত লোক—মায়ের পূজা করি—ভূতপেত্নী লইয়াই আমাগো কারবার।

সাদা পোড়োবাড়ি পেরুনোর পর পথটা সোজা চলে গেছে খোয়াই-ভরা টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে। বাঁদিকে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ। সামনেতে এখন সর্ষে বুনেছে ওঁরাওরা। অন্ধকারে সব সমান মাঠ বলে মনে হচ্ছে।

পথের ডানদিকে চার-পাঁচ ঘর লোকের বাস। ওরাও সকলে ওঁরাও। ওদের পোষা শুয়োর বাড়ির সামনের গোবর লেপা উঠোনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ফারিয়া কুকুরের বাচ্চা হয়েছে, বারান্দার খড়ের মধ্যে শুয়ে বাচ্চোগুলো কুঁই কুঁই করে ডাকছে। অন্ধকারে সর্ষে ক্ষেতের গন্ধ আর এই টুকরো টুকরো শব্দসমষ্টি দারুণ লাগছে।

সর্ষে ক্ষেত পেরিয়ে, অন্ধ জাবু ওঁরাও-এর ঘরের পাশ দিয়ে আবার ঝাঁটি জঙ্গল ভেদ করে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে এসে উঠলাম। মাস্টারমশাই চা না খেয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি জোর করে ধরে আনলাম, বললাম, চা না খেয়ে যাওয়া চলবে না।

তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন। লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেলেন। চলতে চলতে, মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, জয় মা, তোর জয়।

এখানে সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই। আমার প্রতিবেশী যাঁরা, তাঁরা সকলেই বেশী বয়সী। মানে নিকট প্রতিবেশীরা। তাঁরা প্রায় সকলেই হয় এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, নয় বিদেশী। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাপার খেয়ে শুয়ে পড়েন।

লালি রেঁধেবেড়ে দেয়। আমিও সকাল সকাল খেয়েদেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। বইপত্র এখানে পাওয়ার উপায় নেই। কর্ণেল ম্যাকফারসনের লাইব্রেরী আছে, খুবই ভালো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ এমন ঘনিষ্ঠ হয়নি যে বই চেয়ে পড়ি। কলকাতা থেকে যেগুলো এনেছিলাম সেগুলো বহুবার পড়া হয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যে হলেই নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে হয়। যার শরীর অসুস্থ, অসুস্থ মানে বহু দিন ধরে অসুস্থ, যার মনে কোনো আনন্দের আভাস মাত্র অবশিষ্ট নেই, তার পক্ষে এরকম নির্জন জায়গায় একা একা সন্ধ্যে কাটানো শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাঝে মাঝে ভাবি, ভাল হয়ে গিয়েই বা কি করব। ভাল হয়ে কোলকাতায় ফিরে আবার ত' সেই জীবনেই প্রবেশ করব। যাদের সঙ্গে আমার কোনো আত্মিক যোগ নেই, কোনো সত্যিকারের সখ্যতা নেই, তাদের মধ্যে থেকে, তাদের জন্যে আবার সেই দাসত্ব করব, করব রোজগার, রোজকার দস্তুরের দাগা বুলোব। সেও ত' আরেক মৃত্যু। আমার সামনে বোধহয় শুধু বহু মৃত্যুর দ্বারই খোলা আছে। আমার শুধু এখন পথ বেছে নিতে হবে কোন্ মৃত্যু আমার পক্ষে সহনীয় এবং বরণীয়।

॥ দুই ॥

এ জায়গাটায় সকাল হয় না, সকাল আসে। অনেক শিশিরঝরানো ঘাসে ভেজা পাহাড়ি পথ মাড়িয়ে অনেক শঙ্খিনী নদী পেরিয়ে সোনা-গলানো পোশাক পরে সকাল আসে এখানে।

কম্বলের নীচে শুয়ে আমার ঘরের টালির ছাদের ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভাস দেখা যায়। চতুর্দিক থেকে পাখি ডেকে ওঠে। বাড়ির পেছনের পিটিস্ ঝোপে ভরা টাঁড়ে তিতিরের আড্ডা। ঝগড়াটি তিতিরগুলোর গলা সবচেয়ে আগে শোনা যায়। তারপর টিয়া, ঘুঘু, বুলবুলি, টুনটুনি, মৌটুসী আরো কত রকম পাখি এসে পেয়ারা গাছে, আতা গাছে, ফলসা গাছে, চেরী গাছে এমন কি বাবুর্চিখানার পাশের কারিপাতা গাছে বসেও ঝাঁপাঝাঁপি করে।

সেই প্রচণ্ড সুস্থ ও আনন্দিত প্রাণতরঙ্গের মধ্যে, দিগ্বিদিকে শিহরিত ও আলোকিত শব্দলহরীব মধ্যে এই অসুস্থ আমি চোখ মেলি। শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে রোদে দাঁড়াই।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের প্রতিটি সকাল আমার জন্যে যেন কী এক আনন্দের পসরা সাজিয়ে আনে। প্রতিদিন এই ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে পূবের ও পশ্চিমের পাহাড়ের রোঁয়া-রোঁয়া সবুজের দিকে তাকিয়ে আমি বারে বারে নিজেকে ভুলে যাই।

রোজ প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে পেয়ারাতলায় বেতের চেয়ারে বসি। মালি ঐখানেই চা এনে দেয়। রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকি। রোদটা একটু চড়লে, গ্রীবায় রোদ পড়লে আরামে চোখ বুজে আসে—তখন ইচ্ছে করে আরেকবার ঘুমাই।

মালু মালির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছগাছালির তদারকি করি। বাড়ির সবুজ হাতার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে হয় পৃথিবীতে এই একমাত্র জায়গা—। এই গাছগুলি, এই পুরানো, খসে-পড়া টালির ছাদের ভাড়া বাড়ি, এই পাখিদের জমিদারী এইটুকুই একান্ত করে আমার। আমার ক্ষণকালের একার। এছাড়া আমার জীবনে নিজের বলতে কিছুই নেই; না কোনো জিনিস, না কোনো জন।

আমগাছগুলোর তলায় একটা দোলনা টাঙানো আছে। কখনো কখনো সেখানে গিয়ে বসি একা একা। এই দোলনায় যে বা যারা এসে বসলে আমি ভীষণ খুশি হতাম তারা কেউ আসে নি এখানে। হয়ত আসবেও না। তাদের ভাল লাগে না জঙ্গল। ভালো লাগে না এই জংলী পরিবেশ, আরো বেশী করে ভালো লাগে না হয়ত আমার সঙ্গ।

দোলনায় বসে হল্যান্ড সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে-আনা বাসি খবরের কাগজ পড়ছি, এমন সময় কুয়োতলার দিক থেকে কাদের যেন একটা গরু ঢুকলো হাতার মধ্যে।

ওদিকে মালু বেগুন আর টোম্যাটো লাগিয়েছিল। মালুকে ডাকতেই, মালু দৌড়ে গিয়ে তাড়িয়ে দিল গরুটাকে।

গরুটা কাঁটাতারের বেড়া পেরুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারের পাশে একটি ছোট ছেলে এসে দাঁড়াল।

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চিরুনি ও তেল পড়েনি বহু বছর প্রায়—পরনে ছেঁড়া জামা—কোনো প্রমাণ সাইজের ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে পরেছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা রুক্ষতা যে কি বলব।

মালুকে শুধোলাম, এ ছেলেটি কে?

মালু বলল, লাবু বাবু।

লাবু বাবু কে?

লাবু বাবু, ডাবু বাবুর ভাই।

মালুর উত্তরে কিছুই পরিষ্কার হলো না, বললাম, ডাকো ত' লাবুবাবুকে।

প্রথমে লাবুবাবু আসতে চাইল না, শেষকালে যখন এসে আমার সামনে দাঁড়াল তখন দেখলাম তার দু চোখে ভয়ের ছায়া।

বয়স দশ-এগারো হবে, হাতে গরু তাড়াবার ছোট একটি লাঠি। নীচের ঠোঁটটি ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। রক্তাক্ত দেখাচ্ছে ঠোঁটটা। চোখ দুটো কটা কটা। সমস্ত শরীর এখানের প্রচণ্ড শীতে শীতার্ত।

শুধোলাম, তোমার নাম কি?

লাবু।

কোথায় থাক?

ঐখানে। কর্ণেল সাহেবের বাড়ির পাশে।

বাড়িতে কে কে আছেন?

মা, আর দাদা।

বাবা নেই?

না। বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছেন।

লাবু ভাংগা ভাংগা বাংলা বলছিল। বাংলা শুনে মনে হয় না যে বাংগালী। লাবু বলল, ওর ভার গরু চরানো, গরমের সময় মহুয়াও কুড়োয়। ওদের অনেক জমি আছে। নিজেরা লাঙল দেয়, নিজেরাই গরু দোয়ায়, চাষ করে। লাবুর দাদা ডাবু খিলারির স্কুলে পড়ে। লাবু চুরি করে একদিন আচার খেয়েছিল, তাই তার দাদা তাকে শানবাঁধানো বারান্দায় আছাড় দেওয়াতে তার ঠোঁট কেটে যায়। ঠান্ডায় তাই ঠোঁটখানির অমন বীভৎস অবস্থা।

লাবুকে শুধোলাম, তুমি আসছিলে না কেন? তোমাকে যখন ডাকছিলাম?

লাবু স্বীকারোক্তি করল, গরু ঢুকেছে বলে আমি যদি মারধোর করি সেই ভয়ে ও আসতে চাইছিল না। গরুগুলো ধরে খোঁয়াড়ে দিলেও বিপদ হত।

লাবুকে বিস্কিট খাওয়ালাম। বললাম, তুমি কি কি খেতে ভালবাস?

ও বলল, কিছু না। তারপর অনেক পীড়াপীড়ি করাতে বলল, ছোলার ডাল আর রসগোল্লা।

আমি হেসে বললাম, আচ্ছা তোমাকে আমি ছোলার ডাল আর রসগোল্লা খাওয়াব। লাবুকে বললাম, আমি তোমার দাদার মত। যখনি ইচ্ছে করে চলে এসো, তোমার সংগে গল্প করব, আমাকে ভয় পেও না, বুঝলে?

লাবুর কথাটা বিশ্বাস হলো না। দুই ছেঁড়া পকেটে দু' হাত গলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তারপর বলল, আসি, কেমন?

লাবু চলে যাওয়ার পর দুখন মাহাতো কংকা বস্তী থেকে মাটির হাঁড়িতে দুধ নিয়ে এল। কার্নি মেমসাহেবের লোক কালো টিনের বাক্স মাথায় করে পাঁউরুটি আর খাস্তা বিস্কুট দিয়ে গেল। কসাই হানিফ; সব্জীওয়ালা রহমান এল। রহমান পাকদন্ডী পথে এগারো মাইল পায়ে হেঁটে প্রতি সোমবার স'সের হাটে যায়, সেখান থেকে সব্জি কিনে বাঁকে করে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাড়ি বাড়ি সব্জী বিক্রী করে।

ম্যাকলাস্কিতেও হাট বসে—শুক্রবারে, হেসালঙে।

হেসালঙ্, লাপ্‌রা এবং কংকা এই তিনটি বস্তী নিয়ে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। আমি যে অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, সে অঞ্চলের নাম কংকা।

স্টেশান, বেশীর ভাগ দোকানপাট যেখানে সেদিকটার নাম লাপ্‌রা। আর খিলাড়ির দিকের রাস্তার গাঁয়ের নাম হেসালঙ্।

হেসালঙের বসতির দিকটা ফাঁকা ফাঁকা—জংগল ওদিকে গভীর নয়। লাপরার দিকে ত' জংগল নেই বললেই চলে।

জংগলের মধ্যে দিয়ে লালমাটি ও পাথর ভরা যে অসমান পথটা চামার দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার দু-পাশে লাল টালির ছাদওয়ালা সব বাংলো। এ বাড়িতে আসতে সেই কাঁচা রাস্তা ছেড়ে আরো ভিতরে ঢুকতে হয়।

চতুর্দিকে শাল সেগুনের জংগল। আর পিটিস এবং নানারকম জংলী ফুল। এখানে এখন একরকম জংলী হলুদ ফুল হয়, সানফ্লাওয়ারের মত। বাড়ির পেছনদিকটা সেই ফুলে ছেয়ে গেছে। হাজার হাজার ফুল পাকদন্ডী পথটার দু' পাশে ভরে আছে। চোখ চাইলে চোখে হলুদ নেশা ধরে।

পৃথিবীতে এখনো যে এমন জায়গা আছে, যেখানে স্টেশানে নেমে, নিজের মাল হাতে করে যার যার বাড়ি হেঁটে আসতে হয়—সে ছ'মাইলই হোক কি চার মাইলই হোক, তা ভাবা যায় না। এখানে ভাড়ার জন্যে কোনো ট্যাক্সি, রিক্সা, গরুগাড়ি অথবা ঘোড়াগাড়িও নেই।

লালি পেয়ারাতলায় বেতের চেয়ারটেবল পেতে নাস্তা লাগিয়ে দিয়েছিল। নাস্তা শেষ করে বাড়ির পিছনটা ঘুরে দেখছি। ধনেপাতা আর কাঁচা লংকা লাগানো হয়েছে এদিকে—আদাও আছে—কুয়োতলার পাশে পাশে পুদিনার ঝাড় লেগেছে। ধান লাগাতে দেরী হয়ে গেছিল, নীচু জমিতে—তাই ধান ভাল হয়নি এবার। বৃষ্টিও এবারে খুব কম হয়েছে।

কুয়োতলার পাশ দিয়ে পাহাড়ি নালাটা গেছে এঁকেবেঁকে। বাড়ির এই-ই সীমানা। বাড়ির তিন পাশ দিয়ে নালাটা ঘুরে গেছে।

আজ থেকে দশ বছর আগে এ নালা দিয়ে প্রতিরাতে বড় বাঘ যাওয়া-আসা করত।

এখনো হায়না যায়, গরমের দিনে মহুয়ালোভী একলা ভালুক। আর চুপি চুপি আসে লুমরীরা। পা টিপে টিপে আসে, পা টিপে টিপে শুকনো পাতা মচ্‌মচিয়ে পালিয়ে যায়।

রাতে শুয়ে শুয়ে তাদের আসা-যাওয়ার শব্দ শুনি। কখনো কখনো নেকড়ে বাঘ আসে মুরগী ও ছাগল ধরতে। দেহাতীরা বলে রাতের বেলা এই নালা দিয়ে ভূতেরাও যাওয়া-আসা করে। নানারকম ভূত।

মাঝে লালির অসুখ করেছিল; একটি ছেলেকে পেয়েছিলাম রান্না করার জন্যে। তাকে শুতে বলা হয়েছিল রান্নাঘরে;—শীতের রাতে উনুনের গরমে আরামে শোবে বলে।

প্রথম দিন কাজ করল, তারপর প্রথম রাত পোয়ালে দেখি সে আর ওঠে না।

সকাল আটটা বাজল, চা দেওয়ার নাম নেই। দরজা ধাক্কিয়ে তাকে জাগাতেই সে কাঁদতে আরম্ভ করল, বলল, আমাকে এক্ষুনি ছুটি দিন বাবু, আমি এখানে এই জঙ্গলে কাজ করতে পারব না।

কি হয়েছে শুধোতে সে বলল, সারা রাত ভূতেরা এই নালায় ধমর্‌-ধামর্‌ করে শুকনো পাতায় নেচেছে, নানা রকম আওয়াজ করেছে, একশ টাকা মাইনে দিলেও সে এখানে চাকরী করবে না।

অতএব তাকে তক্ষুনি ছুটি দিতে হয়েছিল।

কুয়োর পাশে পাশে অনেকগুলো জংলী জাম এবং আমলকি গাছ গজিয়েছে। এক দল টিয়া এসে তাতে ঝাঁপাঝাপি করছে। আমলকির ডালে-বসা টিয়ার ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মালু বলল, বাবু খত্‌ আয়া।

মালু পোস্টাফিসে গেছিল খত্‌ আনতে। এখানে ডাকপিওন নেই। সকাল এগারোটায় যখন গাড়ি আসে আপ-ডাউনের, তখন প্রত্যেককে যেতে হয় পোস্টাফিসে।

পোস্টমাস্টার একে একে নাম পড়ে যান—যে যার চিঠি নিয়ে বাড়ি ফেরে। এখানের হাট এবং পোস্টাফিস হচ্ছে ক্লাবের মত—সকলের দেখা-হওয়ার জায়গা।

খামের চিঠি, হাতের লেখাটা দেখেই অবাক হলাম। অবাক নয়, বলা উচিত উত্তেজিত হলাম। এ চিঠি এমন একজন লিখেছে যার কাছ থেকে চিঠি এলে আমার স্বাভাবিক কারণেই উত্তেজিত হবার কথা।

চেয়ারে বসে চিঠিটা খুললাম।

ছুটি লিখেছে। রাঁচী থেকে।

রাঁচী

সুকুদা,

আপনি নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু অবাক হওয়ার মত কিছু আছে বলে আমি ত জানি না।

বহু দিন হল আপনার কোনো চিঠি পাই না।

কিছু দিন আগে কোলকাতায় গেছিলাম।

অনেকদিন আপনাকে দেখিনি—তাই খুব দেখতে ইচ্ছে হওয়ায় সমস্ত ঝুঁকি নিয়েই আপনাদের কেয়াতলার বাড়িতে গেছিলাম। বৌদি ছিলেন না।

অবশ্য না-দেখা হয়ে ভালই হয়েছে, দেখা হলে আমি খুবই এম্‌বারাসড ফিল করতাম। যে দোষে আমি দোষী নই, দোষী ছিলাম না কোনো দিনও, সেই দোষের জন্যে মনে মনে উনি আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য একথাও জানি যে, সেই শাস্তির বোঝা বইতে হয়েছে আপনাকে, কখনো প্রতিবাদের সঙ্গে, কখনো বিনা প্রতিবাদে।

এমন অসুখ কি করে বাধিয়েছিলেন জানি না।

ভগবানের দয়ায় আপনার কোনো কিছুরই অভাব ছিল না, নিজেকে সুখী করার সমস্ত রকম উপাদান আপনার মধ্যে ছিল, একজন পুরুষ মানুষ জীবনে যা চাইতে পারে তার সব কিছুই আপনি পেয়েছিলেন অথচ তবু সব জেনে-শুনে আপনি এমন নিজেকে নির্দয়ভাবে নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন।

কার উপর অভিমানে আপনি এমন করে নিজের প্রতি অযত্ন করে এই অসুখ বাধালেন?

আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব ঝগড়া করব।

আপনাদের বাড়িতে শুনলাম আপনি আরো মাস ছয়েক ওখানে থাকবেন।

আপনার উপর কতখানি রাগ করে আছি তা আমার সঙ্গে দেখা হলে বুঝবেন। আপনি রাঁচী হয়ে গেলেন, অথচ আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না। ওখানে এত দিন হল আছেন, রাঁচী থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল পথ, অথচ আমাকে ওখান থেকেও জানালেন না যাতে একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি।

আপনি নিজেকে কি ভাবেন জানি না। আপনি আমাকেও কি ভাবেন তাও জানি না। আপনাকে কি আজ মনে করিয়ে দিতে হবে যে, আপনার অশান্তি যাতে না বাড়ে, আপনি যাতে বেশী করে দুঃখ না পান, শুধু সেই জন্যেই কোলকাতার বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে একজন সদ্য এম-এ পাশ-করা অল্পবয়সী অবিবাহিতা মেয়ে একা এখানে চলে এসেছিলো?

এক সময় আপনি আমাকে একদিন না দেখতে পেলে পাগলের মত করতেন, অথচ আমাকে শুধু একবার চোখের-দেখা দেখার জন্যে আপনাকে যে কষ্ট ও অনেক সময় অপমানও সহ্য করতে হত তা আর কেউই না জানুক, আমি জানতাম।

সে কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য ছিল।

আমার প্রতি আপনার এক অদ্ভুত আচ্ছন্ন, আবেগময় এবং মাঝে মাঝে এখন মনে হয়, হয়ত অন্তঃসারশূন্য ভালোবাসার দাম দিতে গিয়ে আমার সমস্ত সুখের জীবনটাই প্রায় দিতে বসেছি—অথচ আপনি এমন নিষ্ঠুর যে আমার এত কাছে থেকেও আজ আমাকে একবার দেখতেও ইচ্ছে করল না আপনার। একবার দেখা দিতেও না।

আপনি বলতেন, মেয়েরা ভালোবাসার কিছু বোঝে না। এমন ভাব করতেন, যেন পৃথিবীতে কাউকে ভালোবাসার মানে কি তা একমাত্র আপনিই বুঝতেন।

অন্য পুরুষদের কথা জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখে যদি ছেলেদের ভালোবাসার সংজ্ঞা স্থির করতে হয় তবে তা সমস্ত পুরুষ জাতির পক্ষে বড় কলঙ্কের হবে।

রাঁচীর রাতু বাস স্ট্যাণ্ডে আমি খোঁজ নিয়েছি—বিকেলে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের বাস ছাড়ে এখান থেকে। সন্ধ্যের পর সেখানে পৌঁছয়। আপনার বাড়ি আমি চিনি না, শুনেছি খুব জংলী জায়গা—।

এ পর্যন্ত অনেক কিছুই একা একা খুঁজে নিয়েছি, চিনে নিয়েছি, তাই চিনে নিতে পারব না এমন ভয় নেই। একদিন লক্ষ লোকের মাঝ থেকে আপনাকে চিনতে যখন ভুল হয়নি, আজ অন্ধকার জঙ্গলে আপনার বাড়ি চিনতেও কষ্ট হবে না আশা করি।

আপনি কেমন আছেন? এখনো কতখানি অসুস্থ আছেন জানতে ভীষণ ইচ্ছা করে। এখনো কি সত্যিই অসুস্থ আছেন?

আমি আগামী শনিবার আপনার ওখানে যাচ্ছি। শনিবার রাত ও রবিবার আপনার ওখানে থেকে সোমবার ভোরের বাসে রাঁচী ফিরে আসব।

আমাকে আটকে রাখার চেষ্টা করবেন না। সময়ের আগে যেন তাড়িয়েও দেবেন না।

আপনাকে বহু দিন বলেছি, যা দিতে পারি, সেটুকু দেওয়ার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে, যা দিতে পারি না তা না-দেওয়ার বেদনাকে আরো তীব্র করবেন না।

আশা করি, আপনি আমাকে বুঝবেন।

আপনার চোখে আমি কি এবং কতখানি শুধু এ কথাই আপনি বারবার জানিয়েছেন, আপনি কোনোদিন সত্যিকারের আমার চোখে আপনি কি এবং কতখানি তা বোঝেননি এবং বুঝতে চানও নি।

আপনার হয়ত অনেক আছে, অনেকে আছে, কিন্তু আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এত বড় পৃথিবীতে। আপনার মত করে এই অল্পবয়সের জীবনে আমাকে কেউ ভালবাসেনি; অমন করে কেউ ভালবাসতে জানে না।

আমার জীবন থেকে আপনি কিছু দিনের জন্যে হারিয়ে গেছিলেন, স্বল্প-দিনের জন্যে। যার সামান্যই থাকে, সেই অসামান্যটুকু হারানোর দুঃখ যে কি, তা আমার মত করে আর কেউই জানেনি।

সোমবারে আমি ক্যাজুয়াল লিভ নেব। ধীরে সুস্থে রাঁচী ফিরলেই হবে।

আমি আসছি এ খবর শুনে আপনার শরীর নিশ্চয়ই বেশী অসুস্থ হবে না। অসুস্থ হলেও আমার কিছু করার নেই। আপনি বরাবরই স্বার্থপর। নিজের সুখের জন্যে চিরদিন আপনি অন্যকে দুঃখী করেছেন অথচ কোনোদিন অন্য কারো দুঃখের খোঁজ রাখেন নি।

আমি জানি, আপনি নিশ্চয়ই এখন ভাল আছেন। আপনাকে ভাল থাকতেই হবে। আমি

যতদিন বেঁচে থাকব, যতদিন আমার নিঃশ্বাস পড়বে, ততদিন আপনার কোনো রকম ক্ষতি হতে দেব না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা আপনার ক্ষতি করে।

ইতি—আপনার অনাদরের ভুলে-যাওয়া ছুটি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ভাঁজ করে রাখলাম, বার বার পড়লাম। চোখের কোণা দুটো কেন যেন ভিজে এল। বোধহয় অসুস্থ শরীরের জন্যে। এ শরীর এই আবেগ সহ্য করার শক্তি রাখে না।

এ রকমই কি হয়? যেদিন আমি একজনকে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম, তার শরীর, তার মন, তার সবকিছু, তার সমস্ত; সেদিন সে লজ্জাভরে নুইয়ে ছিল, ভালো-লাগায় লজ্জাবতী লতার মত কেঁপেছিল শুধু, আমার বেহিসাবী পৌরুষের কোনো দানই গ্রহণ করার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।

সব সময় সে ভয়ে মরত, এই বুঝি অন্যায় করে ফেলল নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে, নিজের পরিবারের মর্যাদার কাছে; রমার কাছে।

পাছে সে কাউকে ঠকায়, অনুক্ষণ সেই আশংকায় সে চুপ করে থাকত। মুখে বলত, না, না, না', চোখে বলত 'না, না, না', আমার সমস্ত উদ্দাম অবুঝ আবেগের উত্তরে তখন সব সময় সে নিজেকে নিজের সংস্কারের মধ্যে লুকিয়ে রাখত। সামাজিক অনুশাসনের বোরখা পরে দূরে থেকে সে চোখের ঘুলঘুলি দিয়ে আমাকে দেখত, আমার সত্যিকারের রূপ জানতে চাইত। আমার সমস্ত চাওয়া শুধু তার শরীরকে পাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, না তার চেয়েও বড় কোনো চাওয়া এ পৃথিবীতে আছে, যে চাওয়ায় শুকিয়ে-যাওয়া মনও পুষ্পিত হয়ে ওঠে, তা ও সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে চাইত।

এতদিন পরে, এত বছর পরে আজ বুঝি আমার ছুটি, আমার অনেক দিনের ছুটি, আমার মত করেই বুঝেছে যে জীবনে কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না, কেউ কাউকে কিছু দিতেও পারে না। যা পাবার, যা দেবার, তা একমাত্র নিজেকেই পেয়ে ও দিয়ে ধন্য বা অধন্য হতে হয়। সে আনন্দ বা দুঃখ শুধু তারই। তার একার। সেই ন্যায় বা অন্যায়ের পাওনা এবং প্রায়শ্চিত্ত শুধু তার নিজেরই। তা যদি নাই-ই হবে তবে আজ ছুটি কেন এমন করে চিঠি লেখে?

যে মুহূর্তে আমার সমস্ত মন নিজেকে নিঃশেষে এ পৃথিবী থেকে ছুটি দিতে চায়, যে মুহূর্তে বেঁচে থাকার মত কোনো রকম অনুপ্রেরণাই আর আমার অবশিষ্ট নেই; ঠিক সেই মুহূর্তে কেন সে এমন করে আগল খুলে চিঠি লেখে?

কোনো আশ্চর্য শক্তিতে ও কি বুঝতে পেরেছে এখন আমার মনে কি হয়? আমার মন যে চিরদিনের মত আজ ছুটি চায় সকলের কাছ থেকে, এমন কি ছুটির কাছ থেকেও; তা কি ও বুঝতে পেরেছে?

॥ তিন ॥

কাল রাতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল।

রাত কত তা মনে পড়ে না, বোধহয় বারোটা-টারোটা হবে—শীতের রাতে এই জঙ্গলে তা অনেক রাত—হঠাৎ আমার ঘরের পাশে কার পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করে শুনলাম—শিশির-ভেজা পাতার উপরে কোনো লোকের অসাবধানী পায়ের শব্দ।

বিছানা ছেড়ে উঠে যথাসম্ভব কম শব্দ করে দরজা খুলে বাইরে টর্চ ফেললাম শব্দ লক্ষ্য করে—দেখলাম একজন অসম্ভব লম্বা কালো কুচকুচে লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে বুট জুতো, খাকি হাফ-প্যান্ট, গায়ে গরম কালো কোট।

লোকটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, দু'হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রেখে।

লোকটার কাছে গিয়ে মুখে টর্চ ফেলে শুধোলাম, তু কওন হো?

সে বলল, ফরেস্টের লোক।

এতে রাতে এখানে কি করছ?

মালুকে ডাকতে এসেছিলাম।

এত রাতে?
দরকার ছিল।
লোকটার কাছে যেতেই বুঝতে পেলাম লোকটা নেশা করেছে। মুখ দিয়ে মহুয়ার উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে।
আমার রাগ হয়ে গেল, বললাম, এ বাড়ির হাতার মধ্যে রাতে আর কোনোদিন তোমাকে ঢুকতে দেখলে গুলী করে মাথার খুপরি উড়িয়ে দেব মনে থাকে যেন।
লোকটি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, জী হুজৌর। বলে পিছনের গেটের দিকে যেতে লাগল।
একটু পরই, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে চুড়ি ঝমঝমিয়ে কে যেন আমার জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল বাইরে। তাড়াতাড়িতে জানালা খুলে টর্চ জেলে বুধাই-এর লাল ফুল ফুল শাড়ির পেছনটা দেখতে পেলাম। বুধাই মালুদের ঘরের দিক থেকে দৌড়ে যাচ্ছিল, বাইরের দিকে।
দেখতে পাচ্ছি এতদিন অনেকের কানাঘুষায় যা শুনেছি, তা সত্যি। লালির বড় মেয়ে বুধাইকে তার বর নেয় না। ও এখানেই থাকে।
মেয়েটার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। সারা গায়ে যৌবন উপছে পড়ছে—তবে চোখমুখ থ্যাবড়া থ্যাবড়া—খুব ভাল স্বাস্থ্য। মেয়েটা এমনিতে খুব হাসিখুশী—যখনি রেজার কাজ করে অথবা যখনি হাটের দিনে হাটে যায়—দেখি রঙিন চুড়ি পরে, রুপোর গয়নায় সাজে, মুখে চুলে তেল চুঁইয়ে পড়ে।
মেয়েটা ধীরে ধীরে কিছু করতে পারে না—হাঁটতে বললে দৌড়ে যায়; দৌড়তে বললে ওড়ে। প্রাণ উপছে পড়ে সব সময় ওর শরীর থেকে।
সেই মেয়েটার নাকি স্বভাব ভাল নয়।
এখানের সাহেব প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, চোখ রাখতে।
আমার নিজের চোখ নিজের যা একান্ত সব জিনিস বা জন ছিল, তাদেরই পারল না চোখে চোখে রাখতে, তাই এত দূরের ও পরের জিনিসে চোখ রাখার প্রয়োজন মনে করিনি। এখন দেখছি, নিজের বাড়ির হাতায় আসর বসিয়েছে এরা।
ঘুম চটে গেল। ভাবতে লাগলাম মা-বাবাই বা কেমন? চোখের সামনে মেয়েটাকে যা খুশী তাই করতে দিচ্ছে? মা-বাবার মত ছাড়া এমন হয়?
মালুটা বোকা—ওকে লালিই চালায়। লালির বয়স পঁয়তাল্লিশ মত—মুখ মিষ্টি—ধূর্ত মেয়ে। যৌবনে নিজেও কি করেছে বলা মুশকিল। তবে মালু আমার দেবতা। দোষের মধ্যে হাটের দিনে একটু নেশা করে ফেলে। এ ছাড়া মালুর কোনো দোষ নেই। মালু একজন খাঁটি, সৎ ও সরল ওঁরাও। সংসারের মারপ্যাঁচ ঘোঁৎঘাঁত ও বোঝে না। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় ও অনেক মার খেয়েছে এতাবৎ সংসারের কাছে।
আজ এত রাতে আর কিছু করার নেই। কাল সকালে এ ব্যাপারের একটা ফয়সালা করতে হবে।
কোনো আদিমতম জানোয়াড়ের কামড় খেয়ে এই শীতের রাতে ফরেস্ট অফিসের বেয়ারা মৌসুমী কুকুরের মত পাকদণ্ডী বেয়ে মহুয়া খেয়ে অন্ধকার সাঁতরে চলে আসে কেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু এ অঞ্চলে শুনতে পাই অনেক চেঞ্জার বাবুরাও নাকি এমনিভাবে মৌসুমী কুকুরের মত ঘোরেন-ফেরেন।
জানি না তাঁরা কী পান? একটা অচেনা, অজানা মনহীন শরীর ঘেঁটে ঘেঁটে ওঁরা কি খোঁজেন?
এপাশ-ওপাশ করি, কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না।
বস্তীতে কারা যেন মাদল বাজিয়ে একটানা দোলানী সুরের ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে চলেছে।
মাঝে মাঝে অনেক দূরের রেললাইন থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শীতের রাতের ডিজেল ইঞ্জিন একটানা ভারী আওয়াজ তুলে, সে আওয়াজ অন্ধকার পাহাড়ে-বনে প্রতিধ্বনিত করে চলে যাচ্ছে।
আবার সব আওয়াজ থেমে গেলে চারিদিক থেকে শুধু ঝিঁঝির একটানা ঝিঁ ঝিঁ রব এবং পাতা থেকে শিশির পড়ার ফিসফিসানিতে সমস্ত রাত ভরে যাচ্ছে।
ফাদার মার্টিনের বাড়ির জোড়া-এ্যালসেসিয়ান ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে। দূর থেকে সে

ডাক ভেসে আসে।

নালার দিক থেকে একটা খাপ্‌ পাখি হঠাৎ ডাকতে শুরু করল, খাপ্‌-খাপ্‌-খাপ্‌-খাপ্‌। খাপ্‌ পাখির ডাক শেষ হলে মিসেস ডাগানের বাড়ির দিক থেকে (যেখানে প্যাট গ্ল্যাসকিন থাকে) একটা টিটি পাখি, টিটির-টি-টিটু-টি-টি করতে করতে এ বাড়ির দিকে উড়ে আসতে লাগল।

টিটি পাখিটা কি কিছু দেখেছে? কোনো জানোয়ার? কোনো লোককে এই রাতের পথে চলাফেরা করতে? নাকি সেই লোকটিকে দেখেছে, যাকে এখানের অনেক লোকই দেখেছেন? লোকটির পরনে কালো ট্রাউজার এবং কালো শার্ট—দূর থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে লোকটিকে আসতে দেখা যায়, তারপর কাছে এলেই সে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। মিস্টার পটার দেখেছেন তাকে, একদিন মিস্টার এণ্ড মিসেস এ্যালেনও দেখেছেন।

এই পরিবেশে, নির্জনতায়, এখানে সব কিছুই থাকা ও দেখা সম্ভব।

চামার মোড়ে কিছুদিন আগে কারা যেন অত্যাচারী সুদখোর ব্যবসায়ীকে খুন করে তার মৃতদেহ গাছ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল—সেই বীভৎস মৃতদেহের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, গভীর রাতে একলা-চলা ডুলি রেঞ্জের বড় বাঘের কথা। সে পথে এখন গেলে তাকে দেখা যেতে পারে। শিশিরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে হয়ত পথের উপর নরম ধুলোয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। অথবা সেই হাতীর দলের কথা—যারা পালামৌর স্যাংচুয়ারী থেকে মাঝে মাঝে চলে এসে এই চামার রাস্তায় শুঁড় উঁচিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়ায়।

মনে পড়ে যায় টি-বি হসপিটালে আমার পাশের বেডের সতেরো বছরের ছেলেটির জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার কথা। পুরো হাসপাতালের কেউ জানলো না, কেন অমন ফুটফুটে ছেলেটা আত্মহত্যা করলো। অথচ সে নিজেকে এমন হঠাৎ করে নিবিয়ে দিল অসময়ে ফুঁ দিয়ে—তার কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল। অথচ কারণটা কেউই জানলো না। জানতে চাইলোও না পর্যন্ত।

এমন এমন সব হঠাৎ ঘুম-ভাঙা রাতে পিস্তলের নলটা কপালের কাছে লাগিয়ে আমিও ভাবি—যখন অমনি করে হঠাৎ হাওয়ার মত কোনো সুন্দর চাঁদনী রাতে, ফুলের গন্ধের মধ্যে, রাতচরা পাখির ডাকের মধ্যে, রুপোলী রাতের ঝুমঝুমিয়ে বেজে-ওঠা সমস্ত শব্দতরঙ্গের মধ্যে এখানে একদিন নিজেকে নিবিয়ে দেব—সেদিন এবং তারপর একজনও কি জানবে, জানতে চাইবে, কেন হঠাৎ নিবে গেলাম আমি?

আসলে কেউই জানবে না, কেউই কাঁদবে না, কেউই ভাববে না—।

হাসপাতালের সেই অখ্যাত তরুণের জন্যে, রোজ সকালে গোলাপের পাপড়ি থেকে ঝরে-পড়া শান্ত শীতল শবনমের জন্যে, কে-ই বা কোন্‌দিন কেঁদেছে?

তবুও যেতে হবে, চলে যেতে হবে, আজ কিংবা কাল; নিজের হাতে নিজেকে খেয়া-পার করাতে হবে।

যে-হাতে পিস্তল ধরা থাকবে সেই হাতেই একজনের নরম হাত ধরার স্বপ্ন নিয়ে দুটি চোখ বুঁজে আসবে।

এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জে পাখি ডাকবে, ফুল ঝরে পড়বে, শুকনো পাতা উড়বে চৈতী হাওয়ায়, মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধে ভারী হয়ে থাকবে সমস্ত প্রকৃতি—আর এই দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় ক্লিষ্ট বঞ্চিত ও ব্যথিত হৃদয়ের একজন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকবে।

● ঘুমিয়েই কি থাকবে? না আমাকেও সেই কালো ট্রাউজার ও কালো শার্ট পরা অশরীরী লোকটির মত দেখা যাবে এই জঙ্গলের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে?

॥ চার ॥

কাল এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরের দিকে। তারপর থেকে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবার পরই ঠাণ্ডার প্রকোপ বেড়েছে। কনকনে একটা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে।

মান্দারের সাহেব ডাক্তার সকাল-বিকেল দুবেলা নিয়ম করে হাঁটতে বলেছেন। এখনো ওষুধ খাওয়ার বিরাম নেই। ঘড়ি ধরে এখনো নানা রকম ক্যাপসুল খেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে একাধিক টনিক।

লোকে বলে, আজকাল যক্ষা হলে কেউ মরে না। কথাটা হয়ত সত্যি, সময় মত ধরা পড়লে কেউ মরে না। কিন্তু প্রাণে না মরলেও যে প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে রোগীতে পড়তে হয়, তা এ রোগের রোগী মাত্রই জানেন।

একটা লাংস আমার চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেছে। অন্যটা নিয়ে যতদিন বাঁচি ততদিন সাবধানে বাঁচতে হবে। এ ভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই। আমি এমন কোনো লোক নই যে আমার বেঁচে থাকার জন্যে যে কোনো মূল্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এমন কিছু মহৎ কর্ম আমার করণীয় নেই; আমি মরলে কোলকাতার ময়দানে আমার স্ট্যাচু হবে না, কেউই আমাকে মিস্ করবে না— তাই যেমনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম তেমনভাবে বাঁচতে না পারলে আমার কাছে বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বিকেলে ফুল-স্লিভস সোয়েটার চাপিয়ে মাথায় গরম টুপী দিয়ে হাঁটতে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি দূর থেকে প্যাট আসছে।

প্যাটের একটা পা নেই। থাইয়ের কাছ থেকে কাটা ডান পাটা। ও যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরে ছিল তখন বোমার টুকরোয় ওর পা জখম হয়েছিল।

প্যাটের বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দেখলে পঁয়ত্রিশ বলে মনে হয়। ক্রাচে ভর করে ও সারা ম্যাকলাস্কি ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত সময় মুখে হাসি লেগে আছে। প্যাট বিয়ে-থা করেনি। মিসেস ডাগানের বাড়ি ও দেখাশোনা করে মাসে একশ টাকার বিনিময়ে।

ছোট শোবার ঘরটা দেওয়ালময় পিন-আপ ছবিতে মুড়ে রেখেছে। ও হেসে বলে, 'ইউ সী, আই ফিল ভেরী লোনলি ইন উইনটার নাইটস, দ্যাটস হোয়াই দে কীপ মি কোম্পানি, দে গিভ মি আ লিটল ওয়ার্মথ।'

প্যাট দূর থেকে বলল, গুড আফটারনুন মিঃ বোস।

আমি হেসে বললাম, গুড আফটারনুন।

ও আবার আসতে আসতে বলল, গোয়িং ফর আ স্ট্রল?

আমি বললাম, ইয়া।

ও বলল, কাম, আই উইল এ্যাকম্পানি ইউ।

লালি এসে শুধোলো এখন দুধ খাব কিনা, না ল্যাংড়া লার্সকিনের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে খাব।

আমি বললাম, বেড়িয়ে এসে খাব।

এখানের দেহাতীরা লোকের নাম-করণে বড় পটু কিন্তু বড় ক্রুড্। প্যাট লার্সকিনের যেহেতু একটি পা নেই, ওকে এখানে সকলে বলে ল্যাংড়া লার্স্কিন। হল্যাণ্ড সাহেব এদের উচ্চারণে: হলাণ্ডুয়া।

এখানের লোকজন, অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক সব প্রথা, মধ্যযুগীয় আবহাওয়া এবং নীরব নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সব মিলিয়ে বড় ভালোবেসে ফেলেছি এ জায়গাটা। এখানের সবকিছু আমার মনোমত। এই শান্ত ঢিলে-ঢালা জীবন, যেখানে একশ টাকা মাইনে-পাওয়া লোককে সবাই মিলিয়নীয়র ভাবে, যেখানে জীবন ধারণের জন্যে প্রতি মুহূর্তে দৌড়াদৌড়ি নেই, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেই, কনফারেন্স নেই, যেখানে পথ চলতে ডিজেলের ধোঁয়া বুকের মধ্যে অবধি নিষ্পাপ শিশুদের বিষাক্ত করে না, যেখানে চাওয়া অল্প আর প্রাপ্তির আনন্দ অনেক, এমনি জায়গায় কার না ভালো লাগে?

দুঃখের বিষয় এই যে এখানে চিরদিন থাকা যায় না। যে পরিবেশে, যেভাবে আমরা মানুষ: খ্যাতি, টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তির ম্যারাথন দৌড়ে যাদের ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তাদের উঁচুগ্রামে বাঁধা মন ও শরীরের তার এখানে এলে ঢিলে হয়ে পড়ে। ভয় হয়, মরচে ধরে যাবে। আতঙ্ক হয়, এখানে বেশী দিন থাকলে কোলকাতায় ফিরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আর জয় করতে পারব না। তারা শিরস্ত্রাণ ছাড়াই তাদের তরোয়ালের এক এক কোপে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে শেষ করে দেবে। তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত আমি আবার এক সময় ফিরে যাব সেই ধূলিমলিন নোংরা আবহাওয়ায়। চোগা-চাপকান পরে কোর্টে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা সওয়াল করব, মোটা অঙ্কের চেক পুরবো পকেটে এবং সলিসিটার এবং মক্কেলদের সঙ্গে বাধ্য বেড়ালের মত হেসে হেসে কথা বলব।

ইচ্ছে করুক কি না করুক।

বাড়ির গেট ছাড়িয়ে এসে নালা পেরোলাম। পেরুতেই, চামার দিকের লাল মাটির অসমান, পাথর-ছড়ানো ধুলি-ধুসরিত রাস্তা।

একটু এগিয়ে যেতেই বাড়ি-ঘর সব পেছনে পড়ে রইল। বাঁদিকে শেষ বাড়ি মিঃ এ্যালেনের। ডানদিকে শেষ বাড়ি মিস্টার কিং-এর। তারপর কোনো বাড়িঘর নেই। সোজা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচু-নীচু পথটা চলে গেছে ডুলির দিকে। সেখানে একটি ফরেস্ট বাংলো আছে। ডুলির পরে আরো মাইল দুয়েক গিয়ে রামদাগা গ্রাম। মাঝে আরো একটা গ্রাম আছে ডানদিকের উপত্যকা পেরিয়ে তার পরের পাহাড়চুড়ায়। এই কাঁচা রাস্তাটা চামা অবধি প্রায় আট মাইল মত— রাস্তা খুবই খারাপ--পায়ে হেঁটে যেতেও কষ্ট—এত পাথর ছড়ানো ও অসমান।

দুদিক থেকে তিতির ডাকছিলো ক্রমাগত চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে। নাকটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। লাল, বিধুর আভা ছড়িয়ে ছিল আকাশময়। একটা শুকনো ঠান্ডা ভাব উঠছিল চারদিক থেকে। পিটিস ঝোপ থেকে ভেজা উগ্র গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মাঝে মাঝে চষা জমি। কিতারি লাগিয়েছে, মকাই লাগিয়েছে, কোথাও বা মিষ্টি আলু। ঢালে ঢালে সর্ষে লাগিয়েছে। হলুদ আঁচলে শেষ বেলার লাল লেগেছে।

তিতিরের চিৎকার ও দূরের ক্বচিৎ ঘরে-ফেরা পাখির ক্ষীণ স্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। প্যাটের ক্রাচের শব্দ হচ্ছে শুধু পাথুরে মাটিতে। দূরের ঝোপে একদল ছাতারে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করেছে।

একটু এগিয়ে যেতেই সে আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে, ঘাড়ের কাছে কার দুখানি ঠান্ডা হাত এসে চেপে বসেছে। রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাটা ঝুপ করে নেমে আসে, যেন মন্ত্রবলে।

একটা পাহাড়ি বাজ উঁচু শিশুগাছের মগডালে বসে ডানা ঝাপটিয়ে দিনশেষের খবর জানালো।

প্যাট আস্তে আস্তে বলল, সেদিন রিডারস্ ডাইজেস্টে পড়ছিলাম একটা লেখা।

আমি বললাম, কি লেখা?

"হাউ ইভনিং কামস্"। আমাদের সকলের সামনেই সন্ধ্যে হয় রোজ কিন্তু আমরা ক'জন সেদিকে চোখ তুলে তাকাই? দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর মধ্যে এই যে গোধূলি লগন, এই লগনকে আমরা ক'জন উপলব্ধি করি?

প্যাটের কথায় একটা চমক লাগল মনে। আর কেউ করুক আব না করুক, ভগবানের দিব্যি; আমি করি। জঙ্গল পাহাড়ের পরিবেশে সন্ধ্যালগ্নে দাঁড়িয়ে নাক ভরে আসন্ন হিমের রাতের গন্ধ নিতে নিতে, পশ্চিমাকাশের শেষ ফিকে গোলাপি রঙের আভার দিকে চোখ মেলে আমার বারে বারে মনে হয় যে আমি যেন এখানেই জন্মেছিলাম। কোনো কালে। মনে হয় প্রকৃতিই আমার আসল মা, আমার আসল, প্রথম এবং সর্বশেষ প্রেমিকা। হয়ত অনেক নারী এসেছে, চলে গেছে, অথবা আছে এখনো আমার জীবনে, তারা সকলেই জংলী হলুদ সানবার্ডওয়ারের মত, বেগনেরঙা প্রজাপতির মত, ঘুঘুর কবোষ্ণ বুকের মত, কিন্তু তারা এই প্রকৃতিরই টুকরো মাত্র। তারা খণ্ড এবং প্রকৃতি তাদের সমষ্টি।

প্যাট আগে আগে হাঁটছিল।

প্রথম প্রথম প্যাটের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর ওর জন্যে সহানুভূতি হত, অনুকম্পা হত, কিন্তু আলাপ ঘনিষ্ঠ হবার পর দেখছি ও কারো সহানুভূতির অপেক্ষা করে না। ইংরেজী চরিত্রের এই পুরুষালি দিকটা ও পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে রক্তস্রোতে পেয়েছে। ও শুঁড়িখানা থেকে একটাকা বোতলের পাঁচাশী মদ কেনে, তারপর তাকে ওর স্পেশাল ট্রিটমেন্টে ঠিক করে নেয়। একটি টিনের কৌটায় এক চামচ চিনি ও দু আনা লবঙ্গ দিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে চিনিটুকু তারপর বোতলে ঢেলে মিশিয়ে নিয়ে ঝাঁকিয়ে নেয়—তখন সেই সাদা তরলিমার রঙ বদলে গিয়ে ঘন বাদামী হয়ে যায়। দেখতে রাম্-এর মত মনে হয়। সেই নিজে-বানানো 'রাম' খায় মাঝে মধ্যে। নেশায় একা ঘরে বন্দ হয়ে থাকে।

ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

শীতকালে জোনাকি জবলে না, সন্ধ্যাতারাটা দপদপ করে দিগন্তে; কোনো সুন্দরী মেয়ের কপালের নীল টিপের মত।

আমরা কেউই কথা বলছিলাম না।

অন্ধকারে প্যাটের ক্লাচের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। চারিদিকে শিশিরের ফিস্‌ফিসে স্তব্ধতায় ঝিঁঝিদের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না।

॥ পাঁচ ॥

দেখতে দেখতে শনিবার এসে গেল।

কাল হেসালঙের হাট ছিল। হাট থেকে মুরগী কিনে মুরগীর ঘরে রেখেছিলাম। মিসেস কিং-এর কাছে বলে পাঠিয়েছিলাম এক ডজন কেকের জন্যে। আগে অর্ডার না দিলে কেক পাওয়া যায় না।

কার্নি মেমসাহেব রুটি ত রোজ দিচ্ছেনই, কাল যাতে ছুটির জন্যে বান দেন সে কথা বলে পাঠালাম। ভোরবেলা হানিফ এসে মেটে দিয়ে যাবে যাতে ব্রেকফাস্টে ও খেতে পারে।

লালিকে বলে হাসানকে খবর দিয়ে পাঠালাম। হাসান বাবুর্চি। এ বাড়িতে সম্মানিত অতিথিরা কখনো কেউ এলেই হাসানের ডাক পড়ে।

ভাবতেই যে কি ভালো লাগছে। আজ ছুটি আসছে আমার কাছে। বিনা নিমন্ত্রণে, নিজে যেচে; নিজের সংগত অধিকারে সে আসছে আজকে।

অধিকার আমাদের অনেকেরই অনেক ব্যাপারে থাকে হয়ত অনেকের কাছে, কিন্তু সে অধিকারের তাৎপর্য ও তার সীমা আমরা অনেকেই সঠিক বুঝতে পারি না।

এতদিনে, এতদিনে যে ছুটি আমার এই ভাড়া-নেওয়া পর্ণকুটিরে, আমার এই শূন্য জীবনে তার নিজের ভূমিকা এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, এ কথা মনে করেই মন খুশীতে ভরে যাচ্ছে।

আমি বাইরের দিকের একটা ছোট ঘরে থাকি, সেখানেই আমার লেখার টেবল, টানা সব। তার পাশে একটা বড় ঘর—অন্য পাশেও বড় ঘর আছে। ছুটি কোন্ ঘর পছন্দ করবে, কোন ঘরে সে থাকবে জানি না। তাই দু' ঘরেই বিছানা পাতিয়ে রাখলাম বিকেলে। ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে রাখলাম।

ছুটি সূপ খেতে ভালবাসে। হাসানকে সূপ, চিকেন রোস্ট, পুডিং সব বানাতে বলে দিলাম।

পত্রাতু থেকে ম্যাকলাস্কির বিজলী আসে। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলো নিভে যায়। নিভিয়ে দেওয়া হয় সেখান থেকে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে ছুটি ভয় পেতে পারে, তাই সব ঘরে ঘরে বড় মোমবাতি লাগিয়ে দিলাম, তার পাশে রাখলাম দেশলাই।

গঙ্গা বাস চামার রাস্তা দিয়ে যখন প্রতিদিন যায় তখন সন্ধ্যে হয়ে যায়। চারধারে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে।

সব বন্দোবস্ত শেষ করে, লণ্ঠন হাতে মালুকে নিয়ে, ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরে আমি বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

এখানে এইই নিয়ম। যে যখন ফেরে, তার বাড়ির মালি (সাহেবরা বলে, কুলি) বাড়ির সামনে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গিরধারী ড্রাইভার বাস থামায়। যার যার বাড়ির পথের সামনে সে সে নেমে যায়, মালি মাল বয়ে নিয়ে বাড়ি যায়।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই দূর থেকে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গোঙানি তুলে ফাস্ট গীয়ার সেকেন্ড় গীয়ারে আসতে শোনা গেল গির্‌ধারী ড্রাইভারের গঙ্গা বাসকে।

দেখতে দেখতে হেড-লাইটের আলো দেখা যেতে লাগল। হেলতে দুলতে এগিয়ে আসতে লাগল বাসটা।

আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম।

মালু এগিয়ে গিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন উঁচু করে ধরলো। বাসটা থামলো। ভিতর

থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন হিন্দীতে বলল, মুঝ্‌কো হিঁয়াই উতারনা?

গির্‌ধারী বলল, জী, মাইজী।

বাসটা দাঁড়িয়ে একটা অতিকায় জানোয়ারের মত ধড় ঘড় করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। একজস্ট পাইপের ধোঁয়ার গন্ধে, পিটিস ফুলের গন্ধ মুছে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে ছুটি নামল।

কতদিন পরে ছুটিকে দেখলাম। ক—ত্ব—দি—ন পরে।

একটা হালকা সবুজ সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে সাদা বুটিতোলা শাল, পায়ে চটি।

কনডাক্টর একটা ছোট স্যুটকেস হাত বাড়িয়ে দিল—মালু সেটাকে নিতে নিতেই ছুটি বলল, তুমি কে?

বাংলায় বলাতে, মালু বুঝলো না, মালু আঙুল তুলে বলল, বাবু হুঁইয়েপর হ্যায়।

ছুটি অবাক গলায় ওকে বলল, বাবু হিঁয়া তক্‌ আয়া?

তারপর ওরা দুজন তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বাসটা চলে গেছিল।

লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকের অন্ধকার আরো ভাবী হয়ে ছিল। ছুটি আমার কাছে এসে, একেবারে আমার সামনে দাঁড়াল—অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে সেই লালচে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, প্রায় ফিসফিস করে ওর বুকের মধ্যে থেকে বলল, কেমন আছেন? আপনি এখন কেমন আছেন?

কাউকে দেখলেই যে কারো এত ভাল লাগতে পারে, সমস্ত সত্তা হাওয়া-লাগা সজনে ফুলের ডালের মত দুলে উঠতে পারে, তা ছুটিকে দেখতে পেয়েই নতুন করে মনে হল।

ছুটির গলা শুনলে, ওর চোখে তাকালে, ওর কাছে দাঁড়ালে কেন আমি এতখানি খুশী হই? কেন হই আমি কিছুতে বুঝতে পারিনি কোনোদিনও।

আজকে আমি কত যে খুশী, কী যে সুখী; আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমার স্বপ্নের, আমার দুঃখের, আমার আনন্দের, আমার দুখজাগানীয়া, ঘুমভাঙানীয়া ছুটি আজ কতদিন পরে আবাব আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মালুকে বললাম—লণ্ঠনটা আমার হাতে দিযে এগিয়ে যেতে, গিযে লালিকে কফির জল চড়াতে বলতে।

মালু এগিয়ে গেলে, আমি বললাম, তুমি কেমন আছ? তুমি কেমন আছ বল?

ছুটি হঠাৎ আমার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে আমার মুখের কাছে তুলে ধরল, বলল, কতদিন আপনাকে ভাল করে দেখি নি, কই টুপীটা খুলুন একটু; খুলুন না।

টুপীটা খুলতে খুলতে আমি বললাম, তোমার স্বভাব একটুও বদলায়নি চাকরি-বাকরি করেও।

ছুটি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আপনি কিন্তু অনেক বদলে গেছেন।

টুপীটা পবতে পরতে আমি বললাম, তা ত যাবই। তোমার চেয়ে বযসে আমি অনেক বড়, বদলে যাওয়াই ত স্বাভাবিক। বয়সে এবং চেহারায়ও।

বয়সের জন্যে বদলাননি। নিজেকে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই বদলে গেছেন। কিন্তু এভাবে নিজেকে...লাভ কি?

আমি বললাম, তোমার অফিসে তোমার কাজটা কি? বক্তৃতা দেওয়া? তোমার বক্তৃতা দেওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে দেখছি। এখন চলো। বাড়ি পেঁৗছে—তারপর যা বলার আছে শোনা যাবে।

বাড়ি কি অনেকদূর? বলে শালটাকে ভাল করে টেনেটুনে নিল ছুটি।

বললাম, এই এক ফার্লং মত। তোমার খুব শীত করছে, না?

মুখ ফিরিয়ে ছুটি বলল, এখানে বেশ শীত বাবা, রাঁচীর চেয়ে বেশী শীত—হাত দুটো শীতে কুঁকড়ে গেছে।

চলতে চলতে আমি আমার ডান হাতটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতে তোমার হাত রাখ, হাত গরম হয়ে যাবে।

ছুটি গ্রীবা ঘুরিয়ে এক চমক তাকাল। তারপর বলল, না।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, সুকুদা, আমার সমস্ত শীতের দিনে আপনিই আমার দিকে আপনার উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; চিরদিন। আপনাকে নানাভাবে, নানা জনের মারফত

দুঃখী করা ছাড়া আর কিছু আপনার জন্যে করতে পারিনি। এখন বোধহয় আপনার ঠাণ্ডা হাতের দিকে আমার হাত বাড়ানোর সময় এসেছে—আমার হাতে আপনি হাত রাখুন, বলে ছুটি ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

বাঁ-হাতে লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ছুটির বাঁ হাতে আমার ডান হাত রাখলাম। অনেক অনেকদিন পরে ছুটির হাতে হাত রাখলাম।

ভালোবাসা বলতে কি বোঝায় আমি জানি না, উষ্ণতা কথাটার মানে কি আমি জানতে চাইনি, কিন্তু বহুদিন পরে একজনের হাতে হাত রাখতেই আমার সমস্ত শরীর কেন যে এমন করে ভালো লাগায় শিউরে উঠল তাও কি আমি জানি? এই উষ্ণতা, এই আশ্লেষ, এই ভরন্ত ভালোলাগা, এর কি কোনো নাম নেই।

ছুটি আমার হাতখানি ওর সুন্দর নরম আঙুলে ও তালুতে দৃঢ় অথচ হালকা করে ধরে রইল। আমাদের দুজনের হাতের উষ্ণতা দুজনের হাতে ছড়িয়ে গেল। কারো হাতই আর ঠাণ্ডা রইল না।

আমার হঠাৎ মনে হল, আমি কোনো বিরহী ঘুঘুর বুকে হাত রেখেছি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ছুটি বলল, আপনার বাড়ির চারপাশটা কেমন তা দেখা হল না। বিজুপাড়া পেরুতে না পেরুতেই ত অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। রাঁচীতে আমার এক বন্ধু বলছিল, জায়গাটা সুন্দর, সত্যিই সুন্দর?

বললাম, সকলের সৌন্দর্যজ্ঞান ত সমান নয়, তবে তোমার চোখে হয়ত অসুন্দর লাগবে না। কাল তোমাকে সব দেখাব।

দূর থেকে বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল।

ছুটি বলল, ওমা, এই জঙ্গলে ইলেকট্রিসিটি আছে? ভাবা যায় না এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ছবির মত ছোট ছোট টালির বাংলোয় ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে। তাই না?

জবাব দিলাম না কোনো। আমার সদ্যরোগমুক্ত শরীরাশ্রিত ক্লান্ত মনটা এমন ভালোলাগার আমেজে বুঁদ হয়ে ছিল যে, কোনো তুচ্ছ কথা বলেই সে আমেজ আমি নষ্ট করতে রাজী ছিলাম না।

বাড়িতে ঢুকে ছুটি সব ঘুরে ঘুরে দেখল—ওর চোখ বারবার দেওয়ালের বড় বড় ফাটল ও মেঝের লম্বা লম্বা ফাটার দাগ দেখতে লাগল। একটু পরে ও বলল, বাড়িটা এমন কেন? চতুর্দিক ফাটা, জরাজীর্ণ?

বললাম, বাড়িতে যে-থাকে তার মতই ত' বাড়ি হবে? বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক যে-দামে এ বাড়ি কিনেছিলেন তাতে একটা মোটর সাইকেলও কেনা যায় না। সাহেব চলে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়া। সুবিধামত দাম পেয়ে কিনে নিয়েছিলেন। কাল সকালে তোমার এতটা খারাপ লাগবে না, দেখো। এ বাড়িটা বাড়ি হিসেবে ভাল নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু বাড়িব পরিবেশটার জন্যেই শুধু ভাল লাগে।

ছুটি এসে ভিতরের বসবার ঘরের বেতের চেয়ারে বসল।

লালি বলল, বাথরুমে গরম জল দেওয়া হয়েছে।

ছুটি উঠে হাত মুখ ধুতে বাথরুমে গেল।

ও আমার পাশের ঘরেই থাকবে বলেছে—বলেছে ওর ভয় করবে ওপাশের দূরের ঘরে শুতে।

বাথরুম থেকে ঘরে এসে ছুটি কফি ঢালতে লাগল, বলল, আপনি এক চামচ চিনি খেতেন, এখন কি বেশী খান?

হাসলাম, বললাম, আমি কফি খাবো না ছুটি, আমার খাওয়া দাওয়া এখনো নিয়মমত করতে হয়। বাড়তি কোনো কিছু খাওয়া বারণ।

ছুটি কফি ঢালা বন্ধ করে কফির ছোট পটটা শূন্যে ধরেই বলল, কে এসব বলেছে? কোন্ ডাক্তার?

মান্দারের সাহেব ডাক্তার। যিনি এখন আমাকে দেখছেন।

ছুটি চোখ নামিয়ে আমার জন্যে একটি কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল, তাঁকে বলবেন যে রাঁচীর লেডি ডাক্তার অন্যরকম প্রেসক্রিপশান করেছেন। কফি আপনার খেতেই হবে।

আমি যে দুদিন থাকব, আমি যা খাব, যা রাঁধব সবই আপনার খেতে হবে। তারপর একটু থেমে বলল, আজকালকার ডাক্তাররা খালি শরীরের চিকিৎসা করেন, যেন শরীর একটা লোহার জিনিস—তার সঙ্গে মনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কফির কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে খুব অভিমানী গলায় বলল, সত্যি। অত্ত এতবড় একটা অসুখ হল, আমাকে একবার মনে পড়লো না আপনার, আমাকে একটা খবরও পাঠালেন না। আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।

কফির কাপটা তুলতে তুলতে আমি বললাম, কেন খবর পাঠাব? তোমার মনে আছে? তুমি রাঁচী আসার আগে আমার একবার ভীষণ চোখের অসুখ হয়েছিল। আমি দিন-রাত চোখের কাজ করি, তাই যখন সাতদিন চোখ বুজে পড়ে থাকতে হয়েছিল তখন কি যে অবিশ্বাস্য অসহায়তা আর যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা কি বলব। চোখ বুজলেই একজনের মুখ দেখতে পেতাম। সত্যিই বলছি, একজনের চোখ দেখতে পেতাম।

প্রায় পাঁচ দিনের দিনে তোমাকে নিজে ডায়াল হাতড়ে-হাতড়ে ফোন করেছিলাম, বলেছিলাম, একবার এসো, তুমি দেখতে এলে আমার ভাল লাগবে।

তুমি বিদ্রূপের গলা বলেছিলে, 'আপনার কি দেখার লোকের অভাব।' তারপর, মনে আছে কি-না জানি না, আরো অনেক কথা বলেছিলে।

আমার মনে সেদিন সত্যিই সন্দেহ হয়েছিল যে, আমার প্রতি তোমার ভাল ব্যবহারটুকু কতখানি দেখানো এবং কতখানি সত্যি। তোমার উপর আমার জোর কিছু আদৌ আছে কি নেই, সেদিন ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর অপমানিত মনে বসে বসে শুধু তাই ভেবেছিলাম। আসলে আমার এ অসুখের কথা তাই জানাইনি।

ছুটি বলল, ভালই করেছেন।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি ত' ভাবছি, কাল ভোরের বাসেই রাঁচী চলে যাব। যে ভদ্রলোকের নিজের অধিকার এবং নিজের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তাঁর সঙ্গে ফাঁকা বাড়িতে একজন অবিবাহিতা মেয়ের থাকাটাও ভাল দেখায় না। আমাদের দুজনের মধ্যের সম্পর্ক যদি এতই পলকা হয়, যে অভিমানের বশে কেউ কাউকে কোনো কথা বললে তাতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে বসে, তাহলে জানতে হবে সম্পর্কটা এখনো যথেষ্ট পাকা হয়নি।

জবাব দিলাম না আমি, পেয়ালা-ধরা ওর হাতের উপর আমার হাত রাখলাম।

ও কোনো কথা বলল না, দুঃখিত মুখে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে রইল।

কফি খাওয়া শেষ করে ছুটি বলল, ওঃ ভুলেই গেছিলাম, আপনার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি, বলে ওর ঘরে গেল।

ফিরে এল একটি পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল, দেখুন ত, এই পুলোভারটা আপনার গায়ে হয় কিনা।

একটা সুন্দর ফুল-স্লিভস্ পুলোভার বুনেছে ছুটি। ছাই-রঙা। বুকের ও হাতের কাছে সাদায় কাজ করা। আর দুটো ছাই-রঙা বড় মোজা।

ভাবলাম, এই ঠাণ্ডায় আপনার কাজে লাগবে। অনেক দিন আপনাকে কিছু দিই নি। পছন্দ হয়েছে আপনার?

আমি চুপ করে রইলাম। চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের চোখ এত কথা বলে, চুপ করে কারো দিকে চেয়ে থাকলে চোখ অনর্গল এত বলে যে, সে সময়ে মুখে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের কলমের বা মুখের ভাষা কোনো দিনও বোধহয় চোখের ভাষার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমার ছুটির চোখের দিকে চেয়ে আমি বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারি, হাজার বছর—।

চোখে কিছু বললে, বলার কিছু বাকি থাকে, যা অন্য জনে কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতে পারে। মুখে বা লিখে বললে সব নিঃশেষে বলা হয়ে যায়; নিজের হৃদয়ে গোপন ও অব্যক্ত কথার আনন্দময় বেদনা তখন হারিয়ে যায়। সে এক দারুণ নিঃস্বতা।

আমার ফুসফুস হয়ত ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার হৃদয় এখনো তেমনি আছে, আমার হৃদয় ঠিক যেমনটি ছিল। আমার ছুটি আমার চোখের সামনে থাকলে আমার হৃদয় এখনো তেমন ঝুমঝুমিয়ে বাজে। তখন আমার একটুও মরতে ইচ্ছে করে না।

যেদিন নিশ্চিতভাবে জানব যে ও আমার কাছে নেই, এমন কি আমার হৃদয়ের কাছেও নেই, এবং থাকবে না; জানব ও অন্য-কারো হয়ে গেছে অথবা অন্য কারোরই না হয়ে ও কেবল ওর নিজেরই হয়ে গেছে, সেদিন আমার বাঁচার আর কোনো তাগিদ থাকবে না।

হঠাৎ ছুটি বলল, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি সত্যিই ভাবতে পারছি না যে আপান আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন?

কি লাভ হত বল জানিয়ে? আমি বললাম, সকলের সব অশান্তি দূর করতে তুমি নিজেকে কোলকাতা থেকে দূরে নির্বাসিত করলে। তোমার কাছে আমি কত ছোট হয়ে থাকি, তা তুমি জানো না। তাছাড়া এ এমন একটা অসুখ, যে-অসুখে তোমার করার কি ছিল? হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম, ডাক্তার ছিলেন, নার্সরা ছিলেন। রুগীকে ত এরকমভাবেই থাকতে হয়। তুমি এলে তোমার কষ্ট হত শুধু।

চিকিৎসা নাই-ই বা করলাম, সেবা নাই-ই বা করলাম, আপনার কাছে ত থাকতে পারতাম।

তোমার কি ধারণা তুমি কখনও আমার থেকে দূরে থাকো? আমার সঙ্গে তুমি ত সব সময়েই থাকো। সমস্ত সময়। এতগুলো বছরে মনে পড়ে না কখনো যে তোমার কথা একবার না ভেবে একদিনও ঘুম এসেছে আমার, অথবা তোমার মুখ না মনে পড়ে ঘুম ভেঙেছে। তুমি কি কখনোও জানোনি যে, তুমি সব সময়ই আমার সঙ্গে থাক?

ছুটি ওর বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি তুলে আমার দিকে চাইল। কোনো জবাব দিল না কথার।

লালি খাবার লাগিয়ে দিয়েছিল।

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে বললাম, তুমি কিন্তু খাওয়ার সময় দূরে বসে খাবে। আমার গ্লাস, আমার কাপ সব আলাদা করে রাখবে—আমার ঘরেও মোটে ঢুকবে না। তুমি ভাল করেই জান, এ রোগের বিশ্বাস নেই। যতখানি পারো আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলবে।

ছুটি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইল, বলল, বুঝেছি আপনি যেমন সব সময় আমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলছেন?

আমরা গিয়ে খাওয়ার টেবলে বসলাম।

সস্তা লোহার ফোল্ডিং টেবিল, ফোল্ডিং চেয়ার, ফাটা দেওয়াল, ফাটা মেঝে।

এ ঘরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। খাওয়ার ঘরের পাশে রান্নাঘর—মধ্যে এক ফালি ঢাকা বারান্দা—কিন্তু দু' পাশ খোলা। রান্নাঘরটা উত্তরে। এমন হাওয়া আসে যে, বলার নয়। হাওয়া আসুক আর নাই-ই আসুক, এ ঘরটা বড়ই ঠাণ্ডা হয়ে থাকে সব সময়। দিনের কোনো সময়েই এ ঘরে রোদ ঢোকে না।

শালটা ভাল করে মুড়ে বসল ছুটি...ঠাণ্ডায় ওর ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ছুটি আমার মুখোমুখি বসেছে, তাই আমার মনে হচ্ছে এই ফাটা-ফুটো ঘর, এই সামান্য আসবাবের দৈন্য, সবকিছুই ছুটি এসেছে বলে অসামান্য হয়ে উঠেছে।

হাসান এসে খুব গরম স্যুপ দিয়ে গেল।

আমি বললাম, শীগগিরি খাও, নইলে দু' মিনিটের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, আমার ভীষণ শীত করছে, বলে টেবলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে রাখল। আমার হাত ওর হাতে নিয়ে ওর হাত গরম করে দিলাম।

লালি ভাঁড়ার থেকে আচারের টিনটা বের করে আনল।

ছুটি দেখে প্রায় চীৎকার করে উঠল, বলল, এ কি? এ আচার আপনি এখানে কোথায় পেলেন! আশ্চর্য। কবে কোলকাতায় বলেছিলাম, ভালবাসি, আর আপনি সে কথা মনে করে রেখেছেন? বলুন না কোথায় পেলেন?

আমি হাসলাম, বললাম, খিলাড়ি থেকে আনিয়েছি।

ছুটি অবাক গলায় বলল, আপনার মনেও থাকে, আশ্চর্য। সব খুঁটিনাটি কথা।

বললাম, থাকে; সমস্ত খুঁটিনাটি কথা। যা মনে রাখতে ইচ্ছা হয়, সেগুলো সবই মনে থাকে।

এ আচার তবে রাঁচীতেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আশ্চর্য। এত ভালোবাসি অথচ আমার নিজের একবারও মনে হয় নি যে রাঁচীতে খোঁজ করি।

তা ত হল। এখন আচার খাবে কি দিয়ে? আজ ত তোমার জন্যে একেবারে সাহেবী রান্না হয়েছে।

কাল খাব। কাল আর কিছুই খাব না। শুধু আচার দিয়ে এক থালা ভাত খাব।

বললাম, পাগলি।

খাওয়া-দাওয়ার পর মধ্যের ছোট ড্রইংর়ুমে চেয়ারের উপর পা তুলে শাল মুড়ে শাড়ি টেনে বসল ছুটি। বলল, মশলা খাবেন? বলে ওর ব্যাগ থেকে একটি কৌটো বের করে একটু মশলা দিল। তারপর বলল, ক'টা বাজে?

দশটা। আজ আর গল্প নয়। এতখানি বাসে এসেছ। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আজকাল ভোরে কখন ওঠো তুমি? নটা না দশটা?

ও হাসল। বলল, আজ্ঞে না স্যার। নিজের অনেক কাজ করতে হয় ভোরে উঠে। আমি কি আর সেই আরামী, আদুরে মেয়েটি আছি? এখন অনেক শক্ত হয়েছি আমি, অনেক কিছু করতে হয় আমাকে নিজের জন্যে। কাল দেখতেই পাবেন, কখন উঠি।

বললাম, কাল কোন্ সময় কি খাবে এখনি বলে রাখ। হাসানকে আমি সব বুঝিয়ে রাখছি।

ছুটি চলে গেল, বলল, দেখুন, আপনার বাবুর্চি-ফাবুর্চি ভাল রাঁধতে হয়ত পারে, কিন্তু আমার দরকার নেই কোনো। তাছাড়া আপনাকে পরিষ্কার বলে রাখি, কালকে আমিই সব রাঁধব—আমি আমার যা-খুশী আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

তাতে আমি খুশী যে হব তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু চারদিকে এত সুন্দর জায়গা আছে তোমাকে দেখাবার, তোমাকে নিয়ে যাবার যে, তুমি একদিনের জন্যে এসে হেঁসেলে ঢুকবে এটা মোটেই ভাল হবে না।

আহা। যে রাঁধে, সে যেন চুল বাঁধে না।

তা হয়ত বাঁধে, কিন্তু তুমি এমনিতেই রোজ অনেক কষ্ট করো—আমার কাছে যখনি আসবে, যখনি থাকবে, তখন অন্তত তোমাকে একটু আরামে রাখতে দিও। তুমি এখানে সুন্দর করে সাজবে, সকাল বিকেল চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াবে, ক্ষিদের সময় এসে খাবে—ব্যসস্—এখানে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।

না। তা বললে হবে না।

জেদী মেয়ের মত বলল ছুটি।

তাহলে একটা রফা হোক। হাসানই রাঁধবে, কিন্তু তুমি শুধু একটি পদ রেঁধো। কেমন?

কি ভাবল যেন ও। তারপর বলল, বেশ, তাই-ই হবে।

একটু পরে ও বলল, চলুন শুয়ে পড়া যাক।

ওর সঙ্গে আমি ঘরে গেলাম। বললাম, রাতে ভয় পাবে না তো? ভয় পেলে আমাকে ডেকো। আমি পাশেই থাকব। তোমার বালিশের নীচে টর্চ রইল, বোতলে খাবার জল, গ্লাস রইল। বাথরুমের আলোটা জ্বালিয়ে রাখতে পারো, ভয় করলে।

ভোরে আমার জন্যে তোমার তাড়াতাড়ি ওঠার দরকার নেই। ওদিকের ঘরের বাথরুম ব্যবহার করব আমি। যতক্ষণ ভাল লাগে ঘুমিও। মধ্যের দরজাটা ভেজিয়ে রেখো। ভয় নেই কোনো।

ছুটি এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার বলল, বুঝলাম।

তারপর বলল, আপনার ঘরে চলুন দেখি।

আমার ঘরে এসে ও বলল, শুয়ে পড়ুন, আপনার মশারি গুঁজে দিচ্ছি।

বললাম, তুমি আগে শোও। আমার এখন অনেক কাজ বাকি। সব ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে, বাতি নেবাতে হবে। তুমি আগে শুয়ে পড়ো।

ও বলল, তাহলে মশারিটা ফেলে, গুঁজে দিয়ে যাই অন্ততঃ—। বলেই, মশারিটা ফেলে গুঁজতে লাগল।

টেবলের উপর লেখার কাগজগুলো ছিল, ও শুধোলো, এখন কি লিখছেন?

বললাম, এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পটভূমিতে একটা উপন্যাস আরম্ভ করেছি। কি লিখছি তা জেনে তোমার লাভ কি? তোমার কি আমার লেখা পড়ার অবকাশ হয় এখন?

চোখে খুব রাগ ঝরিয়ে ছুটি বলল, তা ত বলবেনই, আপনি ত আর বলেন না, কোথায় লিখছেন—কি করে যে এখানে আপনার সব লেখা খুঁজে বের করি, তা আমিই জানি।

এটুকু বলেই, ওর চোখ দুটি বড় নরম হয়ে এল, ও স্বগতোক্তির মত বলল, খুব ভাল লাগে, জানেন...।

বলেই, থেমে গেল।

আমি বললাম, কি ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে, যখন কেউ আপনার লেখার প্রশংসা করে। বলেই, আমার দিকে তাকাল।

আমি ওর চোখে চাইলাম।

ও কথা না বলে মশারি গুঁজতে লাগল।

মশারি গোঁজা শেষ হলে ও বলল, শুতে যাচ্ছি।

পরক্ষণেই বলল, এই রে! একদম ভুলে গেছিলাম, বিজয়ার পরে দেখা, আপনাকে প্রণাম করতেই মনে ছিল না। বলেই নীচু হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

আমি ওকে দু'হাত ধরে টেনে তুললাম, টেনে তুলে ওর চওড়া সাদা পরিচ্ছন্ন সিঁথিতে একটা চুমু খেলাম। ও ছট্‌ফট্ করে উঠল। তারপর ওর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

আমি দুষ্টুমী করে বললাম, তোমাকে একবার আদর করতে খুব ইচ্ছা করছে, কিন্তু আমার ঠোঁটে এখন রাজরোগের বীজাণু! তোমার মুখের কাছে মুখ নেওয়াও সম্ভব নয়।

ও আদুরে গলায় বলল, থাক, অত আদর করে কাজ নেই।

ছুটি গিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনলাম।

আমি একে একে খাওয়ার ঘর, বাইরের ঘর, সব ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে ভিতরের বসবার ঘরে এলাম।

বৃষ্টির সময় ফায়ারপ্লেসের চুল্লী দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে ভিতরে। দেওয়ালে তার দাগ হয়ে গেছে। কিছু নোংরাও এসে জমেছে ভিতরে জলের সঙ্গে। কাল এগুলো পরিষ্কার করে, ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে, ছুটিটার নইলে বড় কষ্ট হচ্ছে ঠাণ্ডায়।

ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে সরে এসে আলো নিভাতে যাব বসবার ঘরের, এমন সময় ছুটির ঘরের দরজা খুলে গেল খুট্ করে। দেখি, ছুটি দাঁড়িয়ে আছে, একটা কমলা রঙ কটস্‌উলের নাইটি পরে। মুখে ক্রীম লাগিয়েছে। দু' বিনুনী করে চুল বেঁধেছে।

ওকে ভীষণ বাচ্চ বাচ্চা লাগছে—ওর লালচে ফর্সা রঙে ওকে মনে হচ্ছে, কোনো রেড-ইণ্ডিয়ান মেয়ে।

শুধোলাম, কি হল? ঘুমোওনি?

ও দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, না।

ওর চোখ দেখে মনে হল ও চাইছে, ভীষণ চাইছে, এই দারুণ শীতের কুঁকড়ে যাওয়া রাতে আমি একটু ওর কাছে যাই।

ওর সঙ্গে আমি ওর ঘরে গেলাম। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। নাইটিতে ঢাকা ওর বুকে আমার বুক রাখলাম।

ও ভাল লাগায় শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল, অসভ্য; আপনি একটা অসভ্য।

আমি ওকে ডাকলাম, ছুটি; আমার সোনা।

ছুটি যেন কোন ঘোরের মধ্যে, কত দূরের জঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে, কত শিশিরভেজা উপত্যকার ওপাশ থেকে আমার ডাকে সাড়া দিল, অস্ফুটে বলল, উঁ, আরামে বলল উঁ—উষ্ণতার আবেশে বলল, উঁ...।

আর কোনো কথা হলো না। ও আমাকে আশ্রয় করে, আমাতে নির্ভর করে, আমার শক্ত বুকে ওর নরম, লাজুক, উষ্ণ বুকের ভার লাঘব করে আমার সারা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রইল।

আমি ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, সোনা, আমার ছুটি, এবার ঘুমোতে যাও।

ছুটি অস্ফুটে বলল, না।

বললাম, ছুটি, তুমি এরকম করলে আমি ভীষণ কষ্ট পাব। আমার খুব খারাপ অসুখ ছুটি, এমন করে না।

ছুটি তবুও বলল, না।

তারপর বলল, আপনাকে যদি আর কখনো এমন করে না পাই? এত বছর ত সকলে মিথ্যা-মিথ্যি দোষী করল আমাকে; আপনাকে। অপবাদ যখন মাথা পেতে সহ্যই করব, তবে নিজেদের ঠকাব কেন? কার জন্যে ঠকাব? আমাদের সকলে ঠকাবে আর আমরা কেন অন্যদের ঠকাবার আগে এতবার ভাবব?

আমি ওকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে তোমাকে ঠকায় এমন কোনো শক্তি ত

নেই পৃথিবীতে। তোমার শরীরটাকে এই মুহূর্তে পেলেই কি ওদের উপর আমার জয় হবে ছুটি? এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, এই তোমার সমস্ত তুমি, তোমার মন, তোমার সুগন্ধি শরীরের তুমি, এই সমস্ত তুমিই ত আমার, চিরদিনের। যে চিরদিনের, যা বরাবরের তাকে অত তাড়াতাড়ি পেতে নেই। তোমার শরীর ত আমারই—যখনই আমি পেতে চাইব তখনি পাব—এর জন্যে এ অধীরতা কেন তোমার? আমি ত এই মুহূর্তে তোমাকে বুকে জড়িয়েই খুশী—। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন আমার অসুখ এখনো সারেনি। আমি ত জেনেশুনে তোমার প্রতি অবিচার করতে পারি না।

ছুটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, সুকুদা, আমার মন হয়ত আপনার, কিন্তু শরীরটা সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ হবেন না। আমার শরীর আমারই, আমার একার, এ শরীর অন্য কারো নয়। আমি জানি, আমার মন, আপনার ডাকে চিরদিন সাড়া দেবে। ভয় হবে, যদি শরীর না দেয়। আমার ভারী ভয় হয় যদি কখনো এমন হয় যে, আপনি কিছু চাইলেন আমার কাছে কিন্তু আমি তা দিতে পারলাম না।

তারপর একটু থেমে বলল, জানি না, আবার কবে কতদিন পরে আপনাকে এমন ভাবে, এমন নির্জনতায়, এরকম আপনার নিজের কাছে পাব। পরে আমাকে কিন্তু দোষ দেবেন না। বলতে পারবেন না, আপনার ছুটির কিছুমাত্র অদেয় ছিল আপনাকে।

আমি ওর গালের সঙ্গে গাল ছুঁইয়ে বললাম, কখনো বলব না ছুটি; এ কথা কখনো বলব না। তুমি দেখো, কোনোদিনও বলব না।

॥ ছয় ॥

শেষ রাতে আমি একবার উঠেছিলাম। ঐ পাশের বাথরুমে গেছিলাম।

ছুটির ঘর থেকে সাড়াশব্দ পেলাম না। অসাড়ে ঘুমোচ্ছে শেষ রাতে। আবার গিয়ে যে শুলাম, সে ঘুম ভাঙল ছটার সময়।

বালিশের নীচ থেকে হাতঘড়িটা বের করে সময় দেখলাম, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

এখনো বেশ ঠান্ডা। পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি। চতুর্দিক শিশিরে সাদা হয়ে রয়েছে।

বাবুর্চিখানার দিকে দরজা খুলতেই লালি আর হাসান সেলাম জানাল। একটু গরম জল চেয়ে নিয়ে খাওয়ার ঘরের বেসিনেই দাঁত মেজে নিলাম, মুখ ধুলাম।

ততক্ষণে হানিফ এসে গেছে। মেটে ও মাংস নিয়ে।

বাইরে রোদে চা দিতে বলে, ছুটিকে ডাকলাম।

একবার ডাকতেই ছুটি সাড়া দিল।

বললাম, কি? তুমি জেগে জেগে শুয়ে কার স্বপ্ন দেখছ?

ও বলল, আপনাকে তা বলব কেন?

বললাম, তোমার চা পাঠিয়ে দেব ঘরে লালিকে দিয়ে? না, উঠে চা খাবে?

ছুটি বলল, মুখ ধুয়ে চা খাব।

বললাম, তোমার বাথরুমের পেছনের দরজাটা খুলে দাও, লালি গরম জল এনে দিচ্ছে। এই ঠান্ডা জল মুখে লাগিও না, তাহলে সুন্দর মুখটার চেহারা ম্যাকলাস্কিগঞ্জের রিলিফ ম্যাপের মত হয়ে যাবে।

লালিকে জল দিতে বলে, আমি বাইরে গিয়ে প্রথম রোদে পাইচারী করতে লাগলাম!

রাস্তা ছেড়ে এখনো বাগানে নামা যায় না—ভিজে সপসপ করছে। গোলাপগুলোর পাপড়িতে শিশির পড়ে ঠান্ডায় জমে গিয়ে হীরের মত দেখাচ্ছে। চতুর্দিক থেকে পাখি ডাকছে—। তিতিরের গলা সবচেয়ে জোর শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে, নাইটি ছেড়ে কাল রাতের শাড়ি পরেই ছুটি এল।

দরজা দিয়ে বাইরে পা দিয়েই চোখ বড় বড় করে বলল, সুকুদা—কী-ই ভাল জায়গা—দারুণ সুন্দর। ঈস্‌স্‌ ক-ত্ত গাছ! সত্যি বলছি, আমার এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে সারা জীবন।

আমি হেসে বললাম, থাকো না, কে তোমাকে মানা করছে। বল, পছন্দ হয়ত এ রকম একটা বাড়ি তোমাকে কিনেই দিই। এ রকম বাড়ি তোমাকে আমি কিনে দিতে পারব। এখানে বাড়ির দাম খুব সস্তা।

ছুটি চা ঢালতে ঢালতে বললো, ও সবে আমার দরকার নেই। এই সব পার্থিব জিনিস আমার ভাল লাগে না।

কি ভাল লাগে তাহলে?

চেয়ার টেনে ওর সামনে বসতে বসতে বললাম আমি।

ও বলল, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, যতটুকু দিয়েছেন; তা যেন আমার চিরদিন থাকে। ও ছাড়া আর বেশী কিছু চাইবার নেই আমার।

আমি মুখ তুলে ছুটির মুখের দিকে চাইলাম।

ছুটি মুখ নামিয়ে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি বললাম, এ সব কথা থাক। কেমন ঘুম হল বল?

দারুণ। এক ঘুমে রাত পোয়ালো। তারপরই বলল, এখন আমরা কি করব?

এখন, মানে একটু পরে, আরেক কাপ চা খেয়ে চান সেরে নাও। তারপর পেয়ারাতলায় বসে ব্রেকফাস্ট খাও। নাস্তার পরে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। চলো, পাকদন্ডীর পথে তোমাকে স্টেশানে নিয়ে যাব। এখানের স্টেশান দেখবে, কি সুন্দর।

ওমা, এখানে রেল স্টেশানও আছে নাকি?

নিশ্চয়ই। স্টেশান নেই?

কোলকাতা থেকে সোজা আসা যায়?

হ্যাঁ, আসা যায় বইকি?

কি মজা। দেখি যদি স্টেশানটা পছন্দ হয়, তবে যখন কোলকাতায় যাব পরের মাসে, তখন কোলকাতা থেকে সোজা আপনার এখানে চলে আসব।

আমি বললাম, তা এস, কিন্তু বাড়িতে হেঁটে আসতে হবে। কোনোরকম ট্রান্সপোর্ট নেই।

এক জোড়া ঘুঘু ফলসাগাছ থেকে উড়ে এসে ভিজে মাঠে বসল। কি যেন খুঁটে খুঁটে খেল, তারপর উড়ে গেল।

ছুটি পাশের শাল সেগুনের জঙ্গলের দিকে চেয়ে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আনমনে ভাবল। অনেকক্ষণ, নিজের মনে নীচের ঠোঁটটা অনবধানে কামড়ে ধরল, তারপর বলল, তাহলে আমি চান করেই নিই। আপনি কি অন্য বাথরুমে যাবেন, না আমার চান হয়ে গেলে, এ বাথরুমে?

আমার এত সকালে চান করা ঠিক হবে না। তুমি চান করে নাও, তারপর ঐ বাথরুমেই চান করে নেব। আমার সাজসরঞ্জাম সব ও বাথরুমেই আছে।

ছুটি যখন চান করতে গেল, আমি তখন লালিকে দিয়ে বাইরের ঘরের বেতের টেবলটা পেয়ারাতলায় বের করিয়ে ব্রেকফাস্ট টেবল হিসাবে পাতলাম। একটা সবুজ সাদা চেক-চেক টেবল ক্লথ পাতলাম। এ জায়গাটা দু'দিন আগে গোবর দিয়ে নিকোনো হয়েছে—পরিষ্কার দেখাচ্ছে জায়গাটা। পেয়ারা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে সাদা বেতের টেবল-চেয়ারে রোদ এসে পড়েছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসতে ভারী আরাম লাগে।

এখানে রোজ ব্রেকফাস্টের সময়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে মনে হয় পৃথিবীর যত শান্তি সব বুঝি এইখানে এসে বাসা বাঁধছে। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ নেই, টেলিফোন নেই, ইচ্ছা করলেই যে কেউ শান্তি নষ্ট করবে, তারও কোনো উপায় নেই। যে শান্তি ভঙ্গ করতে আসবে, তাকেও বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটেই আসবে হবে।

একটু পরেই ছুটি চান করে বাইরে এল।

একটা সাদা খোলের লাল ও কালোপাড়ের পাছা-পেড়ে তাঁতের শাড়ি পরেছে—লাল টিপ পরেছে বড় করে। মাথার চুল খুলে এসেছে রোদে শুকোবে বলে। কী ভালো যে লাগছে ছুটিকে, কি বলব।

ছুটি বলল, সুকুদা, খুব আরাম করে চান করলাম।

ছুটি এসে আমার সামনে বসল। ওর চুল, ওর চোখ, ওর নাক, ওর কান, ওর দাঁত, ওর হাতের আঙুল, ওর পায়ের পাতা সব কিছুর মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন দীপ্তি যে, ও যখনি চান করে

ওঠে তখনি ওর দিকে অপলকে আমার চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ চোখ তুলে ছুটি বলল, কি দেখছেন?

তোমাকে।

এতদিনেও কি দেখা শেষ হয়নি আপনার? বোঝা শেষ হয়নি? এখনো কি কোনো সন্দেহ আছে? দ্বিধা আছে কোনো?

জানি না।

তবে এমন করে দেখছেন কেন?

আমি বললাম, কথা বলো না। জানো, এই সকালের পাখি-ডাকা, শিশির-ভেজা নরম প্রকৃতির পটভূমিতে তোমার এই সবে-চান-করে ওঠা নরম শরীর কেমন অদ্ভুত মানিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুমিও বুঝি এই পরিবেশেরই একটি আঙ্গিক। একটুও নড়ো না কিন্তু—তোমাকে দেখতে দাও আমাকে ভাল করে—।

কতক্ষণ যে ওখানে বসেছিলাম জানি না।

এক সময় ছুটি বলল, এখন রোদ বেশ গরম হয়েছে, এবারে আপনি চান করতে পারেন। গরম জল দিতে বলব আমি?

তুমি এখানে চুপ করে বসো ত দশ মিনিট। আমি চান করে দাড়ি কামিয়ে আসছি।

আপনি কখন দাড়ি কামান?

সকালে। কেন বলো ত? হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আমার এখনো জ্বালা করছে।

বলেই, ছুটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসল।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, ঠিক আছে, আজ সকাল, দুপুর, রাত্তির তিন বেলা দাড়ি কামাব।

ছুটি বাচ্চা মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠল। বলল, এ—ম্মা। আমি কি তাই বলেছি! আপনি ভীষণ খারাপ।

বাথরুমে আমি দাড়ি কামাচ্ছিলাম, এমন সময় লালি পেছনের দরজা ধাক্কা দিল গরম জল দেবার জন্য। গরম জলের বালতিটা দিয়ে লালি বলল, মেমসাহেবকা কোই কাপড়া হায় অন্দর? ধুপমে দেনেকা লিয়ে? ওকে বললাম, নেই। পরক্ষণেই আমার চোখ পড়ল, বাথরুমের র‍্যাকে। একটি ভিজে ব্রা, লেস-লাগানো ফিকে নীল নাইলনের প্যান্টি এবং সরু কোমরের একটি সায়া ঝুলছে র‍্যাকে।

লালিকে বললাম, নিয়ে যাও এসে।

সমস্ত বাথরুমটা ছুটির শরীরের সুগন্ধে ভরে আছে। আসলে গন্ধটা ওর সাবানের। সমস্ত বাথরুমটা গন্ধে ম ম করছে। সেই সুগন্ধি দরজা-জানালা-বন্ধ-করা ঘরে গরম জলে চান করতে করতে ছুটির শরীরের কথা ভেবে আমার সমস্ত শীত চলে গেল। আমার সমস্ত শরীর এই দারুণ হিমেল সকালে এক আশ্চর্য উষ্ণতায় ভরে গেল।

যে শরীরকে আমি ভালবাসি, যে নূপুরের মত নাভিকে আমি কল্পনায় দেখেছি বহুবার, যে মসৃণ রোমশ রেশমী কাঠবিড়ালিতে আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি বহুবার হাত ছুঁইয়েছি, যে-সমর্পণী বুকে আমি বহুবার আমার মাথা এলিয়ে এই দ্বিধা-বিভক্ত জীবনের সব ক্লান্তি অপনোদন করেছি, কল্পনার সেইসব এই সকালে যেন সত্যি হয়ে উঠল। আমার আর একটুও শীত রইল না।

ছুটি ঠিকই বলে, ডাক্তাররা শুধু শরীরের চিকিৎসা করে, তারা মনের চিকিৎসা জানে না।

ব্রেকফাস্টের পর ছুটিকে নিয়ে বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বললাম, ওই শাড়ি পরে এমন সুঁড়ি পথে যেতে পারবে?

ছুটি লাল আর কালো ফুল-তোলা কার্ডিগানটার বোতাম বন্ধ করতে করতে বলল, একজন রোগী মানুষ যদি পারে, তাহলে একজন সুস্থ মানুষী নিশ্চয়ই পারবে।

গেটের পেছনেই নালাটা। জল যাচ্ছে তিরতির করে। পাথরের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে গাড্‌হাতে জল জমে আছে। ক্ষুদে ক্ষুদে গাছগুলো তিড়িংবিড়িং করছে। চতুর্দিকে সেই হলুদ জংলী ফুলগুলো ফুটেছে। ওদের ফিনফিনে পাপড়িতে সকালের রোদ লেগেছে।

উপরে এখন এক-আকাশ ঝকঝকে রোদ্দুর। পাখিদের চিকন গলায় রোদ পিছলে যাচ্ছে।

ঘন পিটিসের ঝোপের মধ্যে দিয়ে খোয়াই-এর লাল পথ উঠে গেছে পেছনের মালভূমির মত টাঁড়ে। পিটিসের ফুলগুলো কমলারঙা, কতগুলো লালও আছে। কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ওদের ফুলে।

চড়াইটা উঠেই ছুটি এক দৌড়ে মালভূমিতে পৌঁছে গেল—পৌঁছে গিয়েই মাথা উঁচু করে নিশ্বাস নিল—বলল, আঃ।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই আমার হাতে হাত জড়িয়ে বলল, আপনি যদি আমাকে মেরে তাড়িয়েও দেন, আমি এখান থেকে যাবো না।

বলে, সামনের টাঁড়ের দিকে চেয়ে রইল।

সুদূরবিস্তৃত মাঠ—মাঝে মাঝে পিটিস ঝোপ, কুঁচফলের গাছ, হলুদরঙা গোল গোল ফলের ঝোপ (আমি এদের নাম দিয়েছি জাফরানী), মাঝে মাঝে মহুয়া গাছ। বাঁ দিকে নাক্‌টা পাহাড়, কঙ্কা বস্তীর রাস্তা—সামনে দূরে কয়েক ঘর ওরাঁও-এর-গ্রাম—আর যতদূর চোখ যায় শুধু হলুদ আর হলুদ। সর্ষে আর সরগুজো লাগিয়েছে ওরা। উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ, নীচে সবুজের আঁচলঘেরা এই হলুদ স্বপ্নভূমি।

ছুটি কথা না বলে তেমনি করে দাঁড়িয়েই রইল।

আমি বললাম, কী? এগোবে না?

ও তবুও কথা বলল না।

আমি ডাকলাম, ছুটি, ও ছুটি।

ছুটি আমার দিকে মুখ ফেরাল, দেখলাম ওর দু' চোখে দু' ফোঁটা জল টলটল করছে।

আমি আকাশকে সাক্ষী রেখে ওর দু' চোখের পাতায় চুমু খেলাম।

ছুটি বলল, সুকুদা, বহুদিন পরে আজ আনন্দে আমার চোখে জল এল। সেই যে-বার হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছিলাম সেদিন আনন্দে কেঁদেছিলাম—মনে আছে, বাবা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন—আমাকে শূন্যে তুলে বলতে লাগলেন, আই এ্যাম সো প্রাউড, আই এ্যাম সো প্রাউড অব উ্য। আমি কেঁদে ফেলেছিলাম।

ছুটির চোখে আবার জল দেখলাম।

বললাম, একি, এ আবার কি? আবার কেন?

জল-ভরা চোখে ছুটি হেসে ফেলল, মিষ্টি হাসি। বলল, বাবার কথা মনে পড়ে গেল, তাই। তারপর বলল, জানেন সুকুদা, আপনি যখন আমাকে আদর করেন, তখন কেন যেন আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর, আপনার মত করে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি।

আমি ওর কোমরে হাত রেখে বললাম, ছুটি, চলো আমরা এগোই—এরপর ফিরে আসতে কষ্ট হবে, রোদ দেখতে দেখতে কড়া হয়ে যাবে।

ছুটি বলল, এক সেকেন্ড দাঁড়ান, প্লিজ, আমি একটু কুঁচফল তুলে নিয়ে আসি, বলেই দৌড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে তোড়া শুদ্ধুই শুকনো কুঁচফল তুলে আনল। বলল, কী দারুণ—না?

তারপর লাল কালো কুঁচফলগুলোকে তোড়া শুদ্ধুই নিজের হাতব্যাগে পুরে ফেলল।

আমরা যখন সর্ষে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মাঠ পেরুচ্ছি, তখন হঠাৎ ছুটি বলে উঠল, "সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।"

মনে আছে?

আমি বললাম, আছে।

তারপরই আমাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, কি হল, আপনি একেবারে চুপ করে আছেন যে?

বললাম, খুব ভালো লাগছে, তাই।

কেন? ভালো লাগছে কেন?

টেনে টেনে আন্তরিকতার সঙ্গে ছুটি শুধোল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে বললাম, কেন ভাল লাগছে, তুমি জান না? কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, বিশ্বাস করো, কতদিন স্বপ্ন দেখেছি অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে, একটু ভাল হয়ে উঠলে তোমার সঙ্গে এই হলুদ মাঠ পেরোব—ভেবেছি তুমি সঙ্গে থাকলে, তুমি কাছে থাকলে, তোমার

হাত ধরে একবারের জন্যে এই আকাশভরা আলোয় এই হলুদ মাঠ পেরোতে পারলে আমি চিরদিনের মত ভালো হয়ে যাব। আর কখনো কোনো অসুস্থতা আমাকে পীড়িত করবে না।

ছুটি সামনে সামনে যাচ্ছিল, থেমে পড়ে আমার পাশে এল; বলল, দেখবেন সত্যিই আপনি একেবারে ভাল হয়ে যাবেন। আপনি দেখবেন।

দেখতে দেখতে আমরা সেই সাদা পোড়ো বাড়িটার কাছে এলাম। জর্জ ওর ছেলেকে নিয়ে পথের পাশে মহুয়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল।

জর্জ আমাকে উইশ করল।

আমি শুধোলাম, কি জর্জ? ভূতের উপদ্রব কমেছে, না রাতে এখন এখানেই শুচ্ছ!

ও বলল, না। রাতের বেলা স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে প্যাট প্লার্সকিনের কাছে গিয়ে শুই।

একটু এগিয়ে যেতেই ছুটি শুধোলো, কি বলছিলেন, ভূত ভূত?

আমি বললাম, এরা বলে এ বাড়িতে রাতের বেলা নানারকম আওয়াজ শোনা যায়। এই যে ছেলেটি দেখছ এর নাম জর্জ—জর্জ ব্যানার্জি। এ কাজ করত এখানেরই একটা কোলিয়ারিতে—তারপর সেখানের এক রেজা কুলিকে বিয়ে করে। বাচ্চাটি জর্জের ছেলে।

কেন এরকম করল? ছুটি শুধোল।

ভাল লেগে গেছিল। কাউকে যদি কারো ভালো লেগে যায় ত কি করবে বল? তবে এই বিয়ের জন্যে বেচারাকে যা মূল্য দিতে হয়েছে তা ওই জানে। রেজাকে বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে নাকি চাকরি গেছিল। তারপর শুধু চাকরি যাওয়াতে সব শেষ হয়নি; সমাজ আরো যতরকম প্রতিশোধ নিতে পারে ওর উপর নিয়েছিল।

জর্জ এখন যে-কোনো কাজ করে। টাকা পেলেই হল। কিছুদিন আগে এখানের একটা বাড়ির সেপ্‌টি ট্যাঙ্ক খারাপ হয়ে যায়, এখানের একমাত্র জমাদার অনেক টাকা চেয়েছিল—যেহেতু সে একমাত্র জমাদার। জর্জ মাত্র ত্রিশ টাকার বিনিময়ে নীচে নেমে বাল্‌তি করে সেই ময়লার ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেছিল।

ঈস্‌স্‌ কি দুর্দশা! ছুটি বলল।

বললাম, দুর্দশা বল আর যাই-ই বল, এ কথা জানার পর ছেলেটার উপর আমার ভক্তি হল। দোষের কি বল? ভিক্ষাও চায় না, কারো কাছে মাথাও নোওয়ায় না, যা করেছে ভুল বা ঠিক তা করেছেই। সমাজের ভয়ে, সুখে থাকার বিনিময়ে, নিজের সিদ্ধান্তকে পরমুহূর্তে বাতিল করেনি। তুমি জানো না গরমের দিনে অনেক সময় জর্জ শুধু পাকা মহুয়া খেয়ে থেকেছে। জানো ত, সিনিয়র কেম্ব্রিজ অবধি পড়েছে ও।

আপনি ওর জন্যে কিছু করেন না?

করি, আমি বললাম; আমার সাধ্যমত। আমি এসেই ওকে টুকটাক কাজ দিয়েছি—খেতে বলি আমার সঙ্গে। এতে কতখানি উপকার হয় জানি না, তবে একটা মস্ত উপকার হয় এই যে, ও বুঝতে পারে ওকে সকলেই খরচার খাতায় লেখেনি! সমাজে হয়ত কিছু লোক এখনও আছে যারা ওর এই সৎসাহসের প্রশংসা করে। কিছু লোকের মনে এখনো ওর জন্যে সহানুভূতি আছে।

ওর স্ত্রী কেমন দেখতে? খুব সুন্দরী বুঝি?

সুন্দরী কিছু নয়, সাধারণ রেজা মেয়েরা যেমন হয়। একদিন আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। তবে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

আরো জানো, জর্জ একদিন দুঃখ করে আমাকে বলেছিল, একমাত্র পাদ্রী সাহেব ছাড়া আর কেউ তোমার মত আমাকে সাপোর্ট করেনি। এমনি দুঃখ-কষ্ট যা পাবার সে ত আমাকেই পেতে হয়েছে, মানে আমাদের; কিন্তু ওকে ছেড়ে দেওয়ার সহজ পন্থা যে সকলে বাতলেছেন তা সহজ হলেও যে সৎ নয়, এ কথা কেউই বলেনি। ও বলছিল, পাদ্রী সাহেব একদিন ওকে বলেছিলেন যে, 'ইফ উ্য আর এ গুড ক্রিশ্চিয়ান, উ শ্যাল নেভার ফোরসেক হার।' জর্জ বলেছিল, 'এন্ড উ্য সী, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বী আ গুড ক্রিশ্চিয়ান।'

ছুটি বলল, বাঃ। এত কষ্ট পাচ্ছে, তবু মেয়েটাকে ছাড়েনি, না? তারপর বলল, এখানে দেখছি দারুণ দারুণ সব ক্যারেকটার আছে। খুব ইন্টারেস্টিং। আপনি যদি এ জায়গা নিয়ে লেখেন তবে চরিত্রের অভাব হবে না, কি বলেন?

আমি হাসলাম। বললাম, সে কথা কিন্তু সত্যি। এমন পরিবেশ এবং এমন বিচিত্র লোকজন,

এ'দের নিয়ে লিখলে লেখা হয়ত কখনো ফুরাবে না।

দেখতে দেখতে আমরা নালা পেরিয়ে চড়াইটা উঠে দীপচাঁদের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে স্টেশানের রাস্তায় পড়লাম।

পোস্টাফিসের গা ঘেঁষে, মুঙ্গারামের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে স্টেশানে পেঁছে গেলাম।

ছোট্ট স্টেশান। প্লাটফর্ম উঁচু নয়। মাটিতেই প্লাটফর্ম। ওপারে ঘন শালবন। আউটার সিগন্যাল জঙ্গলের মধ্যেই। দু' একজন পেয়ারাওয়ালা, আতাওয়ালা বসে আছে সওদা নিয়ে, পানিপাঁড়ে ট্রেন আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। স্টেশানের এক পাশে কার্নি মেমসাহেবের চা-এর দোকান।

স্টেশান মাস্টারমশাইয়ের ঘরে জোর আড্ডা বসেছে। মাস্টারমশাই, এ, এস, এম, গাঙ্গুলী-বাবু, সাহা বাবু, পোদ্দারবাবু, শৈলেন ঘোষ সকলের গলা শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হচ্ছে অন্য স্টেশানের সঙ্গে—'গুমিয়া, হ্যালো গুমিয়া, ম্যাকলাস্কি বলছি, বড়বাবু; হ্যালো গুমিয়া, গুমিয়া।'

টক্কা-টরে টরে-টক্কা, টক্কা-টরে মেসেজ আসছে, মেসেজ যাচ্ছে।

একবার মাস্টারমশাই বাইরে এলেন, এসে আমাকে দেখেই নমস্কার করলেন, আমিও প্রতি-নমস্কার করলাম।

বললেন, কি? কাউরে নিতা আইছেন নাকি? তা অইলেই খাইছে—আজও দ্যাড় ঘণ্টা লেট।

আমি হাসলাম, বললাম, না নিতে আসিনি কাউকে, এমনি বেড়াতে এসেছি।

ছুটি বেড়াতে বেড়াতে মিসেস কার্নির দোকানের সামনে চলে গেছিল। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আমি যেতেই চোখ বড় বড় করে বলল, কী দারুণ আলুর চপ ভাজছে দেখুন। খাবেন?

আমি বললাম, তুমি খাও।

না। আপনি একটা না খেলে খাব না আমি।

আমি বললাম, আমার এখন আজেবাজে জিনিষ খাওয়া বারণ।

ও হাত উল্টে বলল, তাহলে আর কি হবে? আমার খাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুব।

আমি হেসে বললাম, তুমি ভীষণ মতলববাজ হয়েছ।

ও-ও হাসল, বলল, হইনি, বরাবরই ছিলাম; আগে লক্ষ্য করেননি।

ইতিমধ্যে মিসেস কার্নি ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, বললেন, হ্যালো ডিয়ার, তুমি ত আর আন্টির খোঁজও নাও না।

আমি ওর সঙ্গে ছুটির আলাপ করিয়ে দিলাম। মিসেস কার্নিকে আমি ডাকি 'ইয়াং লেডি' বলে। সাতষট্টি বছর বয়সে, এখনো ফুল ফুল টুপী মাথায় দিয়ে লেডিজ সাইকেল চালিয়ে ক্রমাগত লাপরা—কঙ্কা—হেসালঙ্ করেন।

আলুর চপ খাওয়াতে খাওয়াতে ছুটিকে বলছিলেন উনি, ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পুরোনো কথা।

মিসেস কার্নি এক বিস্ময়। ওঁকে যতই দেখি, ততই অবাক হতে হয়। এক সময় ওঁর স্বামী এখানের কলোনাইজেশান সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। গাড়ি ছাড়া চড়তেন না, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই ছিল। এখন শুধু স্মৃতি আছে, আর আছে আত্মসম্মান। যে আত্মসম্মানের বশে ছোট্টখাট্ট মানুষটি তাঁর ছোট ছোট নরম হাতে এই কঠোর পৃথিবীর সঙ্গে সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি একা লড়াই করে যাচ্ছেন।

আলুর চপ শেষ করে মাটির ভাঁড়ে চা খেলাম আমরা দুজনে।

ছুটি ভারী খুশী। বার বার বলতে লাগল, আমি কিন্তু কোলকাতা থেকে সোজা একবার ট্রেনে করে আসব—আপনি বেশ আমাকে নিতে আসবেন স্টেশানে, তারপর দুজনে গল্প করতে করতে পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে হলুদ ক্ষেত পেরিয়ে আপনার বাড়ি পেঁছব।

আমি বললাম, কিন্তু হলুদ ক্ষেত ত চিরদিন হলুদ থাকবে না।

ও মুখ ফিরিয়ে বলল, কোনো হলুদ ক্ষেতই চিরদিন থাকে না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ত থাকবে। সব থাকবে। এই সকাল, আপনার সঙ্গে ফুল মাড়িয়ে এই বেড়াতে আসার স্মৃতি। এ সব চিরদিনই থাকবে।

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসেস কার্নিকে বললাম, একদিন বিকেলে আসব স্টেশানে, তারপর আপনার বাড়ি যাব গল্প করতে।

ইয়াং লেডী খুব খুশী হলেন। বললেন, নিশ্চয়ই এসো, খুবই আনন্দিত হব।

আরো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে, ছুটি বলল, সুকুদা, এবার চলুন ফিরি। ফিরে গিয়ে আপনাকে একটা জিনিস রান্না করে খাওয়াব।

স্টেশানের গেটের কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন শৈলেনের সঙ্গে দেখা।

ও বলল, এই যে দাদা, আমরা এবার থিয়েটার করছি, আপনি থাকবেন ত সে সময়?

আমি বললাম, আমি ত এখানেই মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসেছি। এখন নড়বার নাম পর্যন্ত করব না। কিন্তু কি থিয়েটার?

'পলাতক'। মনোজ বসুর লেখা। সেই যে সিনেমা হয়েছিল না! আমি হিরোর রোল করব। কি দাদা? মানাবে না!

বললাম, নিশ্চয়ই মানাবে। কিন্তু তুমি গান গাইতে পারো ত?

পারি না? গাইব এখুনি?

ওর কথার ধরনে ছুটি মুখ লুকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, এখন দরকার নেই। আমি তোমাদের রিহার্শালে আসব একদিন।

তা ত আসবেনই—আর খালি আসলেই হবে না, চাঁদাও দিতে হবে কিন্তু।

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই! চাঁদাও দেব।

স্টেশান ছেড়ে হেঁটে আসতে আসতে ছুটিকে বললাম, এই শৈলেন ছেলেটা ভারী প্রাণবন্ত। সব সময় ও হাশিখুশী, প্রাণে ভরপুর। ও সেদিন কি বলছিল জানো, বলছিল, দাদা, তারাশঙ্করের 'কবি' পড়েছেন? ভাল লাগে না? আহা কি সব গান? "ভালোবেসে সুখ মিটিল না হায়, এ-জীবন এত ছোট কেনে?" সত্যি দাদা, আমাদের জীবনটা এত ছোট কেন বলতে পারেন—? আমার ইচ্ছা করে হাজার বছর বাঁচি।

সব শুনে ছুটি বলল, ছেলেটা কেমন পাগল পাগল। এসব ছেলেদের মন খুব ভাল হয়।

আমি বললাম, শৈলেন একটা দারুণ কনট্রাস্ট চরিত্র। ওকে ফুলপ্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরে তার উপর র‍্যাপার মুড়ে বসে আড্ডা মারতে দেখলে ওর সম্বন্ধে এক ধারণা হয়, আর ও যখন রেলের উর্দি পরে গম্ভীর মুখ করে স্টেশানের গেটে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করে তখন ও অন্য লোক। তখন দেখে বোঝারই উপায় থাকে না যে মানুষটা এমন গান গায় বা পাগলামি করে বেড়ায়, তখন দেখে মনে হয় সৃষ্টির আদি থেকে ও বুঝি এমনি টিকিট চেক করেই আসছে।

ছুটি বলল, শুধু শৈলেন কেন? হয়ত আমরা সকলেই এরকম। আপনি যখন চেম্বারে বসে কাজ করেন, আমি যখন অফিসে কাজ করি, তখন কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে, আমরা এমন পাগলের মত ভালোবাসতে পারি?

তারপরই বলল, সরি সরি, বলা উচিত—আমি। আমরা বলাটা অন্যায় হল।

আমি জবাব দিলাম না কথার, ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

তারপর ছুটি বলল, ও একেবারে বাচ্চা ছেলে ত?

বাচ্চাই ত? কতই বা বয়স হবে?

তারপর অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ এলাম।

ছুটি শুধোলো, আপনার কষ্ট হচ্ছে সুকুদা? রোদ্দুরে? ছায়ায় দাঁড়ালেই শীত করছে আর রোদে গেলেই গা পুড়ে যায়, তাই না?

বললাম, তুমি আমার পাশে থাকলে কখনোই আমার কষ্ট হয় না। আসলে তোমারই কষ্ট হচ্ছে।

অনেক কষ্ট আমার সহ্য করতে হয়। এসব একটু-আধটু সখের কষ্টকে আজকাল আর কষ্ট বলে মনেই হয় না।

দূর থেকে সেই হলুদ ফুলের মাঠ দেখা যেতে লাগল। একদল তিতির উড়ে গেল মহুয়াতলা দিয়ে। আশেপাশে কাদের গরু চরছিল নীচের খাদে। গরুর গলার ঘণ্টার টুং-টাং ভেসে আসছিল হাওয়ায়।

আমার সামনে সামনে সেই হলুদ ক্ষেতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ছুটি। আর আমি চলেছিলাম ওর পায়ে পায়ে, চুপ করে। একটা অলস হলুদ সুগন্ধি ছায়া আমার সমস্ত বোধকে আচ্ছন্ন

করে রেখেছিল।

আমি স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলছিলাম।

॥ সাত ॥

হাসানকে কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ খুব ভোরে লালি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে গরম জল করেছে।

এখানে সাতটার আগে এখন রোদ ওঠে না এবং চামার রাস্তা দিয়ে বাসটা সাতটা অথবা সাতটার আগেই পাস করে যায়। তাই যাদের রাঁচী যাবার, তারা সকলেই একটু আগেই গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ, বাসে, এই একমাত্র বাসে, যেতে না পারলে সকাল সকাল রাঁচী পেঁছনোর আশা নেই।

অন্যভাবে যাওয়া যে যায় না তা নয়, খিলাড়িতে গিয়ে অথবা টোড়ি স্টেশানে ট্রেনে গিয়ে সেখান থেকে বাস ধরে যাওয়া যায়। খিলাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়া কোনো কয়লার ট্রাক ধরতে পারলে তাতেও যাওয়া যায়। কিন্তু সে সবই অনিশ্চিত এবং ঝামেলার। তাই যখন গঙ্গা বাস দয়া করে চলে, তখন লোকে গঙ্গা বাসকেই ভরসা করে থাকে।

তবে গঙ্গা বাসের দয়া বছরের বেশীর ভাগ সময়েই নাকি ইদানীং হয় না।

ম্যাকলাস্কি থেকে চামা অবধি এই সাত-আট মাইল রাস্তাটুকুকে রোড ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের টার্মিনোলজীতে 'ফেয়ার ওয়েদার' রোড বলে। সেই জন্যে বছরের মধ্যে যে-কদিন বাসের মালিক পক্ষর মতে আবহাওয়া এবং রাস্তা যথেষ্ট ভাল মনে না হয়, ততদিন এ-বাস অন্যান্য লাভজনক রুটে চলে। এ-রুটে বাস প্রায়ই থাকে না।

কিন্তু ম্যাকলাস্কিগঞ্জের কয়েকজন বয়স্ক, বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত লোক এবং আমাদের মত কিছু প্রভাবহীন যাওয়া-আসা করা লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথা কে ভাবে? বধির কানে নিষ্ফল প্রতিবাদ তুলে সমস্ত রকম অসুবিধাই সহ্য করতে হয়।

এ-বছর বারো মাসের মধ্যে আট মাস বাস চলেনি এ-রাস্তায়, অথচ প্রাইভেট গাড়ি, ট্রাক, জীপ, সবই সারা বছর, এমনকি ঘোরতর বর্ষাতেও যাতায়াত করে এবং করেছে।

এখন শীতের সময়টা বাস চলছে।

চোখ-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে ভিতরের ড্রইং-রুমে বসে চা ঢালছিল ছুটি।

আজ সকালে ও একটা কালো শাড়ি পরেছে, সাদা ব্লাউজ, গায়ে সেই ফুলতোলা সাদা শাল। এখনো ভুরুতে আইব্রো-পেন্সিল ছোঁয়ায়নি। ওর ভুরুদুটি কেমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, আমি চা বানাচ্ছি, তুমি যাও ত, তোমার ভুরু ঠিক করে এসো।

ও প্রথমে লজ্জা পেল, তারপর বলল, আমি না-সেজে থাকলে বুঝি আমাকে ভাল লাগাতে আপনার কষ্ট হয়?

আমি বললাম, না তা নয়। তোমাকে আমি সব সময় তোমার সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় দেখতে ভালবাসি।

চা-টা ঢালতে ঢালতে ছুটি বলল, অতএব বোঝা যাচ্ছে, আদৌ আপনি আমাকে ভালোবাসেন না। আমার ত মনে হয়, যদি কারো কাউকে ভাল লাগে ত যে-কোনো চেহারায়, যে-কোনো অবস্থায়ই ভাল লাগে। মানে, ভালো লাগা উচিত।

আমি জবাব দিলাম না।

ছুটি উঠে পড়ে বলল, ধরুন, আপনার চা। আমি এখুনি আসছি।

ঘরের মধ্যে তখনো অন্ধকার। আমরা আলো জ্বালিয়ে বসেছিলাম।

বাবুর্চিখানায় টুং-টাং শব্দ হচ্ছিল।

ছুটি বলেছিল কিছুই না-খেয়ে যাবে, তারপর পীড়াপীড়িতে রাজী হয়েছে, শুধু দুখানা টোস্ট আর স্ক্র্যাম্বল্‌ড এগস্‌ ও আরেক কাপ চা খেয়ে ও রওয়ানা হবে বলে।

বাসের এখনো মিনিট পনেরো দেরী।

বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা। চতুর্দিক সাদা হয়ে রয়েছে বরফপাতের মত রাতের শিশিরে। পাখি-

গুলোও সব এখনো স্তব্ধ হয়ে আছে।

ছুটির ঘরে আলো জ্বলছিল। আয়নার সামনে ও বসে কি করছিল জানি না। হয়ত এই সাত-সকালে ওকে সাজতে বলায় ও আমাকে ভুল বুঝেছে।

মনে মনে আমি নিজেকেও কম বকিনি, এখনও বকছি।

আসলে, এই জড় ও স্থূল সংসারের মধ্যে বাস করে এমন বাড়াবাড়ি সৌন্দর্যজ্ঞান থাকার কোনো মনে হয় না। এই সৌন্দর্য-প্রীতির জন্যে মূল্যও যে কম দিতে হয়েছে তা নয়, কিন্তু ছুটিকে কোনোদিনও অসুন্দর দেখিনি এক মুহূর্তের জন্যও। তবু অসুস্থ না থাকলে, ও কখনও এক মুহূর্তের জন্যে আমার সামনে আসেনি না সেজে। অবশ্য না সেজে থাকলেও ওকে আমি সব সময়ই সুন্দর দেখি। ও জানে, ওর জানা উচিত, আমি কি বলতে চেয়েছিলাম।

এমন সময় ছুটি ডাকল, সুকুদা, একবার আসুন। দেখে যান একটা জিনিস।

আমি বললাম, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হবে না, এখুনি যাচ্ছি। আপনি আসুন না, এক সেকেণ্ড।

আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়েছে।

ও আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে আয়নায় আমার ছায়ার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, সুখী? বলুন, আপনি সুখী ত?

আমি নীচু হয়ে ওর ডান কানের লতিতে আলতো করে একটা চুমু খেলাম।

ছুটি মুখ নীচু করে ফেলল।

পরমুহূর্তেই যেই মুখ তুলল ছুটি, দেখলাম ওর কাজল-মাখা চোখ কি যেন বলবে বলে অধীর।

ছুটি আমার দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে অস্পষ্ট অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে এখানে থাকতে দিন, আপনার সঙ্গে, আপনার কাছে থাকতে দিন। আমি বড় একা সুকুদা। আপনি ছাড়া আমার কাছের কেউ নেই। আপনাকে ফেলে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

আমি ওকে দু' হাতে তুলে নিলাম, ও অনেকক্ষণ আমার বুকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, ছুটি—ও ছুটি—পাগলামি কোরো না। চলো চা খাবে চলো।

ছুটি আমার সঙ্গে সঙ্গে ও-ঘরে এলো।

চা একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। লালিকে পট নিয়ে গিয়ে আবার চা আনতে বললাম।

ছুটি আমার সামনে বসেছিল, চতুর্দিকের আলোহীন শীতার্ত পরিবেশের মধ্যে আলোকিত উষ্ণ ঘরে।

ছুটি আমার দিকে এবং আমি ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমাদের দুজনের চোখ, দুজনের মন. কী এক আশ্চর্য অপ্রকাশ্য সুস্থ রোমাঞ্চকর উষ্ণতায় ভরে গেল। তারপর সেই উষ্ণতা সেই শীত-সকালে আমাদের মন ভরে দিয়ে উপছে গেল দিকে দিকে; রঙীন রোদ গড়িয়ে গেল শিশির-ভেজা ঢালে ঢালে, পাখি ডেকে উঠলো ডালে ডালে, চতুর্দিকে সঞ্চারিত সদ্যোজাত প্রাণের আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

ছুটির জল-ভেজা চোখে এক দারুণ খুশী ঝিলিক দিয়ে উঠল, তারপর দেখতে দেখতে ওর মুখের সব বিষাদ এক পরিতৃপ্তির দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠল।

ছুটি আমার দিকে চেয়ে হাসছিল, আমিও ওর চোখে চেয়ে হাসছিলাম।

আমি গিয়ে বাইরের দরজা খুললাম।

ছুটি চায়ের পেয়ালা নিয়ে আমার গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

আমরা দুজনে সবিস্ময়ে দেখলাম, সমস্ত পৃথিবীতে এই প্রথম ভোরের আশ্চর্যতায় আলো আর শব্দের এক কোমল নরম যুগলবন্দী বাজছে।

একটু পরে লালি চায়ের সঙ্গে খাবারটুকুও নিয়ে এল।

ছুটি অনিচ্ছার সঙ্গে খেল।

তারপর মালু ছুটির স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল, যদি বাস এসে পড়ে তবে তাকে দু-এক মিনিট রুখবে বলে।

আমি আর ছুটিও বেরোলাম।

ও মুখ নীচু করে হাঁটছিল। কথা বলছিল না কিছু।

একবার বলল, রাঁচীতে কখন পেঁছব?

বললাম, দশটা নাগাদ পেঁছে যাবে।

তারপর বললাম, আবার কবে আসবে?

ও বলল, জানি না, দেখি আবার কবে ছুটি পাই। এমনি করে শুধু রবিবারের জন্যে, একদিনের জন্যে আসব না। এতে শুধু কষ্ট। এবারে এলে তিন-চারদিন ছুটি নিয়ে আসব।

আমি বললাম, কুঁচফলগুলো নিয়েছ?

ও হাসল, বলল, হ্যাঁ, ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখব, এখানের কথা মনে পড়বে।

তারপর আর কোনো কথা হলো না।

চারিদিকের নানারকম প্রভাতী পাখির কলকাকলীর মধ্যে আমরা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরে থেকে বাসটা আসার শব্দ শোনা গেল।

ছুটি ফিসফিস করে বলল, চিঠি দেবেন কিন্তু। রোজ একটা করে চিঠি লিখবেন আমাকে। বলুন লিখবেন? বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, রোজ চিঠি পেলে, চিঠি পেতে আর তোমার ভাল লাগবে না। তুমি দেখো, লেখার মত কিছু থাকলে, লিখতে যখনি ইচ্ছা করবে, তখনি লিখব, তুমি দেখো।

আর ইচ্ছা না করলে লিখবেন না?

ইচ্ছা করবে, সব সময়ই হয়ত ইচ্ছা করবে, তবুও রোজ লিখব না। তুমি জানো, কেন রোজ লিখব না!

না। আমি জানি না। আমি কিছু জানতে চাই না। আমি রোজ চিঠি চাই।

বাসটা এসে গেল।

গিরধারী ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এ বাঁ হাত রেখে ডান হাত তুলে নমস্কার করল।

ছুটি আমার দিকে ফিরে বলল, আসি। ভাল হয়ে থাকবেন।

বাস ভর্তি লোক ছিল, আর কোনো কথা বলার সুযোগ হল না, ওর হাতে হাত রাখার সুযোগ হলো না। বললাম, এসো। তুমি আমাকে চিঠি লিখো।

ও মাথা হেলালো, বাসে উঠে সামনের দিকে জানালার পাশে বসল।

বাসটা ছেড়ে দিল।

অনেকক্ষণ, অনেক অনেকক্ষণ পাখির ডাক ফুলের গন্ধ শিশিরের নরম হালকা সুবাস সব ছাপিয়ে আমার ছুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে-যাওয়া কর্তব্যের বাসটার পোড়া পেট্রলের গন্ধে আকাশটা ভরে রইল। আবহাওয়া তার গীয়ারের গোঙ্গানিতে গাঢ় হয়ে রইল।

ছুটির সঙ্গে আমার অনেকখানি অশরীরী—আমি, অনবধানে গঙ্গা বাসে মনে মনে ছুটির পাশে বসে উধাও হয়ে গেল।

॥ আট ॥

শুক্রবারের হাটে গেছিলাম।

এসব হাটে বাণিজ্য হয়, বিকিকিনি হয়, কিন্তু ব্যবসাদারী গন্ধটা শহরের বাজারের মত তীব্র নয়। হাটের দিনে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের দেখে মনে হয়, এরা যেন সবাই একটা খেলায় মেতেছে।

বড় রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুর পড়ে। তাই বাড়ির পেছনের তিতিরকান্নার হলুদ মাঠ পেরিয়ে, মহুয়া গাছগুলোর তলায় তলায় ঝাঁটি জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে পায়ে-চলা পথ চলে গেছে টিলা-নালা পেরিয়ে, সে পথ দিয়ে চললাম।

শর্টকাটে এলে গির্জার সামনে উঠতে হয়। তারপর ছোট্ট একটা বস্তি। বস্তি পেরোলেই লেভেল-ক্রসিং। লেভেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়ে লাইনটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ডাইনে সোজা চলে গেছে খিলাড়ি পত্রাতু হয়ে বাড়কাকানার দিকে—আর বাঁদিকে গেছে হেহেগাড়া, রিচুঘুটা, কুমান্ডি চীপাদোহর হয়ে ডালটনগঞ্জে।

লেভেল-ক্রসিং পেরুলেই মিস বনারের বিরাট পাকা বাড়ি। এই অবিবাহিতা একাকী বৃদ্ধা সারাদিন হাঁস-মুরগীর দেখাশোনা করেন। শীতের দুপুরে দাঁড়িয়ে নিজের মনে রাজহাঁসদের

সঙ্গে কথা বলেন।

তাঁর বাড়ি পেরুনোর পর বাঁয়ে আরো অনেক বাড়ি—হেসালঙের পথের পাশে।

পথটা সোজা চলে গেছে। মাঝপথে একটা মোড়। ডাইনে ঘুরলে হেসালঙের হাটের রাস্তা। মোড় ছেড়ে সোজা একটু গেলেই শুঁড়িখানা। ইতস্ততঃ শালপাতার দোনা ছড়ানো ছিটানো। মত্ত অবস্থায় যুবক-যুবতীরা, আর মুখে-খেউড় চোখে-কেতুর ভস্মপ্রায় বৃদ্ধরা।

হাট পেরিয়ে পথটা সোজা চলে গেছে খিলাড়ির দিকে, এ সি সি কোম্পানীর সিমেন্ট ফ্যাকটরীতে।

মালু আগে আগে চলেছিল, মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠির ডগায় থলিয়া ঝুলিয়ে গায়ে নতুন খাকি-রঙা কোট পরে।

মোড়ের মাথায় এসে মালুকে মনে করিয়ে দিলাম যে হাটে গিয়ে ও যেন ইচ্ছে করে হারিয়ে না যায়।

ও গতবার ইচ্ছে করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে সোজা শুঁড়িখানায় চলে গেছিল। তারপর মত্ত অবস্থায় রাতে ফিরে এসে আমাকে হাত নাড়িয়ে বলেছিল, 'যাও তুমকো হাম বরখাস্ত্ কর দিয়া, তুম্হারা মাফিক নোকর্ হামকো নেহি চাইয়ে।'

মালু কথা দিল যে, সে এবার আর হারাবে না।

হাট বেশ জমে গেছে।

দেহাতীরা এসেছে টাটকা শাক-সব্জি নিয়ে। একপাশে মোরগ-মুরগীর ভীড়। তারই পাশে বাঁশের গায়ে ঠ্যাং-উপরে মাথা-নীচে করে ঝোলানো আছে চামড়া-ছাড়ানো নগ্ন খাসী। খাসীগুলোর মৃত্যুর পরও নিস্তার নেই। সমস্ত অপমান থেকে ছুটি পাবার পরও এক নগ্ন নির্লজ্জতায় ওদের মুক্তি।

এদিকে রাবারের চটি, ওদিকে কাচের চুড়ি, প্লাষ্টিকের খেলনা, রুপোর গয়না, পাকৌড়ার দোকান, চায়ের দোকান। আর মধ্যে দূর দূর গ্রাম থেকে আসা চুলে কাঠের কাঁকই-গোঁজা তেলমাখা, টানটান করে চুল-বাঁধা আঁটসাঁট বনজ মেয়েরা।

রুপোর গয়নার দোকানে ভীড় করেছিল একদল শহুরে সুন্দরী মেয়ে—এখানের কোনো বাসিন্দার বাড়ির ক্ষণকালের অতিথিরা। তাদের রঙীন বেল-বটম্ ও বহুমূল্য শাড়ি, তাদের চুল-বাঁধার কায়দা ও রকমারী সান-গ্লাস ম্লান করে তাদেরই পাশে আছে এখানের মেয়েরা। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বসে এ ওর মাথার উকুন বাছছে। কেউ বা হেসে হেসে ঝরনার মত এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। তাদের উত্তোলিত হাতের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ঝলক চোখে পড়ছে তাদের নিবিড় স্তন, তাদের মেদহীন পরিশ্রমী পুরন্ত দেহ, তাদের সরল নিরাভরণ নিরাবরণ তরঙ্গময় সৌন্দর্য। আর ওদেরই পাশে আসলের অভাব মেকিতে-ভরানো বিত্তবতী সভ্য যুবতীরা তাদের সমস্ত প্রাপ্তি সত্ত্বেও ওদের আড়চোখে দেখে শরীরিক হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে।

আমার বন্ধু পানওয়ালার দোকান থেকে দুটো পান খেলাম জর্দা দিয়ে। চায়ের দোকানে সকলের সঙ্গে বসে চা খেলাম।

ধীরেসুস্থে হাট শেষ হল।

হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বইছিল। হৈ হৈ করে যাচ্ছিল শালপাতার সঙ্গে খড়কুটো; গরু, ঘোড়া, ছাগল, মুরগী আর তেলেভাজা পাকৌড়ির গন্ধমাখা ধুলো।

সমস্ত হাট থেকে একটা গুঞ্জরণ বাজছিল উচ্চ গ্রামে।

হেসালঙের হাটে এলে আমার মন প্রতিবারেই ভীষণ চমৎকৃত হয়।

এখানে কোনো দৌড়াদৌড়ি নেই। লোকাল ট্রেন বা লাষ্ট বাস মিস্ করার চিন্তা নেই। সময়মত উপস্থিত না হবার জন্যে অফিসের বড় সাহেব বা কোর্টের জজসাহেবের ভ্রূকুটির ভয় নেই। ঘড়ি আবিষ্কার হবার পর যদিও বহু সহস্র বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষ এখানে আজও ঘড়ির উপর কর্তৃত্ব করছে, ঘড়ি মানুষের উপর নয়।

এই হাট-করা ছেলেমেয়েদের কাউকে যদি শুধোনো যায়, তোমার কত বছর বয়স, সে প্রথমে জবাব দেবে না। হেসে বলবে, জানি না। তারপর পীড়াপীড়ি করলে ভ্রূ কুঁচকে অনেক ভেবে বলবে, যে-বছর পাহাড়তলির আমলকী বনে একটিও আমলকী ধরেনি, যে-বছর আমলকী তলায় চিতল হরিণের ঝাঁক খেলা করেনি ও সে-বছর জন্মেছিল।

ওরা ওদের জন্ম, ওদের মৃত্যু, ওদের জীবন, কোনো কিছু নিয়েই কখনো মাথা ঘামায়নি—অথচ ওদের স্বল্পবিত্ততা ছাড়া ওদের আর কোনো অভাব নেই। কারণ ওরা আমাদের মতো প্রতিমুহূর্তের তীব্র ও বহুবিধ অভাববোধে নিজেদের কণ্টকিত জর্জরিত করেনি। ওদের মত হতে পারলে কি ভালোই না হত। কিন্তু ওদের জগৎ আর আমাদের জগৎ যে এক নয়। আমরা যে সেই অভাববোধহীন দিনগুলিকে বহুদিন আগে পিছনে ফেলে রেখে এই সাইক্লোনিক বুভুক্ষু মানসিক জগতে প্রবেশ করে ফেলেছি। এ জগৎ, এ মানসিকতা থেকে বেরোবার পথ ত আমাদের হাতে নেই।

মুরগী কিনতে গিয়ে হঠাৎ দত্তবাবুর সঙ্গে দেখা। ছোটখাটো ভাল স্বাস্থ্যের ভদ্রলোক। বয়স ষাটে পৌঁছেচে—কিন্তু শক্ত আঁটসাঁট শরীর। এখনো অবলীলাক্রমে পাঁচ-দশ মাইল হেঁটে বেড়ান। বেড়ানোর জন্যে নয়, এখানে প্রয়োজনেই প্রত্যেককে দিনে দু-তিন মাইল কমপক্ষে হাঁটতে হয়। দত্তবাবুর ছেলেরা সকলেই মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে। তবুও উনি এখন একটা চাকরি নিয়েছেন। সময় কাটাবার জন্যে, ডালটনগঞ্জের কাঠ ও বাঁশের নামকরা এক ঠিকাদার কোম্পানীতে। উইক-এণ্ডে এখানে আসেন যান।

দত্তবাবুর পরেই দেখা হল রায়বাবুর সঙ্গে। উনি এখানের অন্যতম পুরোনো বাসিন্দা। বয়স পঁচাত্তর হয়েছে—কিন্তু চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। হেসালঙ ও খিলাড়ির হাটে এখনো নিজে যান, এখনো রোজগার করেন নানা কিছু করে। মাইলের পর মাইল হেঁটে এর বাড়ি তার বাড়ি গিয়ে খাল-খরিয়াত্ শুধোন।

আজ থেকে অনেক বছর আগে যখন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এখানের দশ হাজার একর পাহাড় ও জঙ্গল সরকারের কাছ থেকে নিয়ে 'কলোনাইজেশান সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার' পত্তন করে এখানে কলোনী করেন, তখন থেকেই উনি এখানে আছেন।

তখন এ জায়গাটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল। রাস্তাঘাট সব চমৎকার ছিল। অনেকের বাড়িতেই নাকি গাড়ি ছিল। প্রত্যেক বাড়িতে যাবার মত মোটরের রাস্তা ছিল। সকাল-বিকেলে ফুটফুটে মেয়েদের দেখা যেত গান গাইতে গাইতে গরুর-গাড়ি চালিয়ে ক্ষেত-খামার থেকে আসতে যেতে। তখনই বুথ্ সাহেবের ফার্মেরও পত্তন হয়। বিরাট জায়গা নিয়ে ফল ও ফসলের চাষ। এখনও সে ফার্ম আছে, তবে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এখন কিনে নিয়েছেন সে ফার্ম।

রায়বাবুর মদের দোকান ছিল এখানে সেই সময়ে। 'ফরেন-লিকার শপ'। বলছিলেন, পুরো বিহারে তখন তাঁর দোকানের বিক্রী ছিল সবচেয়ে বেশী।

এ জায়গাটার চেহারা কি ছিল এখন দেখে বোঝার উপায় নেই।

তারপর দেশ স্বাধীন হবার পরই 'এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা একে একে এখান থেকে সরে পড়তে লাগলেন, কেউ ইংল্যাণ্ড, কেউ কানাডা, বেশীর ভাগই অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিলেন। বাড়িগুলো সব একে একে বিক্রী হয়ে গেল। তাদের বদলে জঙ্গল-পাহাড় ভালোবাসেন এমন ভিনদেশী লোক এসে এখানে জমতে লাগলেন। এখন জায়গাটা দেশী, বিদেশী ও স্বল্পসংখ্যক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আন্তর্জাতিক জায়গা হয়ে গেছে।

চ্যাটার্জি সাহেবদেরও দেখলাম। আলাপ নেই ওঁদের সঙ্গে। মিলিটারীতে ছিলেন চ্যাটার্জি সাহেব। এখন রিটায়ার করে, এখানে আছেন। জোত-জমি করেন।

ওঁর মেয়েটিকে দেখলেই আমার মন বড় খারাপ লাগে। ভারী সুন্দরী, বিয়ের অল্প কিছুদিন পরই স্বামী প্লেন ক্র্যাশে মারা যান। তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে সে মা-বাবার সঙ্গে এখানেই থাকে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের এই বন-পাহাড়ে ও নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে যা দিয়ে ওর একাকীত্বও ভরিয়ে রাখে।

সাদা পোষাক পরা এই সুন্দরী মেয়েটিকে যখনি দেখি, তখনই মন এক পবিত্রতায় ভরে যায়। বিষাদেরও বোধহয় কোনো নিজস্ব পবিত্রতা আছে। ওর প্রতি এক নীরব সমবেদনায় মন হু-হু করে ওঠে।

হাট শেষ করে বাড়ি ফিরব, এমন সময় মিসেস কার্ণির সঙ্গে দেখা, মিসেস মেরেডিথের ভাগ্নীর সঙ্গে ইয়াং-লেডি হাটে এসেছেন। আমাকে বললেন, পালাবে না, আজ আমার সঙ্গে বাড়ি চল, আমার ওখানে খেয়ে যাবে।

বললাম, বেশ। তাই-ই হবে।

মালুকে বললাম বাড়ি ফিরে যেতে। তারপর বাড়ির পথেই যায় না শুঁড়িখানার মোড়ে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে যায়, তা লক্ষ্য করার পর নিশ্চিত হলাম যে ও বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

বেলা পড়ে এসেছিল। হাট শেষ করে সবাই একে একে বাড়ির দিকে ফিরছিল। যাদের সওদা কেনা হয়ে গেছে, যাদের বেচাও শেষ; তারা সবাই-ই।

এক সময় মিসেস কার্ণির সঙ্গে হাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ছোট মেয়ের মত ফুটফুটে বৃদ্ধা হাই-হিল জুতোর খুট্-খাট্ আওয়াজ করে পাশে পাশে হাঁটছিলেন।

বয়স হয়ে গেলে সব মানুষই বেশী কথা বলেন, তাঁদের বোধহয় মনে হয় তাঁদের এত কথা বলার ছিল, অথচ বলা হল না; বোধহয় মনে হয়, এখন না বলে ফেললে পরে আর বলা যাবে না। কিংবা হয়ত তাঁদের কথা শোনার মত লোক জোটে না, যুবক-যুবতীরা তাঁদের এড়িয়ে চলে। তাই যদি কেউ মনোযোগ সহকারে তাঁদের কথা শোনেন তাঁদের কিছু বাকী না রেখেই তাঁরা সব কথা শোনাতে চান।

মিসেস কার্ণির বাড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আলো চলে গেছে। কিন্তু পশ্চিমের আকাশে তখনো লালচে আভা। এক ঝাঁক মেঠো বক তাদের লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যার আকাশে দুলতে দুলতে টাঁড় পেরিয়ে নাক্‌টা পাহাড়ের নীচে ফিরে চলেছে।

চওড়া বারান্দা—এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত রেলিং দেওয়া। পর পর অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে এ্যাটাচড্ বাথরুম। উপরে টালির ছাদ।

এক পাশের দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া আছে বুথ ফার্মের একজন কর্মচারীকে। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সপরিবারে তিনি থাকেন সেখানে।

বাকি তিনটি ঘর মিসেস কার্ণি আগন্তুকদের ভাড়া দেন। বাইরে বড় করে হলুদের উপর সাদায় লেখা আছে 'রেস্ট হাউস'। আট টাকায় থাকা-খাওয়া।

আগে আগে বেড়াতে এসে এখানে একাধিকবার ছিলাম। থাকা তেমন আরামপ্রদ না হলেও খাওয়া এবং মিসেস কার্ণির যত্ন-আত্তির তুলনা নেই।

বারান্দার অন্য প্রান্তে—একটু আড়াল করে মিসেস কার্ণির ড্রইংরুম! তারই পাশে ছোট্ট লেখা-কাম-খাওয়ার টেবল। বারান্দার সামনে থেকে লতানো গোলাপ লতিয়ে উঠেছে টবের মানি-প্ল্যান্টস্।

মিসেস কার্ণি বললেন, বোসো, বোসো, আমি একটু কাজ সেরে আসছি। চা খাবে ত?

বললাম, খাব।

একটু পর ওঁর আয়া এসে চা দিয়ে গেল।

টেবলের ওপর ওঁর যৌবনের একটা ফোটো ছিল। রাইডিং-ব্রিচেস পরা ফুটন্ত একটি দপদপানো দামাল মেয়ে। সেই ফোটোর দিকে চেয়ে আজকের সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধাকে চিনতেও কষ্ট হয়।

একদৃষ্টে ঐ ফোটোটার দিকে চেয়েছিলাম।

তিনি বললেন, কি দেখছ?

আমি জবাব দিলাম না, হাসলাম।

মিসেস কার্ণিও হাসলেন, বললেন, আমার ছবি নয়, বলো আমার অতীতকে দেখছ। আমার পুরোনো আমিকে দেখছ।

তাকিয়েই ছিলাম—সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী একটি হাসিখুশী মেয়ে—কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোঁকড়া চুল—হাসিমুখে চেয়ে আছে সে সামনের দিকে।

বললাম, আপনার কষ্ট হয় বুঝি এই ছবি দেখলে?

তিনি বললেন, নট এ্যাট অল। আমি এখনও খুশী। এজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট—আই হ্যাভ ভেরী মাচ এনজয়েড দিস লাইফ এন্ড আই এনজয় ইট ইভিন টু-ডে।

তারপর বললেন, শুধু বড় একা একা লাগে মাঝে মাঝে। এছাড়া—আমি খুব খুশী। লাইফ ইজ আ ওয়ান্ডারফুল থিং, বুঝলে। আমি আবার প্রথম থেকে শুরু করতাম, আমার পাঁচ-বছর বয়স থেকে, যদি আমাকে ভগবান সে সুযোগ দিতেন।

এ অবধি বলেই উনি চুপ করে গেলেন, তারপর বললেন, দাঁড়াও তোমাকে আমার ও মিস্টার কার্ণির সব ছোটবেলার ছবি দেখাচ্ছি—হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল টাইম উই হ্যাড। আই রিয়্যালি ডু মিস মাই ম্যান।

শোবার ঘর থেকে মিসেস কার্ণি অনেকগুলো ছবি নিয়ে এলেন, দু-তিনটি এ্যালবাম ভর্তি

ছবি। ওঁর বাবা-মার ছবি—ওঁর শ্বশুরবাড়ির অনেকের ছবি। ওঁদের হানিমুনের ছবি।

মিসেস কার্ণি বলছিলেন, জানো, শেষ বয়সে মিস্টার কার্ণি অন্ধ হয়ে গেছিলেন।

যে-লোকটা ভীষণ চটপটে ছিল, কাজের লোক ছিল, যে আমাকে সারা জীবন সব রকম আরামে, আনন্দে রেখেছিল সে লোকটার শেষ বয়সে যে কী দুর্দশা হয়েছিল তা কি বলব।

এই আমি, এই অবলা নারী; এই মিসেস উইনিফ্রেড কার্ণিই তখন তার সবকিছু ছিল।

আমার হাত ধরে তাকে চলতে হত—আমার রোজগারে তার খেতে হত—তার পক্ষে সেই শেষের দিনগুলো বড় লজ্জার ছিল।

কোন্ আত্মসম্মানজ্ঞানী পুরুষমানুষ স্ত্রীর উপরে নির্ভর করে, তার দয়ায় বেঁচে থাকতে চায়, বলো? অবশ্য পুরুষদের এটা অন্যায়। তারা যদি আমাদের ভালোবাসে, তবে তাদের মনে কোনো দৈন্য থাকা উচিত নয় এ বাবদে। একে দৈন্য বলা যায় কি না জানি না, তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমরা মেয়েরা পুরুষদের এই সম্মানজ্ঞান বা দম্ভ যাই-ই বল, কিন্তু পছন্দ করি। কি জানি, মনে হয়, যে-পুরুষের এই সম্মানজ্ঞান নেই, যে এমন অবস্থায় নিজেকে অসহায় ও কর্তব্যচ্যুত বলে মনে করে না; তাকে কোনো মেয়ের পক্ষেই ভালোবাসা সম্ভব নয়।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা দুজনে চুপচাপ বসেছিলাম। ওঁর কথার উত্তরে আমার কিছু বলার ছিলো না।

অনেকক্ষণ পর মিসেস কার্ণি বললেন, জানো মিস্টার বোস, উনি মারা যাবার আগে হাতড়ে হাতড়ে আমার হাত খুঁজে নিয়ে নিজের হাতে নিতেন, আর ধীরে ধীরে বলতেন, আমার হাতে হাত রাখো, আমার বড় শীত করে।

বলতেন, ও মাই গার্লি, তুমি তোমার এই ছোট ছোট গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত হাত দুটি দিয়ে কী কষ্টই না করছ, কত কষ্ট দিলাম তোমাকে আমি—। তোমার এই সুন্দর হাত দুটি দিয়ে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিরুদ্ধে তুমি একা-একা লড়াই করে গেলে, তোমার জন্যে আমার সারা জীবনে আমি যা না করলাম, তুমি আমার জন্যে এই শেষ জীবনে তার অনেক গুণ বেশী করলে। বলতেন, সুইটি গার্লি, আবার যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়, অন্য কোনো জন্মে, কখনো যদি আবার যৌবনাবস্থায় দুচোখ খুলে তোমাকে দেখতে পাই, ত দেখবে, আমি কি করে তোমার ঋণ শোধ করি।

বলতে বলতে মিসেস কার্ণির দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

বাইরে ঝিঁঝির শব্দ জোর হল।

ভারী একটানা ভোঁতা আওয়াজ তুলে ডিজেলে-টানা মেরুনরঙা মালগাড়ি চলে গেল অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাড়্কাকানার দিকে।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। এখন কিছু বলা উচিত নয়, বলার নেই।

একটু পরে খাবার এল। খাবার বলতে কিছুই নয় তেমন। আন্ডা কারী ও পাঁউরুটি, সঙ্গে পেয়ারার জ্যাম।

মিসেস কার্ণি তাঁর গেস্টহাউসের অতিথিদের যেমন ষোড়শোপচারে খাওয়ান, নিজে তেমন খান না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে রাত আটটা। রাত আটটা এখানে শীতের রাতে অনেক রাত।

যাবার সময় উনি একটা টর্চলাইট ধার দিলেন আমাকে। বললেন, কাল মালুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

উনি রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন—আমি পেছনে শর্টকাট দিয়ে বেরিয়ে এসে দীপ-চাঁদের দোকানের সামনের মাঠে পড়লাম। অন্ধকার হলেও আকাশে এক ফালি চাঁদ ছিল, আর ছিল নক্ষত্রমণ্ডলী। কোমরে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কালপুরুষ এক প্রাগৈতিহাসিক স্থবিরের মত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পাহারা দিচ্ছিলেন। অগণিত তারারা এই হিমের রাতে তাদের নীলাভ সবুজ চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

প্রথমে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। তারপর একটু হাঁটতেই গা গরম হয়ে গেল। দেখতে-দেখতে মাঠ পেরিয়ে এলাম।

ঝর্ণা পেরিয়ে সেই ভূতের বাড়ির পাশ দিয়ে এবং একা সায়ান্ধকার শিশির-ভেজা পথে যেতে যেতে মিসেস কার্ণির কথাগুলো কানে বাজছিল, 'লাইফ ইজ আ ওয়াণ্ডারফুল থিং'।

কিন্তু আমার কেন এ কথা একবারও মনে হয় না?

আমার এই ভরা-যৌবনে—আমার এই সমস্ত রকম আপাতপ্রাপ্তির মধ্যেও কেন মন আমার সর্ব সময় এমন অশান্ত থাকে? কেন এমন পাগলের মত ছটফট করে? না কি, আমি একাই নই, সবাই-ই এরকম, প্রত্যেক মানুষ ও মানুষীর মনের ভিতরেই বুঝি এমনি একটা মন থাকে, যে মনটা প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্রোহীর মত মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, যা পেল, তাকে ধুলোয় ফেলে, অন্য কিছুর দিকে হাত বাড়ায়?

মাঝে মাঝে আমার নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছা করে। কেন সুখী হতে পারলাম না সহজ পথে—সকলে যেমন করে সুখী হয়? কেন সর্বক্ষণ একটা কাঁকড়া-বিছে আমাকে এমন করে কামড়ায়? কেন?

॥ নয় ॥

কালকের ডাকে ছুটির একটা চিঠি এসেছিল।

ছুটি লিখেছিল, আপনি লিখেছেন যে আমার তৈরী সোয়েটার গায়ে দিলেই আপনার মনে হয় যে আমি আপনাকে দুহাতে জড়িয়ে আছি। একথা ভাবতেই ভাল লাগছে। আমি এবার থেকে প্রতি বছর আপনাকে একটা করে সোয়েটার বুনে দেব, আমি যেখানেই থাকি না কেন। আপনি কেমন আছেন, আগের থেকে ভাল কিনা, খুব জানতে ইচ্ছে করে।

কাল আমাদের অফিস বন্ধ ছিল, কোম্পানীর হেডঅফিসের একজন ডিরেক্টর মারা যাওয়ার জন্যে।

এরকম হঠাৎ-ছুটিগুলো বেশ লাগে। কলিগরা অনেকেই দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেল। এখানে রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুরের একটা জমজমাট ছবি হচ্ছে। আমি যাইনি। আমারও একজন রাজেশ খান্না আছে, যে ম্যাটিনী আইডলের চেয়ে অনেক সত্যি, অনেক কাছের। কি? নেই?

হঠাৎ ছুটি পেয়ে খুব ভাল করে চান করলাম, তারপর ঘর গুছোতে বসলাম।

বইগুলোতে এমন ধুলো পড়ে যে, বলার নয়।

বই ঝাড়তে ঝাড়তে বইয়ের তাক থেকে আপনার লেখা তিন-চারটে বই বেরিয়ে পড়লো। আপনি নিজে হাতে লিখে দিয়েছেন আমার নাম। এসব বই আমি মনে ধরে কাউকে পড়তে দিতে পারি না। বইয়ের পাতায় পাতায় কত চেনা ঘটনা, কত হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি ঝিলিক মারে, আর আমি অমনি ভাবতে বসে যাই, কত কী ভাবি, কত কি!

বারে বারেই মনে হয়, আপনি আমাকে কত কি দিয়েছেন কিন্তু বদলে আমার আপনাকে দেওয়ার মত কিছুই নেই, যা আছে, তার দাম অতি সামান্য।

আমি আপনাকে যা দিতে পারি তা যে-কোনো মেয়েই হয়ত দিতে পারে। অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হয়। অথচ আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত যা দেন, তা আমি পৃথিবীর অন্য কোনো পুরুষের কাছ থেকে পেতাম না। মাঝে মাঝে ভগবানের কাছে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই, জানাই এ জন্যে যে, এ জন্মে কোনো এক আশীর্বাদ-স্বরূপ আপনাকে পেয়েছিলাম, সেই প্রাপ্তির জন্যে স্বাভাবিক কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি একজন সাম্যন্য মেয়ে। আমি ভগবান মানি, এই চাঁদে-পাড়ি দেওয়া যুগেও। আমি অনেক ভেবে দেখছি, আমার যা আছে আপনাকে আমি সবই সহজ সমর্পণে দিতে পারি। আমি চিরদিনই আপনার। আমি নিশিদিনই আপনাকে ভালোবাসি, আপনার কখন সময় হবে সেই অপেক্ষায় আমি ক্ষণ গুনি।

আমার সম্বন্ধে আপনার এখনও কি দ্বিধা আছে কোনো? এখনও কি আপনি বোঝেন নি, আপনি জানেন নি, পুরোপুরি আমাকে?

আপনার আত্মবিশ্বাস এত কম কেন?

আপনার চিঠি পড়ে আমার ভাল লাগেনি। আপনি আমার চোখে কি, তা আপনি কখনও জানেন নি, তাই নিজের সম্বন্ধে অহেতুক দ্বিধা প্রকাশ করে নিজেকে আমার কাছে ছোট করেন।

অমন আর কখনও করবেন না।

আপনি কি মনে করবেন জানি না, মাঝে মাঝে রমাদির জন্যে আমার খুব কণ্ট হয়। কণ্ট হয় এই ভেবে যে, যা তাঁর একান্ত ছিল, তাঁর সর্বস্ব ছিল, তা ধীরে ধীরে আমার হস্তগত হচ্ছে। এতে হয়ত আমার জয়ের আনন্দ বোধ করা উচিত ছিল স্বাভাবিক কারণে, কিন্তু সত্যি বলছি, এতে আনন্দের বদলে এক গভীর দুঃখ বোধ করি আমি।

আমি জীবনে কাউকে ঠকাতে চাইনি, নিজের সুখের জন্যে ত নয়ই। হয়ত এই বাবদেই আপনার চরিত্রের সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল।

আপনিও ত দেখলেন যে, আপনি কাউকে ঠকান আর নাই-ই ঠকান, আপনার দুঃখ আপনাকে পেতেই হয়।

আপনি লিখেছিলেন যে, রমাদির ব্যবহার আপনার আত্মবিশ্বাসের মূলে এক দারুণ আঘাত হেনেছে। আপনার মনে হয়, আপনি যেন কখনও কোনো মেয়ের ভালোবাসা পাবেন না, যেমন করে আপনি চান, যা আপনি চান; তা।

এ কথা আপনার ভুলে যাওয়া উচিত। যতদিন না এই নির্গুণ নিরূপ মেয়েটির চেয়ে আরো ভাল কেউ, যোগ্য কেউ এসে আপনাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে ততদিন আপনি আমার। রমাদি যদি তাঁর প্রাপ্তির অমর্যাদা করে থাকেন ত, তিনি নিজেকেই ঠকিয়েছেন, এতে আপনার মনোবেদনার কারণ কি তা ত আমি বুঝতে পারি না।

আমার দুঃখ এই যে, আমার ম্যাটেরিয়াল যোগ্যতা যদি আরো বেশী থাকত, অন্ততঃ হাজার-খানেক টাকা মাইনে পেতাম কোথাও যদি, তাহলে আপনাকে কোর্ট-কাচারী ছাড়িয়ে শুধুমাত্র লেখকে পর্যবসিত করতাম। আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাইতাম না—শুধু আপনার চাওয়ার দিকে মুখ করে দিন গুনতাম।

আমার বেশ একটা ছোট্ট ছিমছাম কোয়ার্টার থাকত—একফালি বারান্দা থাকত—কাছেপিঠে বড় বড় মেহগিনী গাছ থাকত—শীতের রোদে মেহগিনীর পাতা কাঁপত—আপনি শাল গায়ে দিয়ে বসে চশমা-নাকে একমনে লিখতেন আর আমি আপনাকে আড়াল থেকে দেখতাম—দেখতাম, আর গর্বে মরে যেতাম। আমার এ জন্ম সার্থক হত।

একজন লেখকের অনুপ্রেরণা হবার চেয়ে মহত্তর আর কিছু হবার কথা আমার মত সামান্য একজন মেয়ের ভাবনার বাইরে। এর চেয়ে বড় সার্থকতা একজন নারীর জীবনে আর কি হতে পারত?

আসলে রমাদির মত অত লেখাপড়া জানা, অত ডাই-হার্ড মেয়েকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয়নি।

কিছু মনে করবেন না, রমাদিকে হাসপাতালের ডাকসাইটে মেট্রন বা কোনো কলেজের প্রলয়ংকরী প্রিন্সিপাল হলে মানাত। রমাদিরা কোনো পুরুষকে নির্ভর করে তার জন্য বাঁচতে শেখেননি। তাঁরা যেহেতু শিক্ষিতা, যেহেতু তাঁরাও মাস পোয়ালে মোটা অংকের চেক নিয়ে বাড়ি ফেরেন, তাঁরা ভাবেন তাঁরা বুঝি পুরুষের সমকক্ষ!

আমার কিন্তু চিরদিন মনে হয় এ ভাবনাটা ভুল। ঘরের বাইরে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির যতই বড়াই থাক না কেন, ঘরের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামাটা মূর্খামির কাজ। প্রাকৃতিক নিয়মেই আমরা জীবনের সব নরম ক্ষেত্রে পুরুষের পরিপ্রেক্ষিতে প্যাসিভ রোলেই অভিনয় করি। আপনারা ভালোবাসতে জানেন, আমরা ভালোবাসা গ্রহণ করতে জানি। এমনকি আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব, মাতৃত্বের সমস্ত গর্বও আপনাদেরই দান-নির্ভর। ঘরের মধ্যে অথবা শয্যালীন হয়ে যে মেয়ে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তার কপালে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আমি এ যুগের মেয়ে হয়েও এ কথা জোর গলায় বলতে ভয় পাই না। আমি গোঁড়া নই, আমি প্রাচীন-পন্থী নই, (নই যে তার প্রমাণ হয়ত আপনি পেয়েছেন) তবু আমি বলব যে, আমি একজন মেয়ে এবং সেই সুবাদেই আমার স্থান কোথায় তা আমি জানি। ভাগ্যক্রমে আমাদের স্থান এত সুবিন্যস্ত যে, যে-সব মেয়ে সেই উচ্চাসন থেকে নেমে এসে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে গার্হস্থ্য পরিবেশ অসহনীয় করে, তাদের বোকা না বলে পারি না।

আর কিছু লিখব না। অনেক এক্তিয়ার বহির্ভূত কথা বলে ফেললাম। হয়ত এত কথা কলমের ডগায় আসত না, যদি না আমি রমাদিকে ভালোবাসতাম। আমি জানি, আমি আপনাকে ভালোবাসি বলে রমাদির অনেক অত্যাচার আপনার সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাতে আমার জেদই

যে বাড়ে, আপনাকে পুরোপুরি করে পাওয়ার ইচ্ছেই যে আরো তীব্র হয়, একথা রমাদি বুঝলে আরো ভাল করতেন। আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আপনি ডাইভোর্স পান কি না পান অথবা পেতে চান কি না চান, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি শুধু জানি যে, আপনি আমার; আমার একান্ত। আপনি বিশ্বাস করেন কিনা জানি না, কিন্তু সুকুদা, আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমি যতদিন বাঁচব আপনার পাশে থাকব। আপনার মনের পাশে; আপনার শরীরের পাশে। বদলে আমি কিছু চাই না। আমি স্বাবলম্বী। আমাকে আপনার খাওয়াতে-পরাতে হবে না, আমার কোনো জাগতিক দায়িত্ব নিতে হবে না; আমার সন্তানের বাবা বলে পরিচয় দিতেও হবে না। বাৎসল্য রস আমার নেই। আমি বড় স্বার্থপর। আমার শরীর, আমার জীবন, আমার সুখ, মনের সুখ, আমার শরীরের সুখকে আমি বড় ভালবাসি।

আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভালোবাসি, আমি অনেক অনেকদিন বাঁচতে চাই। শুধু আমার এই আপনাকে ঘিরে যা ইচ্ছা তা আমাকে এ জন্মে সফল করতে দিন। আপনার কাছে আমার শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।

সমাজকে আমি ভয় করি না। আমি কাউকে ভয় করি না। আপনাকে আমার করে পাবার জন্যে আমার সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক আমি ছিন্ন করতে রাজী।

ভাবাবেগের বশে এ সব কথা বলছি না। এ আমার বহু বছরের ভাবনালব্ধ কথা। এ কথা লেখবার আগে আমি অনেক অনেক দিন ভেবেছি। আমার কাছে জীবন এক দারুণ আনন্দময় অনুভূতি—এই আনন্দে আমার নরম লাজুক মন আমার অনেক বিপদ-আপদ ও শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে-রাখা অনাঘ্রাত অনভিজ্ঞ নারীশরীর সবাই সোৎসাহে ভাগ নেবে।

আপনার জীবনের আমাকে শুধু অংশীদার করুন।

আগে থাকতে দেবার মত মূলধন আমার কিছু নেই; আমাকে আপনার জীবনের ওয়ার্কিং পার্টনার করে নিন—শেষবেলায় দেখবেন, জীবনের ব্যালান্সশীটের পাতাগুলি ভারী হয়ে উঠেছে পাওয়ার পুঁজিতে। আমার জীবন, আমার জীবন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস, আমার বাঁচার তাগিদই আমার একমাত্র মূলধন। এই মূলধন আমি আপনাতে লগ্নী করতে চাই—সুদ ছাড়াই, কোনোরকম শর্ত ছাড়াই।

কি? নেবেন না? আমাকে নেবেন না আপনি?

—ইতি, আপনার পাগলী ছুটি।

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুই করে বসে থাকলাম।

এবারে ছুটি যখন এসেছিল তখন ওর মুখ ও হাবভাব দেখে ওকে খুবই ডেসপারেট্ বলে মনে হয়েছিল—আজ ওর চিঠির মধ্যে ওকে সম্পূর্ণভাবে দেখা গেল।

কি করব আমি জানি না। আমি জানি না আমার কি করা উচিত। রমার প্রতি আমার অভি-যোগের অন্ত নেই, হয়ত রমারও আমার প্রতি অনেক অভিযোগ আছে। হয়ত কেন, নিশ্চয় আছে।

হয়ত আমার দোষ ওর চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। একে ঠিক ভালোবাসা বলা উচিত কিনা জানি না, হয়ত এটা কর্তব্যবোধ, হয়ত এটা অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে যে যুক্তিহীন মমতা জন্মায় অন্যের প্রতি, তাই। হয়ত এ আমাদের একমাত্র ছেলের প্রতি, তার ভবিষ্যতের প্রতি মমত্ববোধ।

হয়ত আমাদের মতই আরো লক্ষ লক্ষ বিবাহিত দম্পতি এমনি করে দাম্পত্যের অভিনয় করে চলেছেন, ক্লাবে, পার্টিতে, সামাজিক উৎসবে। সকলের সামনে ভাব দেখাচ্ছেন: কত প্রেম। হাসছেন, একে অন্যকে ডার্লিং বলছেন, তারপর বাড়ি ফিরে এয়ার কণ্ডিশানড্ বেডরুমে মোটা ডানলো-পিলোর গদীর উপর দুটি প্রাণহীন মোমের মূর্তির মতো দুজন দুদিকে শুয়ে থাকছেন। গায়ে গায়ে লেগে থেকেও হাজার মাইল ব্যবধানে আছেন।

কিন্তু কেন? কেন আমার সাহস হয় না, আমার জোর আসে না হৃদয়ে এই মিথ্যে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার? জীবন কি সত্যিই এত অবহেলার জিনিস? জীবন তা একটাই—একবারই আসে। তবে সে জীবনও আমরা নিজেদের ইচ্ছা নিজেদের সাধ অনুযায়ী ভোগ করতে পারি না কেন?

এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে সে-সব দিনের কথা। আমি তখন লিংকনস্ ইন-এ। আমার এক ইংলিশ বন্ধু স্টিভের বাবার কান্ট্রি-হাউসে ডে-স্পেণ্ড করার নেমন্তন্ন ছিল এক রবিবার। সেখানে সুইমিং পুলের পাশে উইলো গাছের নোয়ানো ডালের নীচে প্রথম দেখেছিলাম কলকাতার নরম

মেয়ে রমাকে। প্রথম দেখাতেই দারুণ ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে প্রথমে যা চোখে পড়েছিল তা রমার মিষ্টি ব্যবহার ও ওর ফিগার।

ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের ফিগার সম্বন্ধে আমার ভীষণ একটা ভীতি ছিল। হয়ত অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক ছিলাম বলে। অনেক দিন পর্যন্ত খারাপ ফিগারের মহিলাদের মহিলা বলে স্বীকার করতেই চাইতাম না। আমার মাইডিয়ার জ্যাঠামশায় (যাঁর কাছে আমি ছোটবেলা থেকে মানুষ, আমার মা-বাবার একসঙ্গে প্লেন-ক্র্যাশে মৃত্যুর পর থেকে) বলতেন, সুকু, তোর এত ফিগার-ফিগার বাতিক কেন?

কেন তা ছিল, আমি নিজেও তা বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। আজও পারি না। হয়ত মেয়েদের আমি ফুল, প্রজাপতি, হলুদ-বসন্ত পাখিদের মত ভালবাসতাম বলে, হয়ত মেয়েদের সঙ্গে প্রকৃতির, প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতির এবং সঙ্গতির সঙ্গে সৌন্দর্যের একটা ওতপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ খুঁজতে চাইতাম বলে।

জানি না, কেন? কিন্তু নিজেদেরই অযত্নে ও অবহেলায় যারা অসুন্দরী সে-সব মেয়েদের উপর খুব রাগ হত তখন। ভগবান মুখ, চোখ, গায়ের রঙ এসব সকলকেই সমান দেন না। কিন্তু যাকেই যা দেন না কেন, যা দিয়েছেন তাকে সুন্দর করে সযত্নে রাখতে, নিজেদের অন্যের চোখে সুন্দরভাবে প্রতিভাত করতে যে মেয়েরা পারত না, জানত না, তাদের উপর আমার একটা অহেতুক বোকা-বোকা নিষ্ফল ছেলেমানুষী রাগ ছিল।

রমার ফিগার দেখে আমার ওকে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বলে মনে হয়েছিল—সে সংজ্ঞার পরিপূরক হয়েছিল ওর লাজনম্র শান্ত ব্যবহার।

মেয়েরা যদি মেয়েসুলভ না হয় তাহলে আমার তাদের মেয়ে বলে স্বীকার করতেও আপত্তি ছিল।

কিছুদিন মেলামেশার পর দেশে আমার কোনো রকম সম্পত্তি নেই, হাইকোর্টের ব্যারিস্টার পাড়ায় মামা-মেসো কেউ নেই, সমস্ত -জানার পরও বিত্তশালিনী, রূপবতী উচ্চশিক্ষিতা রমা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই একথা আমার বলা অন্যায় হবে যে ও আমাকে ভালো না বেসে আমার পটভূমিকে ভালোবেসেছিল; কারণ কোনো সামাজিক বা আর্থিক পটভূমি আমার ছিলো না।

সেদিন ও হয়ত সুকুমার বোস মানুষটাকেই ভালোবেসেছিল।

রমার কোর্স শেষ হল, আমি ব্যারিস্টার হলাম। তারপর দুজনে একসঙ্গে দেশে ফিরলাম বিয়ের এক বছর পরে।

এখানে এসে প্রথম চার পাঁচ বছর রমা চাকরি করেছিল। ভাল চাকরি। আমার জন্মদিনে, আমাদের ছেলে রুণের জন্মদিনে রমা নিজের রোজগারে ঘটা করে পার্টি দিত। যা ছুটি জানে না, তা হচ্ছে, রমা গত দু'বছর হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ও চাকরি করুক তা আমার কোনো দিনও ইচ্ছা ছিল না। ওকে বলেছিলাম নিজে একটা পলি-ক্লিনিক করতে—তাতে নিজেও ব্যস্ত থাকবে এবং দশজনের উপকারও হবে। কিন্তু ও শোনেনি।

এখন পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, যা ঘটেছে তার দোষটা সম্পূর্ণই আমার।

অথচ তবুও পুরোপুরি নিজেকে দোষী করতে পারি না।

আমার অপরাধ এই যে, জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আমার বাবা ছোটবেলায় বলতেন, দশজনের মধ্যে একজন হতে হবে তোমায়। দশজনের মধ্যে একজনই হতে চেয়েছিলাম আমি, চেয়েছিলাম যেখানে যাব সেখানে সবাই আমায় সম্মান করবে, সবাই আমাকে চিনবে, জানবে। হাইকোর্টে আমি নাম করতে চেয়েছিলাম।

বিয়ের পর পর দেশে ফিরে এসে আমার ছিপছিপে সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী পায়ে পায়জোর পরে, নাকে শখ করে নথ পরে, দারুণ সাজে সেজে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলত, তোমাকে কিন্তু ডিস্টিংগুইস্‌ড্‌ হতে হবে।

বড় হতে চেষ্টা করতে লাগলাম। সকালে লাইব্রেরীতে বসে ঠিক দশটায় কোর্টে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে কোনো রকমে একটু চা খেয়ে আবার লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতাম। উঠতে উঠতে দুটো তিনটে হয়ে যেত রাত।

দাঁতে দাঁত চেপে বলতাম, আমাকে বড় হতে হবে। আমার সিনিয়র পাইপ-মুখে বলতেন, ইউ মাস্ট বার্ণ অল দা ব্রিজেস বিহাইন্ড। বুঝলে সুকুমার, প্রফেশান ইজ আ জেলাস মিসট্রেস্‌।

তোমার স্ত্রীও নয়। মিসট্রেস্। একটু হেলা করেছ কি অন্যের ঘরে গিয়ে পে'ছিবে।

আমি যখন শুতে যেতাম তখন আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত ঘুমিয়ে থাকত। আমারও শরীর বলে একটা জৈবিক ব্যাপার ছিল। মাঝে মাঝে সেটা স্বাভাবিক কারণে ক্ষুধার্ত বোধ করত। কিন্তু তখন রমাকে ঐ অবস্থায় দেখে সেই জৈবিক ব্যাপারটাকে চাবুক মেরে স্লিপিং-স্যুট পরে শুয়ে পড়তাম।

আমার খুব খারাপ লাগত। রমাকে সঙ্গ দিতে পারতাম না, ওকে নিয়ে একদিনও সিনেমায় যেতে পারতাম না, কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও না। রমা তখন যে কি করে দিন কাটাতো আমি এখনও ভেবে পাই না। ওর কথা ভাবলে এখনও খুব কষ্ট হয়।

কিন্তু দোষ কি আমারই একার? রমা যদি বলত, তোমাকে ডিস্টিংগুইস্ড্ হতে হবে না —বলত, তুমি নাম নাই বা করলে, তুমি সাধারণ হও, মোটামুটি রোজগার করো, কোর্ট থেকে ফিরে সামান্য কাজ করে তারপর আমায় নিয়ে বেড়াতে যেও—কোনোদিন ক্লাবে, কখনও বাপের বাড়িতে, কখনও কোথাওই না, শুধু গাড়ি করে একটু ঘুরে আসবার জন্যে। কিন্তু জানি না, বললেও কি পারতাম! পুরুষরা কি কাজে সফল না হয়ে বাঁচতে পারে?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। শুধু প্রফেশনাল কাজ করলেও না হয় হত, আমি তার উপরে লেখক হতে চাইলাম।

টাকা আমি কোনোদিনও চাইনি। চেয়েছিলাম যশ, চেয়েছিলাম মান। আর প্রফেশানের এমনই মজা যে, নাম যদি কারো হয়ই, তখন টাকা এমনিতেই আসে—টাকাটা তখন ইন্‌সিডেণ্টাল হয়ে যায়। আমি বড় হলাম, আমার নাম হল, আমার টাকা হল, অথচ জীবনে আমি যা সবচেয়ে চেয়ে-ছিলাম সেই সবকিছুই আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। আজ আমার মত নিঃস্ব রিক্ত কেউ নেই।

আমার দোষ নেই; রমারও দোষ নেই।

কিন্তু হারিয়ে গেল।

এই অল্পবয়সে অনেক নাম হল, অনেক টাকা হল, কিন্তু আমার অনেকানেক বন্ধু যারা বোকার মত নাম করতে চায়নি, তারা আমার চোখের সামনেই আমার চেয়ে অনেক সুখী হল। তারা কোম্পানীর গাড়িতে পাঁচটায় বাড়ি ফিরে, বগলে সুগন্ধি সাবান ঘষে চান করে, তাদের হাত-কাটা ব্লাউজ পরা সুখের বুদবুদ-তোলা স্ত্রীদের নিয়ে ফুলফুল হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে সিনেমা অথবা ক্লাবে যেতে পারল প্রায় রোজই।

রমা বোধহয় আমাকে বড়ও হতে বলেছিল—সেই সঙ্গে আবার আমার বন্ধুদের মতই হতে বলেছিল। ঐ ডাবল্ স্ট্যান্ডার্ড রাখা আমার মত সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হল না। কর্ম-জীবনের, লেখক-জীবনের প্রথম কয়েক বছর আমার নিজের কোনো অধিকার ছিলো না আমার উপব। আমি তখন মক্কেলদের, প্রকাশকদের। আমাব নিজের উপর কোনো দাবী ছিলো না আমার।

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলাম যে, আমার সুন্দরী ছিপছিপে স্ত্রী একেবারে কর্পূরের মত উবে গেছে। সে যেন কী রকম হয়ে গেছে, অন্য কেউ হয়ে গেছে। অথচ তার কোনো রকম অসুখ ধরা পড়ল না।

নার্সিংহোমে একমাস থাকল, তবুও কিছু ধরা পড়ল না।

ও যখন নার্সিংহোমে চেক্-আপের জন্যে থাকত তখন ওকে রোজই একবার কোর্ট-ফেরতা দেখে আসতাম। তখন মাঝে মাঝে সীতেশের সঙ্গে দেখা হত। সীতেশ ইংলণ্ডে গেছিল চার্টার্ড এ্যাকাউণ্ট্যান্সী পড়তে। পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে, ইণ্টিরিয়র ডেকরেশনে একটা কোর্স করে ফিরে এসেছিল। বড় লোকের ছেলে, বাপ-ঠাকুর্দার অনেক পয়সা ছিল, ওল্ড আলিপুরে বাড়ি ছিল, তাছাড়া ছেলেটা ছোটবেলা থেকেই ছবিটবি ভালই আঁকত। ওর কানেকশানস্‌ও খুব ভাল ছিল। সীতেশ বেশ ভালো ব্যবসা করছিল।

নার্সিংহোমে ওর স্ত্রী ছিলেন, ডেলিভারীর জন্যে। সেই সুবাদে বহুদিন পর ওর সঙ্গে দেখা হতে আলাপটা আবার ঘন হল।

একসময়ে সীতেশের স্ত্রী বাড়ি চলে গেলেন কিন্তু সীতেশের নার্সিংহোমে আসা বন্ধ হলো না।

একদিন কোর্টে লাঞ্চের আগে আমার কোনো মামলা ছিলো না। মেনশান্ করার কাজ ছিল কয়েকটি—সে ভার জুনিয়রদের উপর দিয়ে আমি রমার নার্সিং হোমে গেলাম সাড়ে দশটা নাগাদ।

হঠাৎ গিয়ে পড়তে দেখি, সীতেশ বসে আছে রমার হাতে হাত রেখে।

সীতেশ খুব স্মার্ট—হেসে বলল, রুগীর হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাত গরম করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, খুব ভাল, বেচারী ত সব সময়ই একা থাকে, ওকে ত আমি কখনোই কম্পানী দিতে পারি না, তুই যে দিচ্ছিস সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার চোখের দিব্যি আমার সেদিনের সে কথায় কোনো শ্লেষ, কোনো ভণ্ডামি বা মিথ্যা ছিলো না। আমি সত্যি সত্যিই যা বলেছিলাম তাই-ই বুঝিয়েছিলাম।

মনে মনে হয়ত সেদিন থেকে আমি সাবধান হতে আরম্ভ করেছিলাম। সেই দিনই প্রথম আমি কোলকাতার সবচেয়ে বড় সলিসিটরকে ফোন করে বলেছিলাম, আমাকে কম করে ব্রিফ পাঠাতে, সেদিন থেকে আমি বিশ মোহর ফী বাড়িয়ে দিয়েছিলাম যাতে আমার জীবনের সমস্ত সুখের বিনিময়ে যেন মক্কেলদের না পেতে হয়।

কিন্তু মানুষের মন এক দুর্জ্ঞেয় জিনিস।

ব্রিফ সহজে বোঝা যায়, কোর্টে জজসাহেবদের মেজাজ বোঝা যায়, বিরোধী পক্ষের উকিলের প্রতিটি মুভ্ এণ্টিসিপেট্ করা যায়; যা বোঝা যায় না, অন্ততঃ আমি যা বুঝতে পারলাম না, তা রমার মন।

আমার যতটুকু অপারগতা, ঘাটতি, সমস্তটুকু সম্বন্ধেই আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম সব সময়ে, মনে এবং মুখে সব সময়েই তা স্বীকার করতাম। তবু রমা আমাকে ক্ষমা করল না।

যে-দোষ ক্ষমা করা যেত, সে দোষের জন্যে আমাকে চরম শাস্তি দিল।

ইতিমধ্যে আমি কিন্তু বদলে ফেলেছিলাম নিজেকে। ভীষণভাবে চেষ্টা করছিলাম বদলে ফেলার। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই কাজে বসতাম না; যাতে রমার সঙ্গে বসে চা খেতে পারি, আমার সুস্নাতা সুগন্ধি স্ত্রীর মুখোমুখি বসে একটু গল্প-গুজব করতে পারি সেই চেষ্টা করতাম। রাতেও ডিনারের সময় ও তার পরে রাত নটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি কাজ করতাম না। যাতে ধীরে-সুস্থে ডিনার খেতে পারি, ডিনারের পর ইচ্ছে করলে এবং রমার ইচ্ছে হলে রমাকে আদর করতে পারি।

কিন্তু তখন আমার এই পুনর্মূষিক হবার ইচ্ছা, নিজের কাছে নিজে ফিরে আসার মন ইচ্ছাই বিফল হল। বোধহয় খুব দেরী হয়ে গেছিল।

বোধহয় দেরী হয়ে গেলে আর নিজের কাছে, নিজের স্ত্রীর কাছে, নিজের ঘরে আর কখনোই ফেরা যায় না।

প্রায়ই মক্কেলদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে রমার সঙ্গে চা খাব, গল্প করব বলে উপরে উঠে এসে শুনতাম রমা ওর আকাশী-নীল হেরাল্ড চালিয়ে বেরিয়ে গেছে।

কোথায় গেছে, কেউ তা জানে না। ছেলের আয়া জানে না, বাবুর্চি জানে না, বেয়ারারা জানে না।

যদি কখনও বলতাম, কোথায় যাও না যাও একটু বলে যেও—কখন কি দরকার হয় কে বলতে পারে?

রমা উত্তরে ঝাঁঝালো গলায় বলতো, বলব না কোথায় যাই, কেন? তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

সন্দেহ করিনি কখনো—কারণ যদি আমার স্ত্রীর আজ আমাকে পছন্দ না হয় সেই জানাটাই আমার কাছে যথেষ্ট অপমানের। তাই সন্দেহ করে নিজেকে আরো ছোট করতে চাইনি। সন্দেহ হত না; যা হত তা দুঃখ। নিদারুণ দুঃখ। একজনকে সুখী না করতে পারার দুঃখ। অথচ জীবনে নিজের জন্যে আমি কিছুই করিনি—যা করেছি, যতটুকু করেছি, জেঠিমা-জ্যাঠামশায়, রমা, আমার ছেলে, তাদেরই সুখের জন্যে। আমার সময়, আমার বিশ্রাম, আমার সব আনন্দের বিনিময়ে যাতে এদের সকলের ভাল হয়, সকলের সুখ হয়, সেই ভাবনায় সমস্ত সময় ব্যয় করেছিলাম।

মনে পড়ছে, একদিন খাওয়ার জন্যে রাতে উপরে এসেছি। সেদিন ভীষণ গরম গেছিল। টানটান করে বসবার ঘরে ডিভানে হেলান দিয়ে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছি। রমা আসবে, এলে এক সঙ্গে খাব, এই জন্যে অপেক্ষা করতে করতে।

অনেক রাতে বেয়ারা এসে আমাকে ডেকে তুলল, বলল, সাহেব, লাইব্রেরী কি বন্ধ করে দেব?

আমি বললাম, ক'টা বাজে?

বারোটা।

বৌদি আসেনি এখনও।

হ্যাঁ! বৌদি এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছেন।

আমার সেদিন এমন এক দুঃখ-মিশ্রিত রাগ হয়েছিল যে, সে বলার নয়। ইংরাজীতে বলে না, 'এনাফ ইজ এনাফ', আমার তাই মনে হয়েছিল।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখলাম, রমা বেড-লাইট জ্বালিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।

আমি বললাম, তুমি আমার সামনে বাইরে থেকে এলে, দেখলে আমি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছি, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি; তবু একবার জিগ্গেস করতে পারলে না আমি খেয়েছি কি না খেয়েছি, আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি না? বললাম, বাড়ির কুকুর-বেড়ালের প্রতিও ত মানুষের এর চেয়ে বেশী সহানুভূতি থাকে।

রমা বলল, কেন করব? তোমার জন্যে আমার কোনো ফিলিং নেই। তোমার সম্বন্ধে আমার কোনোই ইন্টারেস্ট নেই। কিছুই আর নেই। তোমাকে আমার ভাল লাগে না।

সেদিনের পর থেকে আর কখনও রমাকে সঙ্গে খাওয়ার কথা বলিনি আমি। আমি এখন লাইব্রেরীতে খাই, বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। বিকেলের চাও তাই খাই।

রমার প্রতি সমস্ত রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়া আর কিছু আজ করণীয় নেই—। অথচ করতে আমি চাই সব কিছুই—ভালোবাসতে চাই, ভালোবাসা পেতে চাই। এখনও।

এত কাজ, এত টাকা, এত খ্যাতির মাঝেও বড় শীতার্ত লাগে—স্ত্রীর কাছে একটু বসে, তার চোখের দিকে চেয়ে, তার সুগন্ধি গ্রীবায় আলতো করে একটু চুমু খেয়ে, তার কবোষ্ণ বুকের রেশমী স্বস্তিতে একটু মুখ ঘষতে ভারী ইচ্ছা করে।

কিন্তু আজ বহুদিন, বহু বছর রমা আমার কাছে পর্যন্ত আসে না, আমাকে শেষ আমার স্ত্রী কবে চুমু খেয়েছে ভালোবেসে, তা ভাবতে গেলে স্পষ্ট মনে পড়ে না। আমার শরীরের সব আর্তি, আমার মনের সব উষ্ণতা আমায় দিনের পর দিন একা একা বয়ে বেড়াতে হয়।

এভাবে, ঠিক এভাবে একজন বাঙালী গোবেচারা ভদ্রলোকই বেঁচে থাকতে পারে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে গুরুজন, লঘুজন, সকলের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করে প্রতি মুহূর্তে নিজের একটা মাত্র একবারের মাত্র জীবনকে মর্মান্তিকভাবে নষ্ট করে—তারাই প্রশ্বাস নিতে পারে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

এর নাম কি বাঁচা? সব দিক দিয়ে নিজেকে এর চেয়ে বেশী করে কি ভাবে ঠকানো যেতে পারে?

অথচ টাকা আমার রোজগার করতেই হবে। পান থেকে চুন খসলে চলবে না। স—ব কিছুই চাই। স—ব জাগতিক কিছু। অথচ তার বদলে কারো কাছে আমার পাওনা ছিলো না কোনো কিছু।

প্রায় বছর তিনেক হল রমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলেই রমা বলত, তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই, আমি তোমাকে ডিভোর্স করব, যে ভাল, যে আমাকে ভালোবাসে, আমি তার সঙ্গে থাকব। এ সব বলত চাকর-বাকরদের সামনেই।

আমি বলতাম, আমি ত তোমাকে দয়া করে এখানে থাকতে বলিনি। তুমি মুক্ত, তুমি এই মুহূর্তে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যেতে পারো। যা করো, যা করবে, তা শুধু ডিসেন্টলি কোরো। কত লোকেরই ত ডিভোর্স হয়—ডিভোর্স ত গ্রেসফুলিও হতে পারে।

কিন্তু রমা ডিভোর্স আমাকে করবে না। অথচ আমার সঙ্গে যে-অমানুষিক দুর্বোধ্য অত্যাচার করার, তা করেই যাবে।

আশ্চর্য! ওকে কিছুতেই বুঝতে পারি না।

এখনও আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারি না, এখনও মনে হয় ও কোনো ভুল করছে, কোনো সর্বনাশে ভর করে ও এমন বিনা-দোষে বিনা-কারণে আমার সঙ্গে এরকম করছে। তাই এখনও ওকে ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারি না। আমার এখনও ভাবতে কষ্ট হয় যে ওর প্রতি আমার কোনো ফিলিং নেই—কারণ আমি এখনও ওকে ভালোবাসি। তাছাড়া রুণের কথাও ভাবতে হয়।

আমার জীবনের ঠিক এমনই নিরুপায় অন্ধ আঁধির সময়ে ছুটি আমার জীবনে খস-আতরের গন্ধ মেখে এসেছিল, তাকে ঠেকানো যায়নি। সে নিজের দাবীতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

রমা কোনোদিন বুঝতে চায়নি, বোঝেনি যে আমি ব্যারিস্টার হলেও আমি একজন লেখকও। বোঝেনি যে একজন লেখকের জীবন কখনোই একজন সাধারণ লোকের মত হতে পারে না। তারা সাধারণের মতো হয় না। তারা অসম্ভব অনুভূতিপ্রবণ হয়, তাদের কল্পরাজ্যে অনেক ভাবনা ছেঁড়া-মেঘের মত আসে যায়। তাদের কোনো-না-কোনো অনুপ্রেরণার দরকার হয়ই লিখতে গেলে।

অথচ আমি কিন্তু আমার কেজো সত্তা ও লেখক সত্তাকে আশ্চর্যরকমভাবে দুটো পাশাপাশি ঘরে বন্দী করে রেখেছিলাম—ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে—। সওয়াল করা মানুষটার এবং গৃহী মানুষটার সঙ্গে লেখক মানুষটার কোনো সংঘাত ছিল না।

রমার জীবনে আমি গৃহী ও সাধারণ মানুষ, সাধারণ একজন কৃতী স্বামী হিসেবেই পরিচিত ছিলাম। পরিচিত হতে চেয়েছিলাম।

রমা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আমার কল্পলোকের নায়িকাদের নিয়ে পড়ল। গল্পে যাই লিখি না কেন, আমার সম্পূর্ণ কল্পিত নায়িকারা যেরকমই হোক না কেন, প্রত্যেককে ও চিনে ফেলতে লাগল। মানে ও মনে করতে লাগল ও চিনে ফেলেছে। ও কখনও বুঝতে চাইল না, নায়িকারা লেখকের মনের মধ্যেই থাকে—কোনো রক্ত-মাংসের মেয়ে হয়ত সেই মেয়ের ছায়ায় প্রতিফলিত হয় অথবা তার মুখ চিবুক তার চরিত্র হয়ত সেই কল্পনার নায়িকার মধ্যে সংক্রমিত হয় মাত্র।

এমন একটা অবস্থা হল যে, আমি যা করি তাই ওর কাছে খারাপ লাগতে লাগল।

কোনো পার্টিতে গিয়ে কম কথা বললে, বাড়ি ফিরে ও বলত, তুমি এত দাম্ভিক কেন? গোমড়ামুখে রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকলে কি তুমি মনে করো তোমাকে ভাল দেখায়?

যদি বা কখনো কথা বলতাম, হাসতাম, সহজ হতাম, লোককে মজার কথা বলে হাসাতাম, ও বাড়ি ফিরে বলত, তুমি এত ছ্যাবলা কেন? সব জায়গায় গিয়েই কি তোমার ভাঁড়ামো করতে হবে?

আসলে, আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই একটা অনস্তিত্বে পেঁছে দিয়েছিল রমা। এমন কি কোর্টে দাঁড়িয়ে সওয়াল করার সময়েও আজকাল আমার মনে সংশয় জাগত বোধহয় জজসাহেবদের ইমপ্রেস্ করতে পারছি না। লিখতে বসলে, কেবলি মনে হত বোধহয় লেখাটা ভাল হচ্ছে না—যাঁরা পড়বেন, তাঁরা বোধহয় আমাকে বুঝবেন না—তাঁরাও বোধহয় রমার মত আমাকে নস্যাৎ করে দেবেন। কোথাও কোনো সুন্দরী মেয়ে হঠাৎ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকালে আমার ভয় হত, লজ্জা হত; আমি মুখ নামিয়ে নিতাম। আমার দু'কান লাল হয়ে গরম হয়ে যেত। আমার মন বলত ও চাউনি ফেরত দিও না—তোমার মধ্যে ভালো লাগার মত কিছুই নেই। তোমাকে কারোই ভাল লাগবে না। তুমি জীবনের রেসে খোঁড়া ঘোড়ার মত বাতিল হয়ে গেছ চিরদিনের মত।

আমার জীবনের সেই দুর্দৈবদিনে ছুটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ওড়া সুগন্ধি আম্রমুকুলের মত রাশ রাশ নরম আশায় আমার জীবন ভরে দিল।

ভেবেচিন্তে না বললেও, বলল যে আমাকে ওর ভালো লাগে, ডাকসাইটে উকীল হিসেবে নয়, বাড়ি-গাড়ির মালিক হিসেবে নয়, একজন নিছক পুরুষমানুষ হিসেবে, একজন স্বল্পপরিচিত নতুন লেখক হিসেবে।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার লেখা যদি আর কেউ নাও পড়েন, যদি কখনও এ লেখা কারো ভালো লাগার মত নাও হয়, তবুও মাত্র একজনের ভালো-লাগার জন্যেও আমার কষ্ট করেও লেখা উচিত। শুধু ছুটির জন্যেই লেখা উচিত।

লেখা মাত্রই কষ্ট করে লিখতে হয়—। এমন কোনো লেখা, সত্যিকারের ভাল লেখা নেই, যা কষ্ট না পেয়ে এবং কষ্ট না করে লেখা যায়। কিন্তু আমার কষ্টটা অন্য কষ্ট। ওকালতী করতে করতে লেখাটা আরো বেশী কষ্টের। নিজের নিজস্ব অবকাশের বিনিময়ে লেখা। তাই ও লেখা খারাপ হলে, যাদের জন্যে লেখা, তাঁদের খারাপ লাগলে, সে বড় মর্মান্তিক।

যখন কোথাও কোনো আশা ছিলো না, হৃদয়ে, আমার নরম লজ্জানত লতার মত কোমল হৃদয়ে, যখন কাঁটার বন গজিয়ে উঠেছিল, যখন মানুষ কেন বাঁচে, বাঁচার মানে কি জীবন বলতে কি বোঝায়, এ সব কথার একটাই নীরেট অন্ধকার উত্তর আমার সামনে ছিল—সে উত্তর ছিল আত্মহত্যা—ঠিক সেই সময় ছুটি, আমার চেয়ে অনেক ছোট ছুটি একটা হলুদ তাঁতের শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে বেণী ঝুলিয়ে এক রবিবার আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল—তার ভালোলাগার লেখককে দেখতে।

তারপর কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছিল আমার মধ্যে—হয়ত ছুটির স্বপ্নময় মুঠি-ভরা বুকের মধ্যেও—যার ব্যাখ্যা আমি জানি না।

একটা আচ্ছন্ন আকৃতি বোধ করেছিলাম সেদিন, অন্ধকার নিশ্ছিদ্র কারাগারের মধ্যে বসে, আলোয়-ভরা আকাশের দিকে বুঝি হঠাৎ চোখ পড়েছিল।

ছুটি তার ছোট্ট মুখে ধীরে ধীরে আমাকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছিল।

ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়েও সেসব কথা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। সেসব কথা আগে হয়ত অনেকের কাছে শুনেছিলাম, অনেক বইয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কখনও তা গ্রহণ করিনি। যদি কেউ কিছু বলে এবং যাকে তা বলা হয় তারা যদি একই ওয়েভ-লেংথে ভাবের আদান-প্রদান না করে তাহলে সে কথা বুঝি বিফল হয়।

হয়ত কারো অভিশাপে আমার ও রমার এই ওয়েভ-লেংথের গণ্ডগোল হয়ে গেছিল। ও যখন মিডিয়াম-ওয়েভে ওর যা বলার বলেছিল, আমি তখন শর্ট-ওয়েভে কান পেতে ছিলাম। আমি আবার যখন কিছু বলব বলে মিডিয়ম ওয়েভের মাউথপীসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন রমা সেই রিসিভারের কাছ থেকে হয়ত সরে গেছিল।

রমার সঙ্গে যদি বা কখনও মিটমাটের সম্ভাবনা ছিল, ছুটি আমার জীবনে আসার পর সে সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ হয়ে গেল।

আমার কোনো উপায় ছিলো না। রমার জন্যে আমি দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করেছিলাম, ও আবার ওর পুরানো মনের ঘরে ফিরে আসবে বলে। অনেক বিবাগী হিয়াই বাহির পথে অনেক কিছুর খোঁজে যায়; কিন্তু খোঁজা শেষ হলে আবার সেই সুখের পুরানো ঘরেই ফিরে এসে ছেঁড়া-আসন পেতে দুয়ার দিয়ে বসে।

আমি ভেবেছিলাম রমাও তাই ফিরবে।

কিন্তু রমাও বুঝি আমারি মত ভীষণ দেরী করে ফেলল—যে খোলা দরজাটি দিয়ে সে বেরিয়ে গেছিল সেই দরজা দিয়েই ছুটি অবলীলায়, সম্মানের সঙ্গে তাব সরল ঋজুতায় ও ছেলেমানুষী সততায় ভর করে আমার মনে প্রবেশ করল। আমার শীতের রাতগুলি, আমার একঘেয়ে আনন্দহীন দিনগুলি হঠাৎ এক চঞ্চল আনন্দঘন বাসন্তী উষ্ণতায় ভরে গেল।

আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করল নতুন করে। পৃথিবীর অন্য কোনো লোকের অন্যায় মর্জি ও খেয়াল-খুশীর উপর যে আমার বেঁচে থাকা-না-থাকা নির্ভরশীল নয়, ছুটিই তা আমাকে শেখাল। আমাকে বোঝাল যে, এ জগতে কেউই কাউকে কিছু নিজে থেকে দেয় না—যা পাবার তা নিজের অধিকারে শক্ত হাতে সুপুরুষের মত কেড়ে নিতে হয়। শেখাল যে আমাকে শুধু আমার নিজের জন্যে আমার একার জন্যেই বাঁচতে হবে। আমার জীবন আমার নিজের কাছে সবচেয়ে দামী। ও আমাকে স্বার্থপর হতে বলল।

অগ্নিসাক্ষী করে কাউকে কোনোদিন বিয়ে করেছিলাম বলেই, কাউকে সমস্ত উষ্ণতায় ভরা হৃদয় দিয়ে একদিন ভালোবেসে ছিলাম বলেই যে আমার সেই নিবে-যাওয়া যজ্ঞের আগুনে সেই ডিপ-ফ্রিজে-রাখা কোঁকড়ানো ঠান্ডা হৃদয়ের কবরে বাকি জীবন হাহাকারে কাটাতে হবে একথা ঠিক নয়।

ছুটিই বলেছিল, এখনো কাউকে নতুন করে ভালোবাসা যায়, এখনো হিম-হয়ে যাওয়া হৃদয়ে তাপ সঞ্চারিত হতে পারে, এখনও আকাশ-ভরা আলোর মত নম্র নতুন কারো উষ্ণ নরম নগ্ন নির্জন হাতে হাত রাখার যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে।

কখন অনবধানে তখন বলে ফেলেছিলাম, আমি আবার নতুন করে বাঁচব ছুটি। তোমার হাত ধরে আমি আবার বাঁচব।

আমার বড় শীত করে ছুটি, আমার ভীষণ শীত করে। তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যেও না, তুমিও আমাকে ধুলোয় ফেলো না, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই ছুটি, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আজ তুমিই আমার শেষ অবলম্বন।

যে লোকটা একা একা বাঁচতে চাইত, প্রশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলাকেই বাঁচা বলে জানত, সে লোকটা মরে গেছে।

এখন সে তার জীবনে আবারও একান্ত পরনির্ভর।

ছুটি তুমি সেই দয়ার, ভালোবাসার, ভালো ব্যবহারের কাঙাল মানুষটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তোমাকে ছাড়া আমি কারুকে জানি না, কারুকে মানি না; কারুকে জানতে চাই না।

তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ছুটি? ও ছুটি; তুমি আমার এই অন্তরের একান্ত কথা কি শুনতে পাচ্ছ? সব কথাই কি মুখে অথবা লিখেই জানাতে হয়, এক হৃদয়ের কথা শব্দতরঙ্গে ভেসে কি অন্য হৃদয়ে পেঁাছায় না? যদি নাই-ই পেঁাছায় ত কিসের ভালোবাসায় বিশ্বাস করি আমরা, কিসের আন্তরিকতা আমাদের?

তুমি আমার এই এলোমেলো একরাশ নীরব স্বগতোক্তি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ। পাচ্ছ না ছুটি? ছুটি?

॥ দশ ॥

একদিন সকালে লাবু এসেছিল।

লাবু বলল, আমাদের বাড়ির দিকে যাবেন? আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।

আমি বললাম, আগে রসগোল্লা খাও, তারপর যাব।

লাবু অত্যন্ত আপাত-আপত্তিসহকারে গোটা আষ্টেক রসগোল্লা খেল। তারপর বলল, দাদাকে বলবেন না যেন আমি রসগোল্লা খেতে চেয়েছিলাম।

আমি বললাম, তুমি ত খেতে চাওনি। আমিই তোমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি কি খেতে ভালবাস। তোমার এতে দোষ কি? আর তুমি না আমাকে দাদা বলো। দাদার কাছে যদি আবদারও করতে, তাতেও বা দোষের কি ছিল।

লাবু বলল, জানেন সুকুদা, এই পাহাড়ে আমার বাবা ভালুক শিকার করেছিলেন।

বললাম, তোমার বাবাকে তোমার মনে আছে?

মনে নেই। আমার কিছুই মনে নেই। আমি ত তখন দু বছরের ছিলাম যখন বাবা হঠাৎ অসুখে মারা যান। আমি মার কাছে গল্প শুনেছি।

পলাশ, কেঁদু, জংলীঘাস, ও শাল-সেগুনের জঙ্গলে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর কতগুলো আম ও পেয়ারা গাছের ঝুপড়ির আড়ালে একটা জরাজীর্ণ দু-কামরা বাড়ি চোখে পড়ল। দূর থেকে।

বাড়িটা প্রায় ভেঙে পড়েছে।

দরজা-জানালা যে-কোন সময়ে খুলে পড়ে যেতে পারে। বাইরের বারান্দার একটা পাশ চট দিয়ে ঘেরা। মহুয়া—গত বছরে তোলা মহুয়া—ডাঁই-করা আছে এক কোণায়, তার পাশে খোঁটায় বাঁধা একটা লাল-রঙা বাছুর বড় বড় চোখ মেলে পায়ের উপর মুখ রেখে শুয়ে আছে।

লাবু সেই বারান্দায় একটা হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারে আমাকে বসতে বলে বলল, বসুন সুকুদা, আমি মাকে ডেকে আনছি।

আমি বললাম, তুমি আমাকে কি যেন দেখাবে বলেছিলে?

লাবু ওর ভাঙা দাঁত বের করে সরল লাজুক হাসি হাসল, হেসে বলল, দেখাব; দেখাব। আপনি ত এক্ষুনি পালাচ্ছেন না।

আমাকে বসিয়ে রেখে লাবু চলে গেল।

চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম।

দারিদ্র্য চতুর্দিকে বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। দারিদ্র্য মানে, চরম দারিদ্র্য!

জানি না কি করে ওদের দিন চলে। হয়ত এই রকম জায়গা বলেই এখনো চলে, কোনরকমে চলে—কোলকাতার মত কোন নিষ্ঠুর নির্দয় জায়গা হলে হয়ত এতদিনে এদের চলা থেমে যেত।

চারিদিক থেকে ঘুঘু ডাকছে। বাড়ির পিছনের জঙ্গল থেকে গরু ডেকে উঠল: বোঁয়াও। কোথায় কে যেন কাঠ কাটছে—তার শব্দ পাহাড়ের তলা অবধি গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক দল ছাতারে বাড়ির হাতার পিটীস ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এসে শীতের রোদে সভা বসিয়েছে।

চারিদিকে নিবিড় শান্তি, স্তব্ধ সৌন্দর্য, তার মাঝে এই জরাজীর্ণ বাড়ি। বাড়ির মধ্যে লাবু থাকে তার মা ও দাদাকে নিয়ে। এ বাড়িতে বর্ষায় ওরা কি করে থাকে ভাবছিলাম। ভাবতেও অবাক লাগছিল।

দরজার দু'পাশে অযত্নবর্ধিত দুটি লতানে গোলাপের গাছ। ছোট ছোট সাদা ফুল ধরেছে তাতে। এক জোড়া বুলবুলি ফিসফিস করে কি যেন বলতে বলতে তাতে দোল খাচ্ছে।

ওখানে বসে নিজের ভাবনার মধ্যে নিজে কখন বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ লাবুর গলা শুনলাম, সুকুদা, এই যে আমার মা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম।

ভদ্রমহিলা তাঁর তোরঙ্গের কোণা থেকে বের করা ভাঁজ-ভাঙ্গা ন্যাপথলিনের গন্ধ ভরা সবচেয়ে ভাল কাপড়খানি পরে এসেছিলেন।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। আগুনের মত গায়ের রঙ—এক সময় ছিল—এখন রোদে-জলে-ঝড়ে তামাটে হয়ে গেছে। তবু চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

আভিজাত্য বুঝি সহজে মুছে যায় না—তার রঙ বড় পাকা—রোদ জল, দুঃখ-দারিদ্র্য কিছুই পারে না সেই রঙকে ম্লান করতে—যদি অন্তরে দারিদ্র্য না থাকে।

উনি বললেন, বসো বাবা বসো। লাবুর কাছে তোমার অনেক গল্প শুনেছি। সেদিন তুমি মান্দার থেকে লাবুর জন্যে মিষ্টি পাঠিয়েছিলে তা পেয়েছিলাম। লাবু তোমার খুব ভক্ত হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ডাবু কোথায়?

সে ত স্কুলে গেছে। সেই ভোরে বেরিয়ে যায়—পাঁচ মাইল পথ—আবার স্কুল সেরে ফিরতে সন্ধ্যে। ফিরে এসেও বাড়ির কাজ করতে হবে। আমার অসুখ হলে রান্না-বান্না সব ওই করে।

তারপর বললেন, আমার লাবুও কিন্তু অনেক কাজ করে। না করলে চলবে কি করে বল? ওদের কপালে ছিল কষ্ট করা, কষ্ট করতেই হবে, যতদিন না ওরা মানুষ হয়, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়ায়। আমি নিজের সুখের আশা আর রাখি না। ওরা যদি বড় হয়ে একটু সুখের মুখ দেখে—এই ভেবেও আমার ভাল লাগে।

বললাম, লাবুর বাবা এখানে কি করতেন?

উনি খিলাড়ির সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন। সে সময়ে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন উইক-এণ্ডে এসে পিকনিক করার জন্যে, ছুটি কাটাবার জন্যে। তখন ত ভাবিনি যে উইক-এণ্ডে ছুটি কাটানোর আস্তানায় সরাজীবন কাটাতে হবে।

এই অবধি বলেই উনি বললেন, বসো বাবা, তোমার জন্য একটু চা করে আনি।

আমি বললাম. আমি তো চা এক্ষুনি খেয়ে এলাম।

তা না হয় খেয়েই এলে. এই প্রথমবার আমার বাড়িতে এলে, একটু কিছু না খেলে হয়!

তারপর যাবার সময় বললেন, লাবু, ততক্ষণে তোমার দাদাকে তোমার বাবার ছবিগুলো দেখাও।

লাবু একটু পরে একটা রুপোর পানের ডিবে নিয়ে এল। বেশ বড় সাইজের ডিবে—ধুলো পড়ে রুপোর রূপ আর কিছু অবশিষ্ট নেই তার।

ডিবে খুলে আমার হাতে দিয়ে, লাবু বলল, এই যে ছবি দেখুন সুকুদা। তারপরই অনেকগুলো ছবি ঘেঁটে লাবু একটা ছবি বের করে বলল, এটা আমার অন্নপ্রাশনের ছবি, দেখুন আমি কেমন গোল ছিলাম।

দেখলাম একটি বাচ্চা ছেলে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে তার সুন্দরী যুবতী মায়ের কোলে বসে আছে। চতুর্দিকে সুবেশা আত্মীয়াদের ভিড়। বিরাট প্যাণ্ডেলের পটভূমিতে লাবুবাবু মায়ের কোলে চড়ে তার অন্নপ্রাশনের দিনে ভীষণ কাঁদছেন।

আমি বললাম, আরে, তোমাকে ত চেনাই যায় না. তুমি ত দারুণ ফর্সা আর গোলগাল ছিলে।

লাবু সগর্বে ও সলজ্জে বলল, হ্যাঁ।

লাবুর বাবার ছবি দেখলাম।

লম্বাচওড়া সুপুরুষ ভদ্রলোক। সিডান-বডি গাড়ির পাশে. স্যুট পরে অফিসে বসে কাজ করছেন। কোনোটা বা শিকারের পোষাকে; বন্দুক-হাতে ছবি।

উনিশশ সাতচল্লিশের পরই পূর্ব বাঙলার রিফিউজিরা তাঁদের কখনও পূর্ব বাংলায় কিছু যে ছিল একথা বললেই. পশ্চিমবঙ্গীয় স্থায়ী বাসিন্দারা যেমন অনেকেই তা শ্লেষের সঙ্গে অকারণে অস্বীকার করতেন, এই ছবিগুলো প্রমাণস্বরূপ না থাকলে লাবুদের অতীতকেও বোধহয় সকলে তেমনি অক্লেশে অবিশ্বাস করত।

অন্তত বেশীর ভাগ লোকই করত।

তা-ই বোধহয় এত যত্ন করে ছবিগুলোকে রাখা—কেউ এলেই প্রথমেই তাকে ছবিগুলো দেখানো—তাকে মিনতি করে চোখের ভাষায় বলা যে, আজ যা দেখছ এইটেই সত্যি নয়—আমরা আগে অন্যরকম ছিলাম।

টাকা-পয়সা স্বচ্ছলতা এ সব নাকি কিছুই নয়। আজ আছে কাল নেই। অথচ স্বচ্ছলতা

থাকা আর না থাকায় কতবড় তফাত। স্বচ্ছলতা থাকার সময় অস্বচ্ছলতার গ্লানি ও ক্লেশের কথা ভাবাও মুশকিল। সে কথা মনেও পড়ে না।

বসে বসে ফটোগুলো নাড়তে-চাড়তে ভাবছিলাম, রমা এ দিকটাও কখনো ভাবে না। ভাবার প্রয়োজন মনে করে না—কারণ লাবুর মার কাছে যেমন, রমার কাছেও তেমন, স্বচ্ছলতাই বড় কথা।

লাবুর মা স্বচ্ছলতার জন্যে লাবুর বাবার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। রমা আমার উপর তা নয়। সে নিজের রোজগারে নিজে খেতে পারে, সে কোনো-ব্যাপারেই আমার উপর নির্ভরশীল নয়। আমি তার জন্যে কিছুমাত্র করিনি, আর যে কিছু করব সে ভরসাতেও ও বসে নেই। ইদানীং এ কথাটা সে কারণে-অকারণে আমাকে বহুবার শোনায় যে, ইচ্ছা করলেই আমি যা রোজগার করি তার চেয়ে অনেক বেশী গুণ সে রোজগার করতে পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, রোজগার করাটাই কি দাম্পত্য জীবনের সিমেণ্টিং ফ্যাক্টর? লাবুর মার রোজগার করার ক্ষমতা নেই বলেই কি আজও লাবুর বাবার অভাব উনি এমনভাবে বোধ করেন? তাঁর মৃত্যুর পর ওঁদের অবস্থা এতটা অস্বচ্ছল না হলে কি সহজেই উনি তাঁর স্বামীকে ভুলে যেতেন? জানি না। হয়ত যেতেন।

তা-ই যদি হয় তাহলে ভালোবাসা কি? ভালোবাসা বলে কি কিছুই নেই?

আজকাল মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সব বদলে গেছে। অথবা আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে আমার একারই বুঝি এই সম্পর্কটা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে। আর সব বিবাহিত লোকই বোধহয় দারুণ খুশী। অথবা তাঁরা বোধহয় স্বচ্ছলতা পেলেই, শনিবারে সিনেমা দেখলেই, রবিবার দুপুরে ভরপেট খেয়ে পান মুখে দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে শুতে পেলেই নিজেদের পরম সার্থক স্বামী বলে মনে করেন?

তাও কি সত্যি? তবে ভালোবাসা কী?

যথার্থ সুখী দম্পতি হয়ত নিশ্চয়ই আছেন—অন্তত অনেককে ত দেখি। তাঁরা কি অন্য কারো সুখ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা সুখী হয়েছেন?

না কি তাঁরা সুখের ভান করেন? জানি না।

একটু পরে লাবুর মা এলেন, একটা কাঠের ট্রেতে বসিয়ে—ট্রের উপর হাতে-বোনা লেসের বহু পুরোনো ম্যাটস্ পেতে পুরোনো দিনের জাপানী রেকাবে করে চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে দুটি বিস্কুট।

বললেন, খাও বাবা। খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তারপর বললেন, বৌমাকে নিয়ে একবার এসো আমাদের বাড়ি। তুমি ত এখানে অনেকদিন আছ শুনেও ত শুনি বেশ কিছুদিন। কই? বৌমা ত এলেন না?

আমি বললাম, তিনি কোলকাতাতেই আছেন, নানারকম ঝামেলা, তার উপর ছেলের স্কুলের পড়াশুনা দেখতে হয়—তিনি আসতে পারেন না। যদি আসেন এখানে ত নিয়ে আসব।

চা খেতে খেতে ভাবছিলাম যে, যদি রমা কখনও আসেও এখানে, তাহলেও কোনদিনও এ বাড়িতে আসবে না।

না-আসার অন্য কোন কারণ নেই যেহেতু আমি অনুরোধ করব, সেজন্যেই আসবে না।

আমি জানি, ও বলবে, পাবলিক রিলেশান্স করতে ত এখানে আসিনি—আমার যার তার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আমি একজন যথেষ্ট ইম্পর্ট্যাণ্ট লোক।

আমাকে অনামনস্ক দেখে লাবু বলল, কি? চা-টা খান। তারপরে ত' আপনাকে নিয়ে যাব।

বললাম, কি, দেখাবে কি?

লাবু বলল, চলুনই না।

চায়ের কাপটা শেষ করে উঠে লাবুর মাকে বললাম, চলি মাসীমা।

উনি হেসে বললেন, যাওয়া নেই, এসো বাবা। আবার এসো।

লাবুর সঙ্গে জঙ্গলের ভিতরে যেতে যেতে ভাবছিলাম, আমাদের এই মাসীমা-পিসীমারা একেবারেই বদলাননি। স্ত্রীরা বদলে গেছে, ভাই-বোনেরা বদলে গেছে বড় তাড়াতাড়ি। গত প্রজন্ম থেকে এ প্রজন্মের অনেক তফাৎ অনেক ব্যাপারে। কিন্তু এই জরাজীর্ণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা জঙ্গলের মধ্যের পর্ণকুটিরের মাসীমা—গত প্রজন্মে যেমন ছিলেন এ প্রজন্মেও তেমনই আছেন! তাঁদের উপরে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের হৃদয়হীনতার, যান্ত্রিকতার, কোনো প্রভাব পড়েনি।

লাবু আমাকে ওদের বাড়ি থেকে অনেক দূর হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

জায়গাটায় ভীষণ জঙ্গল। একটা নুড়ি-ভরা টিলা মত আছে সামনেই। তার পিছনেই একটা ঝরণা। টিলার গায়ে একটা গুহা। ছোট্ট গুহা।

লাবু সাবধানে গিয়ে গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরালো। তারপর বলল, ভিতরে যেতে হবে।

বললাম, ঢুকব কি করে?

ও বলল, আমি যা-করে ঢুকছি।

বলেই, লাবু অবলীলায় ভিতরে ঢুকে গেল।

ওর দেখাদেখি আমিও মাথা নীচু করে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

গুহাটা বেশ বড়। চার-পাঁচজন লোক পাশাপাশি আরামে শুয়ে থাকতে পারে।

গুহার একদিকে একটা পুরোনো চট পাতা। সেই চটের উপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা জরাজীর্ণ একটি 'চাঁদের পাহাড়' বই। একটা লালরঙা ছেঁড়া তাঁতের শাড়ি, একটা প্রমাণ সাইজের জুতো এবং যাত্রাদলে ব্যবহার করা রাংতা-মোড়া একটা তলোয়ার।

লাবু ফিসফিস করে বলল, এটা রাজার গুহা।

তারপর বলল, রাজার সব আছে, শুধু টুপী নেই। একটা টুপী হলেই রাজা ঠিকমত রাজত্ব চালাতে পারে।

আমি অবাক হয়ে ওখানে বসে পড়লাম।

গুহাটার গড়ন আশ্চর্য। মাথাটা পুরো ঢাকা অথচ চার পাশে এমন ফাঁক-ফোঁক যে প্রচুর আলো আসে ভিতরে—এত আলো যে, স্বচ্ছন্দে বই পড়া যায়।

লাবু বলল, বর্ষাকালে আমি এখানে বসে বৃষ্টি দেখি, অথচ আমার গায়ে একটুও ছাট লাগে না। এমনকি মাথাতেও জল পড়ে না।

আমি বললাম, সত্যি?

তারপর বললাম, তোমার সিংহাসনটা দারুণ।

লাবু আবার হাসল, নির্মল খুশীতে ওর লালচে রুক্ষ মুখটা আর কটা চোখটা ভরে গেল।

লাবু বলল, শুধু টুপী নেই; আর রাণী নেই।

বললাম, তোমাকে একটা টুপী আমি আনিয়ে দেব রাঁচী থেকে।

লাবু সোজাসুজি ওর খসখসে গলায় আমার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, কবে?

যত তাড়াতাড়ি পারি।

পরক্ষণেই লাবু বলল, আর রাণী?

এবার আমি হেসে ফেললাম।

বললাম, কোনো রাজাকে কি কেউ রাণী দিতে পারে। রাজার নিজে যেতে হয় ঘোড়ায় চেপে—রাণীর স্বয়ংবর সভায় পৌঁছতে হয়—রাণীর পছন্দ হলে তবে রাণী তোমার গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তখন ঘোড়ায় চড়িয়ে রাণীকে নিয়ে আসতে হবে।

লাবু দু হাত দুদিকে তুলে প্র্যাকটিক্যাল গলায় বলল: আমার তবে রাণী হবে না। হবে না।

খুব মজা লাগছিল ওর হাবভাব দেখে। বললাম, কেন? রাণী হবে না কেন?

লাবু দার্শনিকের মত বলল, সে অনেক ঝামেলা।

লিনটন সাহেবের একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল। একদিন গরু চরিয়ে ফিরছি, দেখি সেটা একা একা পানুয়ানা টাঁড়ে চরে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবলাম, এই বেলা একটু ঘোড়া চড়ে নিই। ছাগলে চড়েছি, গরুতে চড়েছি, শুধু ঘোড়া চড়িনি। তারপর না সুকুদা—যেই-না তড়াক করে ওর পিঠে চড়ে ওর কান ধরেছি, পেছনের দু'পা তুলে এমন এক লাফ লাগালো যে আমি শূন্যে তিন ডিগবাজী খেয়ে একেবারে ধাঁই করে গিয়ে পড়লাম একটা পাথরে। হাঁটুতে যা লেগেছিল না। সেই থেকে আমি ঐ হাঁটুটা মুড়ে বসতে পারি না।

থাক সুকুদা, রাণী-টানির দরকার নেই। নিজেই চড়তে পারি না, তার আবার রাণীসুদ্ধ ঘোড়ায় চড়া।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, রাজপাট ত দেখা গেল, কিন্তু প্রজারা কোথায়?

লাবু দুষ্টুমির হাসি হাসল। বলল, আছে: দেখবে।

বলেই গুহার মধ্যে থেকে একটা শিল পাটার সাইজের চ্যাটানো পাথর সরিয়ে ফেলল দু'হাত দিয়ে। পাথরটা সরাতেই একটা ফোকর হয়ে গেল—আর সে ফোকর দিয়ে যা দেখলাম, তাতে দু চোখ জুড়িয়ে গেল।

বুঝতে পারলাম, টিলাটা একটা চড়াই-এর শেষে—গুহাটার অন্য পাশে সোজা খাদ নেমে গেছে প্রায় পঞ্চাশ ফিট।

নীচ দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। গুহাটার ঠিক সামনে একটা বাঁক নিয়েছে নদীটা। নদীর ওপাশে গভীর জঙ্গল। এখন দুপুরের রোদে শান্ত সবুজ জেল্লা দিচ্ছে গাছ-পাতা থেকে।

লাবু বলল, সন্ধ্যের আগে আগে এখানে এলে, এসে বসলে, দেখতে পাবে, কত প্রজা আমার। কত পাখি—কত্ব-কত্ব—ঘুঘু, টিয়া, ছাতারে, বুলবুলি, বনমুরগী, তিতির, বটের, ঢাবপাখি, টি-টি পাখি, আরো কত কি!

হরিয়াল পাখিরাও ঐ দিকের অশথের ডাল থেকে নদীতে জল খেতে নামে। যখন নামে, তখন ঠোঁটে করে পাতা ভেঙে নিয়ে এসে বালির উপর রেখে তার উপর পা দিয়ে দাঁড়ায়। হরিয়ালেরা কখনো পা মাটিতে ফেলে না, জানেন না তো?

বললাম, না ত।

তারপর বললাম, আমাকে আপনি করে বোলো না, কেমন দূরের দূরের লোক বলে মনে হচ্ছে। আমি কি তোমার দূরের লোক?

লাবু লজ্জা পেয়ে হাসল।

বলল, ধ্যাৎ।

তারপর বলল, আচ্ছা, তাই হবে, শোনো, আরো কত প্রজা আমার। কাঠবিড়ালি, খরগোশ, সজারু, বুনোশুয়োর, হায়না, লুমড়ী, নেকড়ে সবাইকেই দেখতে পাবে। একসঙ্গে নয়, মাঝে মাঝে।

এই অবধি বলে, লাবু হঠাৎ চুপ করে গেল।

তারপরই বলল, আচ্ছা, রাজা মরে যাবার পর রাজত্ব কে পায়?

বললাম, কেন? রাজার ছেলে পায়।

লাবু বলল, ধ্যাৎ। দেখছ রাণীই নেই আমার, হবেও না। ছেলে পাব কোত্থেকে?

বললাম, এতটুকু রাজার মরার কথা উঠছে কি করে?

লাবু চোখ বড় বড় করে বিজ্ঞের মত বলল, মরার কথা কেউ বলতে পারে? মাথা নাড়িয়ে বলল, মরার কথা কেউই বলতে পারে না।

তারপর বলল, বলো না সুকুদা, রাজার ছেলে না থাকলে রাজত্ব কে পায়?

নিরুপায় হয়ে বললাম, রাজা যাকে দিয়ে যান, সেই পায়।

তাইই। সত্যি? তাইই? লাবু আমাকে শুধোল।

তারপর বলল, তাহলে ভালই হল। তোমাকেই আমি দিয়ে যাব। আমি মরলে।

বললাম, এবার অন্য কথা বল।

লাবু নাছোড়বান্দা। বলল, আচ্ছা রাণী আনতে ত ঘোড়া করে যায়, স্বর্গে যেতে কিসে করে যায়?

বললাম, কি করে জানব। আমি কি গেছি?

তুমি যাওনি ত কি? বাবা ত গেছে। মা বলেছিলেন আমাকে, ঢাব পাখির পিঠে করে যায়।

বললাম, ঢাব পাখি মানে ঐ বড় বাদামী লেজ-ঝোলা পাখিগুলো? ওগুলোকে আমি কুম্ভাটুয়া বলি।

তুমি যা-খুশী বল, ওগুলো ঢাব পাখি। গভীর রাতে কেমন ডাকে দ্যাখোনা? ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব। স্বর্গে যেতে হলে ঢাব পাখির পিঠে চড়েই যেতে হব। আমার রাজত্বে ত ওরা অনেক আছে। স্বর্গে যেতে তাহলে আমার কোনো অসুবিধে নেই? কি বল?

তারপরেই বলল, ধ্যাৎ তেরী যা বলছিলাম. আমার তোমাকে খুব ভাল লাগে। আমার রাজত্ব আমি তোমাকে দিয়ে যাব।

আমি হাসলাম. শুধোলাম, আমাকে কেন ভাল লাগে লাবু? কি কারণে?

লাবু আর আমি গুহা থেকে বাইরে আসছিলাম, গুহার পাথরটা ঠিক করে বসিয়ে রাখতে

রাখতে লাবু লাজুক মুখে বলল, এমনিই।

এমনিই আবার কারো কাউকে ভালো লাগে না কি? আমি বললাম।

মানে, এই গুহার মধ্যে আমার এই ছোট্ট ঘরে এলে যেমন লাগে, তোমার কাছে গেলে আমার তেমন লাগে সুকুদা। তোমার কাছে গেলে আমার ভাল লাগে।

লাবু পাথরটা বসিয়ে রেখে আগে আগে নামছিল।

আমি ওর পিছনে পিছনে নামছিলাম।

কি করে এই সরল অপাপবিদ্ধ শিশুকে বলব জানি না, ওকে বলা যায় না যে, নিজের উষ্ণতার জন্যে অন্য কারো উপরে নির্ভরশীল হতে নেই, হলেই তার কপালে আমারই মত দুঃখ।

এসব কথা ও এখন বুঝবে না। ও এক্ষুনি অনবধানে ওর শিশুসুলভ ভাষায় যে দামী কথাটা বলে ফেলল, ওর যন্ত্রণাময় যৌবনে, ওর প্রসন্ন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে ঐ কথাটাই ও নতুন করে শিখবে, জানবে, ভাববে।

সেদিন ও বুঝতে শিখবে, পরনির্ভরতার মত অর্বাচীনতা আর বুঝি কিছু নেই। ও সেদিন জানবে, নিজের হৃদয়ের উষ্ণতায়, নিজের মধ্যের জেনারেটরে তাপ সঞ্চারণ করে এই ঠাণ্ডা নির্দয় পৃথিবীতে যে বাঁচতে না পারে, তার বাঁচা হয় না। তার জন্য এই পৃথিবী একটি চলমান প্রাগৈতিহাসিক হিমবাহ।

টিলা থেকে নেমে লাবুকে বললাম, লাবু, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার যখনই ইচ্ছা করবে, চলে আসবে। কোনো লজ্জা করবে না; আমার বাড়িতে যদি অতিথি থাকে তখনও লজ্জা করবে না, বুঝেছো?

তুমি এলে আমারও সত্যিই খুব ভাল লাগে।

লাবু বলল, বেশ। তারপর বলল, আমার গুহাটা, মানে, আমার রাজত্ব তোমার ভাল লাগেনি?

বললাম, ভাল মানে? দারুণ লেগেছে। আজ থেকে তোমার নাম দিলাম, রাজা লাবু।

লাবু হেসে ফেলল। বাঁহাত দিয়ে কপালে-পড়া চুল সরিয়ে বলল, তুমি ভীষণ মজার। তুমি খুব ভাল, জানো সুকুদা, বলেই এগিয়ে এসে লাবু আমার হাত ধরে ঝুলে পড়ল।

॥ এগারো ॥

বলা নেই কওয়া নেই, সেদিন সাত-সকালে শৈলেন এসে উপস্থিত। শৈলেন ঘোষ।

গেট খুলে ঢুকতে ঢুকতেই চেঁচিয়ে বলল, দাদা, খাওয়ার কি আছে? ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

যখন কাছে এসে পেয়ারাতলায় চেয়ার টেনে বসলো তখন বললাম, কি খাবে বল?

ও বলল, কি খাব না তাই বলুন? আছে?

বললাম, কি চাই?

ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে লালি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

শৈলেন নিজেই শুধোলো, কি আছে ঘরে?

লালি বলল, আণ্ডা হ্যায়।

শৈলেন বলল, কঠো আণ্ডা হ্যায়?

লালি বলল, এক ডজন।

তব্ ছেঠো আণ্ডাকা ওমলেট বানাকে লাও, জলদি। ঔর চায়ে।

লালি ওকে বোধহয় বিশ্বাস করল না। শুধোলো, ছে আণ্ডাকা ওমলেট?

শৈলেন বলল, হাঁ হাঁ। জলদি।

আমি ওর রকম দেখে হাসছিলাম।

ও শান্ত হয়ে বসার পর বললাম, অত ডিম খাওয়া কিন্তু শরীরের পক্ষে খারাপ। ডিমে ক্লোরোস্ট্রোল্ বাড়ায় জানো ত?

শৈলেন বলল, ক্লোরোস্ট্রোল্ কি দাদা?

বললাম, রক্তের ঘনতা; ক্লোরোস্ট্রোল্ বাড়লে স্ট্রোক হয়।

শৈলেন জোরে হেসে উঠল, বলল, ও সব বড়লোকদের অসুখ, যারা রোজ ভাল ভাল জিনিস

খায় তাদের জন্যে। আমি কি রোজ সকালে নিয়ম করে ডিম খাই? মাসে একদিন খাই কি না সন্দেহ, খেলেও ডিমের কারী নয়ত ডিমসেদ্ধ, মাঝে মধ্যে। তাই এক সংগে ছটা আটটা ডিম খেলে আমাদের মত লোকের কিছুই হবে না।

আমি শুধোলাম, তোমাদের থিয়েটারের রিহার্সাল কতদূর এগোল? কালিপুজো ত এসে গেল।

ও বলল, আর বলবেন না, সব ঝুল। কি আর বলব, যেখানে তিনজন বাঙালি, সেখানেই পলিটিক্স, দলাদলি; কি হবে বলুন, কোনো ভাল কাজই কি করা যাবে?

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে অভিনয় কে ভাল করে?

শৈলেন হাসল। বলল, অভিনয় আমাদের মধ্যে কে বেশী ভাল করে তা বলা মুশকিল। সকলেই ভাল করি। প্লাটফর্মে দেহাতী মুর্গী পাকড়ে পয়সা আদায় করার সময় নজর করে আমার অভিনয় দেখবেন; দারুণ। কেবল উত্তমকুমারের মত চেহারাটাই নেই, নইলে কি আর অভিনয় খারাপ করি।

আমি ওর কথার ধরনে হেসে উঠলাম।

শৈলেন বলল, হাসি নয় দাদা, দারুণ সীরিয়াস ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। নইলে এই সাত-সকালে চুপি চুপি এতখানি হেঁটে আসি?

দেখবেন স্টেশনের কেউ যেন না জানে যে, আমি একা একা আপনার কাছে এসেছি।

বললাম, ব্যাপারটা কি? খুলেই বল না?

শৈলেন বলল, দাঁড়ান, বুকে বল পাচ্ছি না। আমার এই টিকিট-চেকারের বুক এখন বিনা-টিকিটে পাড়ি-দেওয়া মেল ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের মত কাঁপছে—একটু দম নিয়ে নিই। সময় লাগবে। খেয়েদেয়ে গায়ে জোর করে নিই। একটু সময় দিন আমাকে।

আমার জীবনের পয়েণ্টসম্যান এই গাড়িটাকে ভুল লাইনে ফেলে দিয়েছে; মুখোমুখী কলিশান অনিবার্য—এখন আপনি না বাঁচালে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আমি জবাব দিলাম না। বুঝলাম, শ্রীমান শৈলেনকে কোনো একটা গোলমেলে ব্যাপারে পড়ে আমার কাছে আসতে হয়েছে। সময় হলে নিজেই বলবে।

কুয়োর দিকে বুধাই আর তার বোন মুংগলি জল তুলে কি সব কাচাকাচি করছিল। ওদের হলুদ আর লাল শাড়ির রঙ সবুজ জংগলের পটভূমিতে সকালের রোদে ভারী ভাল লাগছিল। নানারকম ছোট ছোট মৌ-টুশকি পাখি চেরীগাছে, ফলসা গাছে, কারিপাতার গাছে নাচানাচি করছিল। কোথা থেকে একদল হলুদ ফিনফিনে প্রজাপতি এসে অনেকক্ষণ থেকে পেছনের জংগলের সামনের ঘাসভরা মাঠে আলতো ডানায় ভাসছিল।

হঠাৎ একটা প্রজাপতি এসে শৈলেনের গায়ে বসল। কিছুক্ষণ বসে থেকেই উড়ে গেল।

শৈলেনকে যেন পাগলা কুকুর কামড়েছে এমন করে লাফিয়ে উঠে শৈলেন বলল, শালা, মরেছি। সরি দাদা, শালা বলে ফেললাম; কিন্তু মরেছি। আর বাঁচা হলো না।

আমি আবার হেসে ফেললাম ওর রকম দেখে, বললাম, হয়েছেটা কি? গায়ে প্রজাপতি বসা ত ভাল লক্ষণ।

শৈলেন বলল, ভাল লক্ষণ আপনাদের, আমার মত একজন একশ পঁয়ত্রিশ টাকা টেক-হোম মানির লোকের জন্যে বিয়ে নয়। পরক্ষণেই ও বলল, অথচ দারুণ বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। মানে ঠিক বিয়ে করতে নয়, মানে কাউকে কাছে পেতে। মানে, মাঝে মাঝে ভাবি। এমন যদি কেউ থাকত কাছে-পিঠে, যার কাছে বড়কাকানার বড়সাহেবের কাছ থেকে বকুনি খেয়ে এসে সাহেবের শ্রাদ্ধ করা যায় মন খুলে, যার কাছে নিজের ইচ্ছা, নিজের কল্পনা সব বন্দ হয়ে বলা যায়, যাকে জড়িয়ে ধরে এই লাপরার শীতের রাতে সিল্কের ওয়ার-দেওয়া লেপের আরাম পাওয়া যায়। মানে, এমন কেউ যদি থাকত, যাকে সম্পূর্ণভাবে আমারই বলা যেত, যে সেজেগুজে থাকলেও আমার, কিছু না-পরে থাকলেও আমার, যে দিনে, রাতে, মাসে, বছরে, সারা জীবনে শুধু আমারই।

আমি হালকা গলায় বললাম, এ ত ভাল কথা, এমন কোনো লোক ত সহজেই পেতে পার—তোমার মত ইয়াং এলিজিবিল ব্যাচিলর।

তা পারি। শৈলেন বলল। তারপরেই বলল, সাহস হয় না। ভীষণ ভয় করে।

লালি ছটি ডিমের মধ্যে পেঁয়াজ, টোম্যাটো, কাঁচালংকা, মেটের টুকরো সব দিয়ে একটা অতিকায় ওমলেট নিয়ে এল।

শৈলেন দেখে একটুও ঘাবড়াল না, বলল, বাঃ লালি, তোকে আর তোর ফ্যামিলিকে সারাজীবনের মতো রেলের টিকিট কাটতে হবে না—সে জিম্মা আমার। আজ যা খাওয়ালি, সে বলার নয়। আজকে এরকম কিছু একটা খাওয়ার দরকার ছিল।

আমি চা বানাতে বানাতে বললাম, এবার কাজের কথা বলো দেখি।

শৈলেন গব্‌গব্‌ করে ওমলেট চিবোতে চিবোতে বলল, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার যা কাজ তা আপনার।

বলেই বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে বলল, এ চিঠির একটা জবাব লিখে দিন।

বললাম, এটা কি?

শৈলেন বলল, লাভ-লেটার। ব্যাপার বুঝুন, আমারও লাভ-লেটার আসে। নয়নতারা লিখেছে আমায় প্রেম নিবেদন করে।

বলেই বলল, আমি কি বাংলা লিখতে জানি? ডাবল্যু-টি প্যাসেঞ্জারের চালান লিখতে পারি আমি; তাও ইংরিজীতে। বাংলা যে একেবারে লিখি না তা নয়, মাকে সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখি, শতকোটী প্রণামান্তে নিবেদন এই যে, মা, আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ? তার সঙ্গে প্রতি চিঠিতে আরও দুটো লাইন থাকে।—

আমি বললাম, দুটো লাইন কেন?

শৈলেন বলল, এক লাইন ওয়েদার রিপোর্ট, অন্য লাইনে মার্কেট রিপোর্ট।

অবাক হয়ে বললাম, মানে?

হতাশ হয়ে শৈলেন বলল, মানে বুঝলেন না? প্রথম লাইনে লিখি এখানে এখন শীত (কি প্রকার শীত তাও লিখি, বেশী, না কম, না মাঝামাঝি) অথবা গরম অথবা বৃষ্টি। দ্বিতীয় লাইনে লিখি, এখন কদু সস্তা, কি আলু সস্তা, কি বেগুন সস্তা। বুঝলেন?

বুঝলাম।

বুঝলেনই যদি, তাহলে আমার এই লাভ-লেটারের একটা যুৎসই উত্তর লিখে দিন দাদা যাতে আমার সাঁটুলি এক চিঠিতে কাৎ হয়ে পড়ে।

শুধোলাম, সাঁটুলি মানে? সাঁটুলি কি?

সাঁটুলি জানেন না? সাঁটুলি মানে লাভার। এখানের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা বলে বার্ড। বার্ডি মানে পাখি; নরম গরম পাখি।

আমি হেসে উঠলাম।

শৈলেন আসা অবধি এত হাসাচ্ছে যে, সে বলার নয়।

ও বলল, কি দাদা? চিঠিটা খুলুন। এক্ষুনি জবাব দিতে হবে, যাতে আমি এগারোটার ডাকে পোস্ট করতে পারি।

অগত্যা চিঠিটা খুললামই।

প্রিয়তমেষু,

অই সুন্দর জাগা হইতে আসা অব্দি এবং অই মুখখানা দেখা অব্দি আমার চক্ষে ঘুম নাই। প্রতি অংগ কাঁইদতাছে তোমার প্রতি অংগ লাইগ্যা। ঘুম নাই, খাওন নাই; কিছুই নাই। তুমি কবে আইস্যা আমারে নিয়া যাবা। কবে তোমার কোর্টারে যাইয়া তোমারে ভাত রাঁইধা দিমু। আমার হকল্‌ডা তোমারে দিমু।

আমি তোমারে ভাল-বাসি। তুমি কি মোরে খারাপ বাসো?

ইতি তোমারই নয়নতারা

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।

ততক্ষণে শৈলেন ওমলেট খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দ করে চা খেতে আরম্ভ করেছে।

ও আমার মুখের অবস্থা দেখে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, বরিশাল।

জানেন ত? আইতে শাল, যাইতে শাল, তার নাম বরিশাল?

পরক্ষণেই বলল, নয়নতারা কিন্তু বাংলা ভালই লেখে, অন্ততঃ আমার চেয়ে ভাল লেখে, কিন্তু ও জানে আমরা তিন-পুরুষ জয়নগর-মজিলপুরের বাসিন্দা—শেষ পুরুষ বিহারের ভাগলপুরে। বাঙালকথা আমরা মোটে জানি না, বুঝি না; বুঝলেন দাদা। ও সেই জন্যেই এমন বাঙালভাষায়

চিঠি লিখেছে ইচ্ছে করে।

চিঠিটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু দাদা, আমার স্টেশনমাস্টারমশায়ের দিব্যি; মেয়ে ভাল।

ভাল মানে, আমার পক্ষে ভাল। শক্ত, সোমত্ত, গড়ন-পেটন ভালো, কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে জব্বর মুসুরীর ডাল রাঁধে, ধনেপাতা দিয়ে চালতে যা মাখে না, উঃ কি বলব।

তেল-কই, শর্ষে-ইলিশ, উঃ কি বলব, জুতো, জুতো।

আমি বললাম, জুতো কি শৈলেন?

ওমা! জুতো জানেন না? জুতো মানে, কি বলব? জুতো মানে হচ্ছে গিয়ে লাজোয়াব।

নয়নতারার সবচে যা ভাল জানেন, তা হচ্ছে মনটা। একেবারে টাঁড়ের মত খোলা।

ও এখানে এসেছিল বেড়াতে ওর কাকা-কাকিমার সঙ্গে এক মাসের জন্যে। বড় দুঃখী মেয়ে—পাকিস্তান হয়ে যাবার সময় ওর তিন মাস বয়স—সেই সময় থেকে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। ওর কাছে আমার এই পেঁপেগাছ লাগানো কোয়ার্টারই স্বর্গ—আর খুব হাসিখুশী মেয়েটা—খুব গান ভালবাসে—বুঝলেন দাদা। আমার আর ডানাকাটা পরী বিদ্যাধরী দিয়ে কি হবে? যে আমার সামান্য সামর্থ্যে খুশী থাকবে, আমাকে ভালবাসবে, আমার জন্যে ভাববে, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি আর হুহু-হাওয়ার মধ্যে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে থাকবে বুকের মধ্যে—সেই আমার কাছে অনেক দামী।

আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল। আমি কি, কতখানি, এ পৃথিবীতে আমার চাহিদা, আমার যোগ্যতা কতটুকু, তা আমি বুঝে নিয়েছি। আমার এইই ভাল। নয়নতারা রাঁধবে বাড়বে, আমি গলা ছেড়ে গান গাইব, দুজনে হি-হি করে হাসব, হাটের মধ্যে হট্টামি করব, খাটের উপর হুল্লোড় করব—এই আমার ভাল লাগে।

সকলে আমাদের দেখে বলবে, ঢঙ দ্যাখো। সকলে যেই বলবে, আমরা আরো ঢঙ করব। ঢঙ আমার দারুন লাগে। মেয়েরা যদি ঢঙি না হয় তাহলে কি আপনার ভাল লাগে দাদা?

আমি বললাম, আমার ভাল লাগার কথা এর মধ্যে আসছে কোথায়? তোমার ভাল লাগলেই ভাল।

তারপর বললাম, বিয়েটা করছ কবে?

শৈলেন বলল, আমার ত এক্ষুনি করতে ইচ্ছে করছে। এমন বরফ-পড়া রাতগুলো চলে যাচ্ছে। আমার একটা দিনও আর নষ্ট করতে ইচ্ছা হয় না। যখনি দেখি পাতা ঝরে যাচ্ছে, শীতের হাওয়ায়, চারিদিক রুক্ষ, খড়ি-ওঠা, তখনি আমার বার্ধক্যের কথা মনে পড়ে যায়। যে কদিন যৌবন থাকে, বাঁচার জেদ থাকে ততদিন, ততদিনের প্রত্যেকটি দিন আমার প্রতিমুহূর্তেও বাঁচতে ইচ্ছে হয়। সত্যিই দাদা।

তারপরই একটু থেমে, একটু লজ্জা পেয়ে শৈলেন বলল, আমি জানি, আমি একজন সামান্য লোক, সামান্য আমার রোজগার, সামান্য আমার যোগ্যতা, কিন্তু তবু দাদা আমি ত একজন সুস্থ শরীর, সুস্থ মনের মানুষ। এ বাবদে ত আমি কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, গরীব নয়। তবে? আমার যদি দারুণ শখ থাকে, ভীষণ উৎসাহ থাকে, মানে আপনারা উচ্ছ্বাস না কি বলেন তাই; তাহলে আমি তেমন হৈ হৈ করে বাঁচবই বা না কেন?

তারপর একটু হেসে শৈলেন বলল, আমি এই জীবনকে ভীষণ ভালবাসি। আমার মত এত বোধহয় খুব কম লোকই ভালবাসতে জানে। আমার মনে সবসময় ফুর্তি, আমি সবসময় হাসি, সবসময় গান গাই—তাই আমার এই ফুর্তি নয়নতারাকে পাশে নিয়ে আমি আরো বাড়াতে চাই। আমরা দুজনে দেখবেন একে অন্যকে কী দারুণ ভালবাসি, কি মজাই না করি। কি যে বলব আপনাকে, আমার ভাবতেই ভাল লাগছে। আমি আর একা থাকব না, আমার সুখ এবং দুঃখের, আমার মন এবং শরীরের ভাগীদার আর একজন শীগগিরি আসবে।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। ভাবছিলাম, প্রত্যেক লোককেই কখনো কখনো কথায় পায়—আমাকেও পায়—যখন যাকে পায় তখন তাকে বাধা দিতে নেই। এই ভণ্ডামি ও অভিনয়ের জীবনে সত্যি কথা স্বচ্ছন্দে সাবলীলতায় বলার সময় বড় একটা আসে না।

বাগানে এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল। কিছুক্ষণ কাঁচা পেয়ারা কামড়ে, ফেলে, নষ্ট করে আবার উড়ে গেল অন্য কোনো বাগানের দিকে।

একটু পরে শৈলেন নিজের থেকেই বলল, নয়ন যখন ওর বরিশালিয়া ভাষায় কথা বলে না, ওকে দারুণ মিষ্টি লাগে—আমি ওকে চিরদিন ওর নিজের ভাষায়ই কথা বলতে বলব, আর আমি

বলব আমার দোখ্‌নো ভাষা। যেখানে মনের মিল, শরীরের মিল, সেখানে ভাষা কি কোনো বাধা? কি দাদা?

তারপর আবারও শৈলেন কথা বলতে শুরু করল। ওর কথায় এখন কোনো যতি নেই। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন কিছুই নেই।

ও যে এক দারুণ আনন্দের ঘোরে বলে চলেছে। প্রলাপ বকছে।

শৈলেন বলল, লাপরা হেসালং কংকাতে এত লোক ছিল আমার জানা-শোনা, আমি এখানে চার বছর আছি, আমার জানা-শোনা কম নয়—তবু আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম কেন জানেন?

বললাম, কেন? আমি চিঠির উত্তর দিতে পারব বলে?

ও বলল, না, না। ওটা একটা ছুতো। ওকে বিয়ে করব এবং ও আমাকে বিয়ে করতে চায় একথা আমরা দুজনে যখন একে অন্যে চোখের ভাষাতেই জেনে গেছি তখন আর চিঠির দাম কি? দরকারই বা কি? তার জন্যে নয়।

আজকে আমার মন বলছিল, আপনাকে এত সব কথা বলে হাল্কা হব, যাই হোক আপনি একজন লেখক। মানুষের মনের কারবারী আপনি। কারো মনে যদি তেমন দুঃখ হয়, বা আনন্দ হয় তখন আপনার মত কেউ হাতের কাছে থাকলে তার কাছেই ত ছুটে আসা উচিত। তাই না?

শুনেছি, আপনি কোলকাতায় বড় বড় মামলা-টামলা করেন, আপনার নাকি হাঁকডাক আছে—কিন্তু আমি সেজন্যে আসিনি। আপনার চেয়ে বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার অনেক এখানে এসেছে গেছে, তাঁদের দেখেছি; ভুলে গেছি।

কিন্তু যে লেখে, সে আমার কথা, নয়নতারার কথা, আমাদের মত লক্ষ লক্ষ অজানা অচেনা লোকের কথা যারা লেখে, সেই সব অসংখ্য হতভাগা লোক যা বলতে পারে না কিন্তু বুঝতে পারে, তারা যা বুঝতে পারে কিন্তু বলতে পারে না, সে সব কথা যাঁরা অক্লেশে বলে ফেলেন তাঁদের কথাই আলাদা। তাঁরা সেই অসংখ্য লোকের সমস্ত আপনার লোক, সবচেয়ে কাছের লোক।

আজকের দিনটা আমার জীবনের এক দারুণ দিন দাদা। আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কি? আমি সুখী হবো না? আজ থেকে বহুদিন বহু যুগ আমি আর নয়নতারা খুশী থাকব না? দুজনে দুজনকে পেয়ে ভীষণ মজা করব না? বলুন? আপনি চুপ করে আছেন যে?

আমি কোন কথা বললাম না। একটু পরে বললাম, আর এক কাপ চা খাবে?

শৈলেন উত্তরে কিছু না বলে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল, বলল, বেলা হয়ে গেল। কটা বাজে?

হাতঘড়ি দেখে বললাম, দশটা বেজে গেছে।

তাহলে এবার পালাই। কি বলেন? চিঠিটা লিখেই পোস্ট করে দেব।

বললাম, এ ডাক ধরতে পারার সময় পাবে?

শৈলেন যেন কী এক দারুণ নেশা করেছিল। তার দুটি কালো চোখ সকালের রোদে ঝিকমিক করছিল—সমস্ত মুখ উৎসাহে আনন্দে ঝলমল করছিল।

ও বলল, সময় পাবো না?

কি বলেন দাদা? সময়কে এবার পকেটে পুরে রাখব, সময়ই আর পাবে না আমাকে, কোনোদিন পাবে না, দেখবেন।

বলেই বলল, চললাম। বিয়ের তারিখ ঠিক হলে নেমন্তন্ন করে যাব।

শেষ কথাকটি বলেই, শৈলেন জঙ্গলের পাকদণ্ডী দিয়ে বাড়ির পিছনের গেট খুলে ওঁরাও বস্তীর দিকে উধাও হয়ে গেল।

আমি চেয়ারে বসে বসে বেশ অনুমান করতে পারছিলাম শৈলেন মিলনোদ্যত কোনো শিঙ্গাল হরিণের মত দৌড়চ্ছে মাঠ পেরিয়ে—মহুয়াতলা দিয়ে—ঝাঁটি-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

হু-হু করে সকালের ঠাণ্ডা রোদ-লাগা হাওয়া লাগছে ওর মুখে-নাকে-বুকে—ও এক দারুণ জীবনীশক্তিতে নতুন করে সঞ্জীবিত হচ্ছে, পুরিত হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে যে-শক্তি আমাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখে, সকলকে মহৎ করে, উদার করে; যে শক্তির জন্যে শৈলেনের, নয়নতারার, আমাদের সকলের, প্রত্যেকের বেঁচে থাকাই সার্থক—যার আরেক নাম, গোপন নাম: প্রেম।

॥ বারো ॥

সেদিন মান্দারে গেছিলাম। ডাক্তার-সাহেব পিঠে চড় মেরে বলেছিলেন, 'ওয়েল মিস্টার বাস্, ইউ নীডন্‌ট কাম টু মি এনি মোর। ইউ আর আ ফ্রি ম্যান নাউ। ইউ মে লিড ইউর নর্মাল লাইফ। উইশ য়্যু অল দা বেস্ট।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যখন দাঁড়ালাম তখন বেলা দশটা বেজেছে। শীতের রোদ পীচের রাস্তায় পিছলে যাচ্ছে। সামনেই একটা গীর্জা। দোকান বাজার।

ঘন ঘন বাস আসছে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে মালবোঝাই ট্রাক পিচের উপরে প্যাচ প্যাচ আওয়াজ তুলে। শুকনো পাতা উড়ছে হাওয়ায়, ঘূর্ণী উঠছে চায়ের দোকানের সামনে। শালপাতার ফেলে দেওয়া দোনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে।

হাওয়ায় আমার চুল এলোমেলো হচ্ছিল। পায়জামা পাঞ্জাবি পরে গায়ে শাল-জড়ানো আমি, এই সুকুমার বোস, স্থাণুর মত দাঁড়িয়েছিলাম মিশন-হস্পিটালের গেটের বাইরে।

ভাবতেও দারুণ লাগছিল যে আমি আজ স্বাধীন। মনে হচ্ছিল যে আমি যেন কোনো জেলখানার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

পিছনে ফেলে-আসা টি-বি হস্পিটালের দুঃখময় স্মৃতি, এবং পরবর্তী সময়ের পদে পদের বাধায়-বাঁধা প্রতিদিনের অসুস্থতার বাসি স্মৃতি-ভরা জীবন, সবই যেন অনেক দূরে ফেলে এসেছি।

আমি যেন হঠাৎ-ছুটি-হওয়া কোনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী। ছাড়া পেয়েই গরাদের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমার এই হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতা নিয়ে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না। স্বাধীনতা ও মুক্তির দায় বড় বিষম বলে মনে হল। এ নিয়ে আমি এক্ষুনি কি করব, বা কি আমার করা উচিত, তাও আমি ভেবে পেলাম না।

আস্তে আস্তে অন্যমনস্কভাবে সামনের চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়ালাম।

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পাকৌড়া ও চা খেলাম। তারপরে বেশ করে খুশবুভরা জর্দা দিয়ে দুটো মঘাই-পান খেলাম। তারপর অনেকদিন পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম এক্ষুনি আমার কি করা উচিত।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যেতে হলে এক্ষুনি একটা ট্যাকসি ধরে চলে যেতে পারি, কিন্তু আমার পা দুটো কিছুতেই সেদিকে যেতে চাইল না। আমার পার্সের ভিতরে একটা ঠিকানা লেখা ছোট্ট কাগজ ছিল, সেই কাগজটা বের করে ছুটির রাঁচীর ঠিকানাটা একবার দেখলাম। তারপর রতনলালের ডালটনগঞ্জীয়া বাস এসে দাঁড়াতেই কি এক অদৃশ্য ও অনামা টানে সেই বাসে উঠে পড়লাম।

রাতুর রাজার লাল-রঙা প্রাসাদের ধারঘেঁষা আমবাগানের পাশ দিয়ে বাস চলছিল।

ডানদিকে সেই বড় জলাটা। একদল হাঁস দূরে ওড়াউড়ি করছে। সকালের রোদ ওদের সাদা ডানায় পিছলে পড়ে চমকে উঠছে।

বাস চলেছে। একটানা গোঁ গোঁ শব্দ করে। সেটা চলেছে রাঁচীর দিকে, ছুটির দিকে।

রাঁচীর রাতু বাস স্ট্যান্ডে পেঁছে একটা সাইকেল রিক্সা নিলাম।

রিক্সাওয়ালা অনেকগুলো মোড় নিয়ে কেঁচোর-কোঁচোর করতে করতে এসে অনেকক্ষণ পর যেখানে থামল, সে জায়গাটা বেশ নির্জন।

একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা পুরোনো দিনের বিরাট বাড়ি। একতলা এবং দোতলার কিছুটা জুড়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনো অফিস আছে। রিক্সাওয়ালা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে, আমাকে বাড়িটার পিছনের দিকে নিয়ে গেল।

ভাড়া মিটিয়ে চওড়া ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে, দোতলার বারান্দার প্রায় শেষ প্রান্তে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দারোয়ান বলল, এহি হ্যায় দিদিমণিকা ঘর, বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

বারান্দায় একটা শাড়ি মেলা ছিল। শাড়িটা আমার চেনা।

ঘরের দরজার কড়া নাড়তেই একটি স্থানীয় বৃদ্ধা এসে দরজা খুলল। হিন্দীতে বলল, দিদিমণি বাড়ি নেই। দুপুরে আসবে।

আমি বললাম, আমি দিদিমণির আত্মীয়। আমি দিদিমণির জন্যে অপেক্ষা করব। আমাকে

বসতে দাও।

বুড়ির চোখে মুখে কোনো নরম ভাব দেখা গেল না। বেশ শক্ত গলায় বলল, হুকুম নেই হ্যায়। বলল, আপনি যেই হোন না কেন, নীচে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

ভাবটা এমন যে, দিদিমণি এসে সরেজমিনে তদন্ত করে আপনাকে বেকসুর বলে সার্টিফিকেট দিলে তখন দিদিমণি নিজেই উপরে নিয়ে আসবেন আপনাকে। তার আগে বুড়ির পক্ষে আর কিছু করণীয় নেই।

আমি বললাম, একটু জল খেতে পারি?

ও বলল, একটু কেন, একঘড়া জল খাওয়াব, কিন্তু এখন নয়, দিদিমণি এলে। তারপরেই বলল, এখন মানে মানে নীচে যান, নইলে লছমন সিংকে ডাকব।

আমার চেহারা কখনও সুন্দর যাকে বলে তা ছিল না। তবে নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা কুৎসিত লোকেরও থাকে। আমারও ছিল। আমার ধারণা ছিল, আমার চেহারাটা আর যাই হোক অভদ্র বা চোর-ডাকাতের মত নয়। কিন্তু এই অচেনা বুড়ি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করল তাতে মনে মনে বিলক্ষণ দুঃখিত হলাম।

বুড়ি না হয়ে ছুঁড়ি হলেও না হয় তার অপমান হজম করা যেত—কিন্তু এ অপমান বড় লাগল।

তবু ভেবে দেখলাম সীন ক্রিয়েট করে জোর করে ঘরে ঢোকার চেয়ে নীচে গিয়ে লছমন সিং-এর ছারপোকাওয়ালা খাটিয়াতে অবস্থান করা অপেক্ষাকৃত সম্মানের।

সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে আসছি, মাঝ-সিঁড়িতে এসে জানালার কাঁচে হঠাৎ আমার মুখটা দেখতে পেলাম। আমি নিজেই চমকে উঠলাম দেখে। রুক্ষ, উস্কখুস্ক চুল, বড় বড় দাড়ি (সেই কাল ভোরে দাড়ি কামিয়েছিলাম) পান-খাওয়া লাল ফাটা-ফাটা ঠোঁট এবং ঘোলাটে চোখ।

আসলে আমি ত কেউই হই না ছুটির। ওর মনের উদারতায়, সংস্কারহীনতায়, এই সমাজের বিরুদ্ধে ওর বিদ্রূপময় বিদ্রোহে ভর করে ও আমাকে যে আত্মীয়তা দিয়েছে তার ত এদের চোখে কোনো স্বীকৃতি নেই।

এ সম্পর্ক ত শুধু ওর এবং আমার। এ সম্পর্কের যতটুকু দাম, যতটুকু নৈকট্য সে ত শুধু আমার এবং ছুটির কাছেই। বাইরের কেউই ত এ সম্পর্ক বুঝতে পারবে না। আমরা দুজনেই শুধু এ সম্পর্কে স্বীকার করেছি, শ্রদ্ধা করেছি, সমস্ত সামাজিক ঝড়, ঝাপটা, ন্যাপাম-বোমা থেকে আড়াল করে রেখেছি। এ সম্পর্কের ত নাম নেই, একে ত ছাঁচে ফেলে কোনো বিশেষ আভিধানিক নামে ডাকা যায় না। এ যে এক দারুণ সম্পর্ক।

শুধু ছুটি জানে, আর আমি জানি। ছুটি আমার কে হয়।

বাড়ির ঝির এই সাধারণ স্থূল প্রশ্নের উত্তরে ত আমি কিছু বলতে পারব না। বললে বলতে পারতাম এক কথায়, ও আমার কে হয় না?

বৃদ্ধ দারোয়ান, যে আমাকে উপরে পৌঁছে দিয়ে এল, সে শুধোল, কি হল?

আমি বললাম, দিদিমণি নেই।

ও চটে উঠে বলল, নেই ত কি? ঐ বদমায়েশ বুড়িটা আপনাকে বসতে পর্যন্ত বলল না!

আমি অবাক হয়ে দারোয়ানের মুখের দিকে তাকালাম।

কিছু বলার আগেই দারোয়ান একটা গালাগালি দিয়ে বলল, ও ওরকমই—সাধে কি আর ওকে আমি দেখতে পারি না। বলেই বলল, আপনি ঐখানেই বসুন। ঐ গাছতলায় চৌপাই পাতা আছে, ওতে গিয়ে বসুন। দিদিমণি দেড়টা-দুটোর সময় এসে যাবেন।

আমি বললাম, একটু জল খাওয়াতে পারবে দারোয়ানজী?

সে বলল, নিশ্চয়ই খাওয়াব। পিয়াসীকে জল খাওয়ানো, এ ত পুণ্যের কাজ। বলেই ভাব ঘর থেকে হাতে করে একটু আঁখি গুড় আর ঝকঝকে লোটায় করে এক লোটা জল নিয়ে এল। আদর করে বলল, পীজীয়ে।

আশ মিটিয়ে জল খেলাম।

দারোয়ানের ইচ্ছা ছিল আমার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে। বেচারার একা বসে বসে আর খৈনী টিপে টিপে বুঝি সময় কাটে না।

কিন্তু আমার তখন গল্প করার ইচ্ছা ছিলো না। শুধু ওর সঙ্গে কেন? কারো সঙ্গেই না। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি গিয়ে চৌপাইতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম হাতের উপর মাথা দিয়ে।

যে-গাছের নীচে চৌপাইটা পাতা ছিল সেটা একটা খুব প্রাচীন নিমগাছ। রোদে ফিনফিনে পাতাগুলো ঝিলমিল করছে। একটু একটু হাওয়া আছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো শুকনো পাতা হাওয়াতে ঘুরে ঘুরে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে আসছে।

অনেক পাখি এসে বসেছে গাছটাতে, অনেকে বাসা করে আছে। এরকম গাছতলা বড় শান্তির জায়গা।

ঐ গাছটার নীচে এই রৌদ্রালোকিত সচকিত কাকলিমুখর সকালে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমি যেন ছুটিরই কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। যত ঝড়, যত ঝাপটা, যত কিছু অন্যায় অত্যাচার, যা কিছু ব্যক্ত বা অব্যক্ত ব্যথা সব পেরিয়ে এসে আমি এই দারুণ স্নিগ্ধ শান্তির ঘরে পেঁৗছেছি।

ভগবান সাক্ষী করে বলতে পারি ওর কাছে কখনও আমি কোনো কিছু প্রত্যাশা করে আসিনি। ভিখিরীর মত কোনো কিছু চাইনি ওর কাছে। ও-ও আমার কাছে কিছুমাত্র চায়নি। কিন্তু সব কিছু দিতে চেয়েছে; যা ওর আছে, যা ও দিতে পারে। হয়ত আমরা দুজনে কেউই কারো কাছে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিনি বলেই সম্পর্কটা এমন সহজ হয়েছে। ছুটিকে দেখতে পাই আর না পাই, সবসময় ছুটি আমার সমস্ত মন জুড়ে থাকে। যখন ওকে এক বছর দেখিনি তখনও ও আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল।

প্রথম প্রথম মনে হত, আমি বোধহয় রমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। ছুটিও বলত, আমার মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে, মনে হয় আমার জন্যেই আপনার বিবাহিত জীবন এমন অশান্তির হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি জানি, হয়ত ছুটিও জানে, আমরা দুজনেই সৎ ও হৃদয়বান বোকা বলেই এ কথা আমাদের মনে হয়েছে।

রমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাক এ আমি কখনও চাইনি। কিন্তু এ বাবদে আমার কিছু করার আছে বলে আমার আর মনে হয় না। মনে হয়, যা কিছু করার ছিল, শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু রমা আজ বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার আত্মীয়স্বজন, আমার চেনা-পরিচিত সকলের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে এবং করে আসছে, তাতে মনে মনে তার থেকে সরে না এসে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

কতদিন, কতদিন যে পিস্তলের নল মাথার কাছে ঠেকিয়ে নিজেকে শেষ করে দিতে গেছি, কত যে দিন, সে আমিই জানি। পারিনি, কারণ আমি নিজেকে ভালোবাসি বলে নয়, পারিনি রুণের কথা ভেবে। আমার ছেলে, নিরপরাধ, সরল, অপাপবিদ্ধ ছেলে ত কোনো অপরাধ করেনি।

আমি না থাকলে ওকে ওর স্বাভাবিক ও সুস্থ অধিকার থেকে ঘৃণিতভাবে বঞ্চিত করা হবে। ওর প্রতি যা আমার করণীয় (শুধু টাকা পয়সায় নয়) সবই আমার করা উচিত। এই কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যত যন্ত্রণাই পেয়ে থাকি, যত কষ্টই পেয়ে থাকি, ভেবে দেখেছি, যতদিন না রুণের প্রতি আমার সব কর্তব্য শেষ হচ্ছে ততদিন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার অনুচিত।

আমার জীবনটা যে আমারই, শুধু আমারই একার, রমার নয়, রুণের নয়, এমনকি ছুটিরও নয়—একমাত্র আমার—এই ভাবনাটা ছুটিই আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে।

ছুটি আমাকে শিখিয়েছে জীবনের মানে কি? ছুটিই বলেছে, বার বার, কেউই অন্য কারো জন্যে, অন্য কারো কারণে বাঁচে না; অন্তত কারোরই সে রকমভাবে বাঁচা উচিত নয়। এও বলেছে সে যে, কেউই অন্য কারো দয়ায় নির্ভর করে বাঁচতে পারে না। বেঁচে থাকার এবং সুস্থ স্বাভাবিক ও সুখী মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের সকলের জন্মগত নয়, সে অধিকার আমাদের প্রত্যেককে তৈরী করে নিয়ে বাঁচতে হবে।

ও সবসময় বলে যে, জীবন একটা চলমান চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা, এতে স্থাবর বা স্থবিরের কোনো স্থান নেই।

বলে, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সত্যি। এই মুহূর্তটিই—যে মুহূর্তে আমি বা ছুটি বা অন্য কেউই বেঁচে আছি। আর সব মিথ্যা। বর্তমানের জন্যে অতীত অথবা ভবিষ্যৎ দুইকেই হাসিমুখে বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে।

ভাবলে অবাক লাগে যে, ছুটি এই অল্পবয়সে এত সব অরিজিনাল ভাবনা পেল কোত্থেকে? কি করে ও ওর সমসাময়িক অনেকের থেকে এমন দারুণভাবে আলাদা হয়ে অন্য একটা আনন্দময় জগত আবিষ্কার করে ফেলল? আর ফেললই যদি, ত আমার কোন্ সৌভাগ্যে ও আমার কাছে এল, আমি যখন কাঁটার মধ্যে, পাঁকের মধ্যে বসে, সামাজিক গালার শীলমোহরটা চিরদিনের মত গলায় ঝুলিয়ে সামাজিক সম্পর্কের ভীষণ ভারী পাথরটার চাপে অসহায়ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছি, ঠিক সেই সময়ে ও কি করে এসে আমাকে মুক্ত করল!

ও কিসের টানে, আমার মধ্যে কি আবিষ্কার করে, কেন আমাকে হাতছানি দিয়ে আমার মূঢ়তা এবং স্বেচ্ছারোপিত অবশ মনের ভার থেকে স্বাধীন করল? ও কিসের জন্যে আমাকে পুলকভরে এই নতুন রোমাঞ্চময় সবুজ জীবনের উপত্যকায় ডাক দিয়ে বলল, 'আপনাকে বাঁচতে হবে।' বলল, 'আর কারুর জন্যে নয়, নিতান্ত স্বার্থপরের মতই, আপনাকে আপনার নিজের জন্যেই বাঁচতে হবে।'

একদিন ছুটি একটা দারুণ কথা বলেছিল। ওকে নিয়ে এক রবিবার একটা বড় হোটেলে খেতে গেছিলাম। ডাইনিং রুমের শাদা ফিন্‌ফিনে পর্দা ভেদ করে বাইরের আলো ঘরময় ছড়িয়ে গেছিল। বাইরে সবুজ লনের পাশে নীল সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছিল।

ছুটি আমার সামনে মুখ নীচু করে বসেছিল।

আমি বলেছিলাম, ওয়েল, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ চোজেন আ রং পার্সন।

ছুটি মুখ তুলে বলেছিল, হ্যাভ আই? তারপর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হেসে বলেছিল, আই ডোণ্ট থিঙ্ক সো।

আমি শুধিয়েছিলাম, তুমি কি বলতে চাও?

ছুটি কাঁটাচামচ নাড়তে নাড়তে বলেছিল, বলতে চাই না কোনোকিছুই, কিন্তু আমি আপনার ব্যাপারে কোনো ভুল করিনি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, ভালমন্দ বিচার করে, নিন্দা অপবাদ সবকিছুর কথা ভেবেই আপনাকে ভালোবেসেছি। যে-সব মেয়ে সখের ভালোবাসা বাসে, আমি তাদের দলে নই। আমার ভালোবাসা উপায়হীন, কম্পালসিভ্।

তারপর হঠাৎ মুখ নামিয়ে বলেছিল, একজন নাম-করা ব্যারিস্টারের সঙ্গে তর্কে জিতব কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় আপনি আমাদের দুজনকেই ঠকাচ্ছেন। আপনি অতীতে বাস করছেন। একদিন যে ভালোবেসেছিলেন একদিন যে বিয়ে করেছিলেন, সেই অতীতের স্মৃতিটা আমাদের বর্তমানের সমস্ত আনন্দটুকুকে, জীবনের সমস্ত স্বাদটুকুকে ঘোলা করে দিচ্ছে। এটা কি ঠিক?

একটু পরে ছুটি আবার বলেছিল, একটা কথা বলব সুকুদা?

মুখ তুলে বলেছিলাম, কি? বল?

কথাটা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ লোকই অতীতের স্মৃতি অথবা ভবিষ্যতের সুখ-কল্পনা নিয়ে বাঁচি, মানে বাঁচতে চাই। আর এই বাসি ঠাণ্ডা অতীত ও জরায়ুর মধ্যের ঈষোদুষ্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে পড়ে, তাদের প্রত্যেকের বর্তমানটাই মারা যায়। কথাটা হালকা শোনাচ্ছে বুঝি? কিন্তু কথাটা হালকা নয়।

বর্তমান মানে, জাস্ট একটা মুহূর্ত নয়। শুধু এই মুহূর্তই নয়। বর্তমানের বিস্তৃতি অনেক। বর্তমান মানে সমস্ত জীবন, আপনার আমার, সকলের প্রতি-মুহূর্তের অস্তিত্ব। আমরা যদি প্রতিটি মুহূর্তই নিজেদের ফাঁকি দিই, একে অন্যকে ফাঁকিতে ফেলি, তাহলে সে জীবনের কি বাকি থাকে বলুন?

জানি না, কতক্ষণ এমন এলোমেলো ভাবনা ভেবে চলেছিলাম, হঠাৎ হুঁশ হল। লছমন সিং-এর গলার স্বরে। হয়ত রোদে শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুঁজে এসেছিল।

যখন চোখ খুললাম, দেখি ছুটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা হাল্পা ছাই-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে, গায়ে সাদা কার্ডিগান। ডান হাতের হাতাটা একটু গুটিয়ে তোলা—কালো ডায়ালের একটা ঘড়ি। বাঁ হাতে একটি কাঁকন।

ছুটি ফুলে ফুলে হাসছিল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই হাসি থামিয়ে বলল, কি হেনস্থা—সরি, সরি; ভেরী সরি।

আমি বললাম, এর চেয়ে তরোয়াল হাতে একজন খোজা প্রহরী রাখলেই ত পার। তোমার

উদ্দেশ্য যদি এই-ই হয় যে, কোনো পুরুষ তোমার অন্দরমহলে পা দিতে পারবে না, তবে সেটাই আরো ভাল হত।

ছুটি আমাকে হাত ধরে টেনে তুলল।

বলল, চলুন চলুন, উপরে চলুন।

জানেন, আজ সকালে কাজে যাওয়ার সময় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিরুনিটা হঠাৎ হাত-ফস্‌কে পড়ে গেল মাটিতে। তখনই জানি, আপনি আসছেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম, আমিই আসব কি করে জানলে? তোমার কাছে অন্য কেউ ত আসতে পারত।

উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে ছুটি চাইল আমার দিকে, বলল, আমার জীবনে এখন শুধু একজনই আছে, সে আমার পরম পুরুষ। ভবিষ্যতের কথা জানি না। আপনি ত জানেনই, বর্তমান ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

সেই বুধ্ধা দরজা খুলে, ছুটি আমাকে ওরকম সসম্মানে নিয়ে আসছে দেখে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলো না। বুঝলাম তার কাজ কেল্লা রক্ষা করা—সে করেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে বলল, পানি পীজিয়েগা?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, নেহি।

ছুটি বলল, হাসছেন কেন?

বললাম, তোমার প্রহরীকে জিগগেস কর।

ওর কাছ থেকে জল চাওয়া এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথা শুনে ছুটি আরেক চোট হাসলো।

বলল, জানেন ত, এ বাড়ির প্রায় সবটাই অফিস—কতরকম বাইরের লোক আসে যায়—তাই ও এরকম করে—ভালই করে। আমি একা থাকি আর আমার পাশে একটি বিহারী পরিবার থাকে। ভদ্রলোকের একটা ছোটোখাটো ব্যবসা আছে ডুরাণ্ডাতে।

বাইরের ঘরটাতে বই ঠাসা। দুটি চেয়াব, একটা ছোট টেবল, টেবল ক্লথ পাতা হালকা সবুজ রঙের। দেওয়ালে ছুটির মায়ের এবং জীবনানন্দ দাশের ফটো।

বললাম, এ ফটো তুমি কোথায় পেলে?

ও চোখ নাচিয়ে বলল, পেয়েছি।

জীবনানন্দ দাশের ভক্ত অনেকেই দেখেছি, প্রায় সকলেই ওঁর ভক্ত, কিন্তু তোমার কাছেই ছবি দেখলাম।

ছুটি বলল, কেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া অন্য কারো ছবি কি টাঙানো যায় না?

রবীন্দ্রনাথের উপর এত রাগ কেন?

রাগ ত নয়। শ্রদ্ধা করি। আমাব ঠাকুমাকে যেমন করতাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা ভালোবাসার নয়। দুঃখের কথা এই যে, বাঙ্গালীদের কালচারটা রবীন্দ্রনাথে এসেই থেমে গেছে। তারপর যা তারা করেছে, বলেছে, লিখেছে, সমস্তটুকু সম্বন্ধেই একটা কিছুই-নয় কিছুই-নয় ভাব।

আমি বলছি না যে এখন বাংলায় দারুণ কিছু লেখা হচ্ছে, কিন্তু অ্যাট লিস্ট্‌ যা লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে আজকের জীবনের যোগ আছে।

আমি আজকের কথা জানি। আজকের ভালোবাসাকে দাম দিই। আপনি হয়ত এ কথা বললে দুঃখ পাবেন, কিন্তু দেখি রবীন্দ্রনাথের ফটো প্রতি বাড়িতে সানমাইকা-বসানো খাওয়ার টেব্‌লের মত আজকাল একটা ফ্যাশানেবল্‌ আসবাব হয়ে গেছে।

আপনি কি মনে করেন যাঁরাই গুরুদেবের ছবি টাঙিয়ে রাখেন, যাঁরাই দরজায় শান্তিনিকেতনী পর্দা ঝোলান তাঁরাই সংস্কৃত? তাঁরাই একমাত্র লোক যাঁরা কালচার গুলে খেয়েছেন?

তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে পারব না।

ছুটি হাসল, বলল, চেষ্টাও করবেন না। তারপরেই বলল, চা খাবেন?

আমি বললাম, না। এত বেলায় চা খাব না।

ছুটি তার প্রহরীকে ছুটি দিয়ে দিল। বলল, বিকেলে এসো।

বুধ্ধা চলে গেলে ছুটি বলল, আমি এখন রক্ষীহীনা। অরক্ষিতা। আমি এখন আপনার। এখন আপনাকে বাধা দেওয়ার কেউই নেই।

আমি হাসলাম। বললাম, চান করোনি?

না। আমি ত জানি না আপনি আসবেন? হাত থেকে চিরুনি পড়ল বলেই ত আর আমি গণক নই যে ঐ সাতসকালে ঠাণ্ডায় চান করে ফেলবে। তা এক্ষুনি চান করে নেব- পাঁচ মিনিট লাগবে।...

তারপর বলল, আপনি চান করবেন না?

আমার এত বেলায় ঠাণ্ডা জলে চান করা ঠিক হবে না।

ঠাণ্ডা জল কেন, এক্ষুনি গরম জল করে দিচ্ছি।

না! কিছু করতে হবে না। তুমি আমার সামনে একটু চুপ করে বসো তো।

এই বসলাম।

বলে ছুটি এসে আমার সামনের চেয়ারে বসলো।

ওর কপালে ছোট ছোট চুল লেপ্টে ছিল—দু'কানে দুটো কাল পাথরের দুল পরেছিল। ভারী সুন্দর দুল দুটি। চোখে হালকা করে কাজল লাগিয়েছিল। বড় করে কালো মাদ্রাজী সিঁদুরের টিপ পরেছিল।

আমি অপলকে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

কী যে ভাল লাগে, কী যে ভাল লাগে কি বলব। ওর কাছে এলে, ওর সঙ্গে দেখা হলে, ওর মুখোমুখী বসলে ভাল লাগায় যেন আমি মরে যাই।

ছুটিও অনেকক্ষণ আমার মুখে তাকিয়ে থাকল।

বলল, ভাবতেই পারছি না যে আপনি সত্যি সত্যি এসেছেন, আমার ঘরে বসে আছেন। কিন্তু একটু জানিয়ে আসবেন ত? কিছুই রান্না করিনি আজ, কি খাওয়াই বলুন ত আপনাকে?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ছুটি বলল, চুপ করেন আছেন যে?

ভাবছি, জীবনানন্দ দাশের পরে কার ছবি টানাবে দেওয়ালে তুমি।

বাবাঃ আপনি এখনও ভাবছেন এ নিয়ে? রবীন্দ্রনাথের ছবি না টানিয়ে কি এমনই অন্যায় করেছি?

আমি হাসলাম, বললাম, না, তা নয়, তবে ভাবছি।

ছুটি বলল, এক্ষুনি যদি জানতে চান ত বলতে পারি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি, তার পরে তুষার রায়ের ছবি। আমি সমালোচক নই, পণ্ডিত নই, আমার পছন্দ অপছন্দ নেহাৎ একজন সিনসীয়র পাঠিকা হিসাবে। অতি সাধারণ পাঠিকা হিসাবে।

আপনি হয়ত বলতে পারেন, কাব্য-বিচারে এঁদের চেয়ে বড় কবি অনেকে আছেন, কিন্তু আমি ওঁদের লেখা ভালোবাসি কেন জানেন? ভালোবাসি এই জন্যে যে, ওঁরা ভণ্ড নন। দে আর অলওয়েজ ট্রু টু দেয়ার ফীলিংস।

আমাদের পিতা-পিতামহদের জেনারেশানের পিছল ব্যাঙের গায়ের মত ঠাণ্ডা ভণ্ডামির পর এ'রা একটা উষ্ণ জৈবিক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা। ওঁদের কাউকেই আমি চিনি না, ভবিষ্যতে ওঁরা আমার একসপেকটেশান ফুলফিল করবেন কি না তাও জানি না, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা করেছেন। ওঁদের লেখা পড়লে মনে হয় আমাদের জেনারেশানেরই কেউ লিখছেন। যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন, তাই নিখাদ অনুভূতিতে ব্যক্ত করেছেন। আমার নিজের মতে, দিস ইজ আ গ্রেট থিং॥

তারপর একটু থেমে বলল, আপনার হিংসে হচ্ছে?

আমি হেসে বললাম, হিংসে হবে কেন? কোথায় অখ্যাত আমি, আর কোথায় ওঁরা।

তবে তোমার কথা শুনে আশ্চর্য লাগছে আমার, কারণ আমারও ওঁদের দুজনের লেখা খুব ভাল লাগে এবং তুমি যে কারণ বলছ, সে কারণেই।

ছুটি বলল, আমি জানি না, তবে আমার মনে হয় লেখা-টেখা সম্বন্ধে অস্কার ওয়াইল্ড 'পিকচার অফ ডরিয়ন গ্রে'র ভূমিকায় যা বলেছিলেন, তা আজও সত্য। আপনি বলবেন হয়ত, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী: কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করলেন, তাই আমার অল্প বিদ্যায় যা বুঝি, যা ভালো লাগে, তা-ই বললাম। আমার মতামত ত ছাপা হয়ে কোথাও আর বেরুচ্ছে না।

তারপর ছুটি বলল, চলুন ভিতরের ঘরে যাই। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি চট করে চান করে নিচ্ছি।

ভিতরের ঘরটা ছুটির শোবার ঘর। একটা ছোট্ট সোফা সেট। পরিষ্কার বেডকভার পাতা আছে টান টান করে। এ ঘরেও অনেক বই। এক কোনায় একটা আলনা।

ছুটি বলল, যান। তোয়ালে আছে, সাবান আছে, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। বেচারী। আমার জন্যে কত কষ্ট—দারোয়ানের চৌপাইতে ছারপোকা ছিলো না? ছিল। না?

আমি হাসলাম, বললাম, থাকলেও কামড়ায়নি।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি ছুটি বাইরের শাড়ি ছেড়ে ফেলে একটা হলুদ আর লাল শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি পরে ফেলেছে। জেঠিমা-পিসীমারা যেমন করে শাড়ি পরতেন, তেমন করে। কি মিষ্টি যে দেখাচ্ছে ছুটিকে, কি বলব।

আমি অমন করে তাকিয়ে আছি দেখে ছুটি বলল, কি হল?

ও বলল, চান করব বলে শাড়ি ছাড়লাম।

আমি বললাম, এদিকে এসো ত।

ছুটির দু' চোখ ভাললাগায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখে বলল, না। আসব না।

ওর গলায় খুশী ঝরে পড়ল।

আমি এগিয়ে গিয়ে ছুটিকে বুকের মধ্যে নিলাম, ছুটির নরম ভিজে মিষ্টি ঠোঁটের সমস্ত স্বাদু স্বাদ ও উষ্ণতা আমার ঠোঁট দিয়ে শুষে নিলাম।

ভালোলাগায় ছুটি আমার বুকের মধ্যে শিউরে উঠতে লাগল।

আমি বললাম, দেখি; আমার দারুণ পায়রা দুটি দেখি।

ছুটি বলল, অসভ্য।

মুখে অসভ্য বলেই ওর কাজলমাখা চোখে এক অনামা অসভ্য আশ্লেষের নিমন্ত্রণ জানাল।

ওর জামার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওর রেশমী কোমল স্নিগ্ধ শান্তি-ভরা সুডৌল বুক আমার হাতের সমস্ত পাতা দিয়ে ধরলাম।

আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল ভাললাগায়।

ছুটি মুখ নামিয়ে ফেলল লজ্জায়।

আমি ছুটির কবুতরের লালচে ঠোঁটে আমার কালো ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

ছুটি থর থর করে কাঁপতে লাগল, ভালোলাগায়, ভীষণ এক ভালোলাগায়। এই শীতের নিস্তব্ধ ছায়া-পড়া মধ্যাহ্নে ছুটির ও আমার সমস্ত একাকীত্ব, সমস্ত শৈত্য শুষে নিয়ে আগুনের ফুলকির উষ্ণতার ফোয়ারার মত কী এক দারুণ অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে উৎসারিত হল।

ছুটি অস্ফুটে, বোঁজা-চোখে বলতে লাগল, অসভ্য! অসভ্য! অসভ্য!

তারপর ছুটি হঠাৎ বলল, উঁঃ, আর না। এখন আর না।

আমি দেখলাম, উত্তেজনায় ছুটির হাঁটু কাঁপছে থর থর করে।

ছুটিকে নিয়ে এসে আমি ওর খাটে বসিয়ে দিয়ে ওর চোখের পাতায় চুমু খেলাম। ওকে বুকে নিয়ে বসে রইলাম।

তারপর বললাম, যাও চান করে এসো তাড়াতাড়ি—আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে।

ছুটি উঠল না।

আরও অনেকক্ষণ আমার বুকে মাথা এলিয়ে ও বসে রইল!

ছুটি যখন চান করছিল, আমি ছুটির ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। বই দেখছিলাম, নাড়ছিলাম-চাড়ছিলাম।

ছুটির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের উপর একটা বই ছিল, কবিতার বই। কবিতা ঠিক নয়; ছড়ার বই। তুষার রায়ের লেখা—নাম, গাঁটছড়া।

বইটা হাতে তুলতেই, পেজ-মার্ক হিসেবে একটা ছোট চিঠি চোখে পড়ল।

যে লিখেছে, তার হাতের লেখাটা অশিক্ষিতের মত, অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হিনু, রাঁচী

ছুটি,

বিজুদা তোমাকে এই ইনভিটেশন পাঠাতে বলল।

কামিং রবিবারে আমরা সকলে গৌতমধারায় পিকনিকে যাচ্ছি। পিংকু ও মিলিও যাচ্ছে।

আমাদের সকলেরই সিনসিয়ার ইচ্ছা যে তুমিও চল। আমাদের কোম্পানী যদি বোরিং না লাগে,

তাহলে অবশ্যই এসো।

শনিবার বিকেলে তোমার ওখানে যাব। তখন ডিটেলস-এ কথা হবে।

তোমাকে সেদিন বিকেলে দেখলাম, রিকসা করে আমাদের অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলে। একটা পিংক শাড়ি পরেছিলে। তোমাকে খুব ড্যাশিং দেখাচ্ছিল। তুমি জানো না, তুমি ক্যাজুয়ালী কত লোককে মার্ডার কর!

রাই-সি ইউ সুন। ইয়োরস্ রুদ্র।

কেন আমার ও রকম মনে হল জানি না, আমার মনে ভীষণ ভয় হল। ঘরের কোথাও সাপ দেখলে লোকে যেমন আঁতকে ওঠে, আমি তেমনি আঁতকে উঠলাম। সে সাপ দাঁড়াশ কি গোখরো তা আমার জানা নেই, কিন্তু এই চিঠির মধ্যে সাপের গায়ের গন্ধ পেলাম আমি। মনে হলো, সাপটা আমার সব-হারানোর দিনে হঠাৎ পাওয়া সুখের, বুকভরা উষ্ণতার একমাত্র পাখিটিকে গ্রাস করার জন্যে এই শীতের দিনে বিশ্রাম নিচ্ছে, যাতে শীত কাটলে, ফাল্গুন হাওয়া বইতে শুরু করলেই সে এই পাখির দিকে হাঁ বাড়াতে পারে।

বাথরুমের ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হতেই আমি চোরের মত বইটি নামিয়ে রাখলাম।

কেন আমার নিজেকে চোর-চোর লাগল জানি না। কিন্তু লাগল।

আমি ছুটিকে সহজে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, ছেলেটি কে? কি করে? পিংকু ও মিলি কে?

কিন্তু আমার মনে হল, সে সব নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রশ্ন হয়ে যাবে। আমার কোনো অধিকার নেই ছুটিকে তার বন্ধু-বান্ধবীদের প্রসঙ্গে কিছু শুধোবার।

ছুটি সহজ চোখ তুলে আমার দিকে চাইল।

ওর সমস্ত শরীর থেকে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছিল। চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল লাগছে। সমস্ত মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

তাড়াতাড়ি চুল ঠিক করে ঠোঁটে গালে একটু ভেসলিন বুলিয়ে নিয়ে, আইব্রোপেনসিল দিয়ে ভুরুটা ঠিক করে নিয়ে বলল, চলুন, খাবেন চলুন।

খাবার ও রান্নাঘরের বন্দোবস্ত করে নেওয়া হয়েছে পাশের বারান্দায়।

খুব আলো আছে বারান্দাতে।

তাড়াতাড়ি খাবার গরম করে নিয়ে টেবলে রাখল ছুটি।

বলল, ছুটির হাতের রান্না ত আর কখনও খাননি। খেয়ে দেখুন। দেখছেন ত, কত গুণ আমার।

ধনেপাতা-সর্ষে দিয়ে কই মাছের ঝোল বেঁধেছিল ছুটি, পালং শাকের তরকারী, হিং দিয়ে ছোলার ডাল এবং স্যালাড।

আচারের টিনটা বের করল। বলল, আপনার ওখান থেকে ফিরে এসেই শহর খুঁজে ঐ আচার কিনেছি।

আমি বললাম, ওকি? সব মাছই ত আমাকে দিয়ে দিলে। তুমি কি খাবে?

ও—ও—ও।

বলে চোখ বড় বড় করে ছুটি ধমক দিল আমাকে। বলল, যা বলছি লক্ষ্মী ছেলের মত শুনুন। খান ত আপনি। রোজ যেন আসছেন। আমার কত সৌভাগ্য আজকে।

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, থাক, বানিয়ে বলতে হবে না।

ও অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, বলল, কেন? একথা বলছেন কেন? আমার সৌভাগ্য নয় কি?

আমি বললাম, আমি হয়ত আসি না, আসি নি কখনও—তোমার কত বন্ধু-বান্ধব, দাদারা আছেন, তাঁরা ত রোজই আসেন। আমার অভাব বলে ত কিছু বোধ করোনি তুমি। কখনও করেছ কি? কিন্তু আমি করি, সব সময়েই করি, বিশ্বাস করো; সত্যিই করি।

নুনের পাত্রে ছোট চামচ দিয়ে হিজিবিজি কাটতে কাটতে ছুটি আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল, মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনি ভীষণ বোকা। কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের ছাত্রের চেয়েও বোকা।

বলল, আমার কাছে অনেকে আসে, এখানে এসে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে, ছেলে-মেয়ে সকলের সঙ্গে। আপনাকে ত বলেছি, আমি বর্তমান বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে কখনো আপনাকে পাব কি পাব না এই ভেবে গোমড়া মুখে আমার বর্তমানটাকে আমি মাটি করতে চাইনি। আমি হেসেছি, আড্ডা মেরেছি, পিকনিক করেছি, তা বলে কি আপনি মনে করেন, আপনি মুছে গেছেন আমার জীবন থেকে?

তারপর একটু থেমে ছুটি বলল, সুকুদা, আপনি বড় ব্যারিস্টার হতে পারেন, লেখক হতে পারেন, কিন্তু মেয়েদের মন এখনও আপনার বোঝা হয় নি।

আমি বললাম, এ জন্মে হবে বলেও আশা নেই।

একটু পরে ছুটি বলল, আমার কাছে অনেকে আসে, আমি অনেককে চিনি, তবে আপনার এটুকু জানা উচিত সুকুদা, যে তারা আপনার মত কেউ নয়। তারা আসে, বসবার ঘরে বসে চা-সিগারেট খায়, চলে যায়। আপনিই একমাত্র লোক যিনি আমার শোবার ঘরে এলেন, আমার খাটে বসলেন।

তারপর একটু থেমে বলল, ঘরে ও খাটে বসা ছাড়াও আপনার অধিকার আরো অনেক বেশী তা আপনি জানেন। আপনি আর অন্যরা যে সমান নয় একথা আমার বলতে হচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে আমার। আপনি যেন কি রকম, অদ্ভুত।

আমি খেতে খেতে ছুটির টেবিলে রাখা বাঁ হাতের উপর হাত রাখলাম। বললাম, খাও। তুমি খাচ্ছ না কেন?

হঠাৎ ছুটি খাওয়া থামিয়ে বলল, আচ্ছা সুকুদা, কোনদিন আমি যদি আপনার মত করেই অন্য কাউকে চাই, তাহলে আপনি কি রাগ করবেন?

আমি জবাব দিলাম না। বললাম, তোমার সব প্রশ্নের জবাব ত তুমিই দাও। এ প্রশ্নের জবাবটাও দাও।

ছুটি বলল, প্রশ্নটা বোধহয় ঠিক হলো না। একথা বলা ঠিক নয় যে, আপনার মত করে কাউকে ভালোবাসতে পারব আমি। আসলে প্রত্যেকটা সম্পর্কই বিভিন্ন, তাদের প্রকৃতি, তাদের ডাইমেনশান সব বিভিন্ন। তাই এক সম্পর্কের সঙ্গে অন্য সম্পর্কের তুলনা বোধ হয় কখনো করা উচিত নয়। তাই না?

ঠিক তাই। আমি বললাম।

ছুটি বলল, থাক এসব কথা। আপনি আজ থাকছেন ত?

আমি বললাম, না, আমায় খেয়ে উঠেই বাস ধরতে ছুটতে হবে। যদি থাকতাম, তবে তোমার কাছে আজ নিজেই কিছু চাইতাম। কিন্তু বিশ্বাস করো, এই চার দেওয়ালের মধ্যের আনন্দ আমার ভাল লাগে না।

ছুটি মুখ তুলে চাইল।

বলল, ঠিক বলেছেন। আমার কিন্তু তাই মত ছিল ছোটবেলা থেকে। প্রত্যেক মেয়েরাই জীবনে মিলিত হয় কোনো না কোনো পুরুষের সঙ্গে—সারাজীবনে কত শত বার মিলিত হয়।—কিন্তু প্রথমবারের মিলনই একমাত্র মিলন যা চিরদিন মনে থাকে।

জানেন, সুকুদা, আমার ভাবলে হাসি পায়। প্রত্যেক বিবাহিত মেয়েই ফুলশয্যার দিনে, অনেক রজনীগন্ধার গন্ধের মধ্যে, নতুন বিছানার নতুন চাদরের ইরিটেটিং গন্ধের মধ্যে, ডাঁই-করা উপহারের মধ্যে জীবনে প্রথমবার মিলিত হয়।

যেমন, বয়স হলে বিয়ে করতে হয়, যেমন বিয়ে করলে লালচেলি পরতে হয়, অভ্যাগতদের রাধাবল্লভী, ফ্রায়াড রাইস ও ফিস ফ্রাই খাওয়াতে হয়, তেমন ঐ নতুন বিছানায় শুয়ে, আনকোরা কোনো বরের কাছে কুমারীত্বও খোয়াতে হয়।

সত্যি। ভাবা যায় না।

শীতকাল হলে শার্টিনের ওয়াড়-দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শুতে হয়, দরজা জানালা খোঁচ-খাঁচ সব সন্তর্পণে বন্ধ করে। গরমকাল হলে, বাঁই-বাঁই করে পাখা ঘোরাতে হয়। বুঝলেন, আমার ভাবলেই খারাপ লাগে। বিচ্ছিরি ব্যাপার।

তারপরই বলল, আপনি যা বললেন, সত্যি? তা সত্যি ত?

বললাম, সত্যি। তুমি দেখো, সত্যি কিনা। কোনো ঘরের মধ্যে নয়, সূর্যকে সাক্ষী রেখে,

একদিন আমি আকাশ, বাতাস, ফুল, পাখি সবাইকে সাক্ষী রেখে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। যেদিন হব, তুমি যতদিন বাঁচবে, যতদিন ভাবতে পারবে, ততদিন সেই মুহূর্ত, সেই দিনটির স্মৃতি, তোমার মনে তোমার শরীরে লেখা থাকবে। তুমি দেখো, লেখা থাকবেই।

ছুটি শিউরে উঠল উত্তেজনায়। তারপর হেসে ফেলল, বলল, থেতে পারছি না আমি, এমন একসাইটেড হয়ে গেছি। আপনি এমন করে বলেন না, যেন নর্ম্যাণ্ডী অভিযানে যাচ্ছেন।

তারপর একটু থেমেই ও বলল, বোকা। এসব কথা মুখে বলতে নেই। যা করবেন, তা করে দেখাবেন। মুখে এসব একেবারেই বলতে নেই। বলা মানা।

বলে, ওর বাঁ হাতের পাতা আমার ঠোঁটের সামনে ধরল। ওর ফিনফিনে হাতের পাতার নরম গোলাপি রঙে আমার চোখ ধেঁধে গেল। একটা গোলাপি ছায়ায় আমার চোখ ভরে গেল।

॥ তের ॥

কাল মাঝরাতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। এই শীতের মধ্যে যে শিলাবৃষ্টি হতে পারে এবং হলে যে কতখানি ঠাণ্ডা পড়তে পারে তা ধারণার বাইরে ছিল।

সকালে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। ঘরের বাইরেও যাওয়ার উপায় ছিলো না। দরজা জানলা বন্ধ করে বসেই প্রায় এক কেটলি চা খেলাম। তাতেও গা-গরম হল বলে মনে হল না। বাড়িতে বসে থাকলে শীত আরো বেশী লাগে। তাই ভাল করে গরম জামাকাপড় জুতো-মোজা এবং টুপী চাপিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে একটা কন্‌কনে হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে কান কেটে নিয়ে যাবে। নাক-মুখের যেটুকু অংশ আ-ঢাকা আছে সেটুকু অংশ মনে হচ্ছে অসাড়। এখন সাতটা বেজেছে কিন্তু এখনও মুখ থেকে সমানে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কথা বললেই।

বাইরে বেরিয়েই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

ঝরা-পাতা ঝরা-ফুলে সমস্ত পথ প্রান্তর পাহাড়তলি ছেয়ে গেছে। ছেয়ে গেছে পাখির কোমল পালকে। গোলাপ-ফুলের সমস্ত সৌন্দর্য মাটিতে ঝরে গেছে—যা রয়েছে, তা কঙ্কালসার কাঁটা। সমস্ত প্রকৃতি এক বিষাদ-বিধুর বিধবার সাজে সেজেছে।

এই স্তব্ধ ঝড়ের পরে শীতার্ত শান্তির মধ্যেও তিতিরগুলোর গলা শোনা যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। তিতিরদের ভাষা জানা নেই আমার, জানলে, বলতে পারতাম, ওরা সুখের না দুঃখের কথা বলছে।

প্যাটের বাড়ির পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন হঠাৎ প্যাটের গলা শুনলাম—ভীষণ উৎসাহী খুশীর গলা।

প্যাট ক্রাচে ভর দিয়ে ওর সিঁড়ির উপর একটা উইণ্ড-চিটার গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, গুড মর্নিং মিস্টার বোস।

আমি মুখ তুলে বললাম, ভেরী গুড মর্নিং ইনডিড।

প্যাট সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে এল, বলল, কোথায় চললে?

এই, একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।

কোনো বিশেষ কোথাও?

আমি হেসে বললাম, না। ঘরে বসে থাকতে পারছিলাম না ঠাণ্ডায়। দিনের বেলায় ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালাতেও ইচ্ছা করে না। তাই বেরিয়ে পড়লাম।

প্যাট বলল, তোমার যদি বিশেষ কোথাও যাবার না থাকে তাহলে চল আমার সঙ্গে মিস্টার বয়েলস্‌কে দেখে আসি।

মিস্টার বয়েলস্‌ কে? আমি বললাম।

মিঃ বয়েলস্‌ ভীষণ একাকী এক বৃদ্ধ।

ভদ্রলোকের দুই মেয়ে। মেয়েদের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। তারপর জামাইরা সে সম্পত্তি বেচে দিয়ে একজন ক্যানাডায় এবং অন্যজন অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে। শুনেছিলাম মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী অ্যাফেক্‌শনেট হয়—কিন্তু এই বিপত্নীক অসহায় বৃদ্ধকে দেখে সে কথা

আমার মনে হয় না। টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা দূরের কথা, সবসময় মনে করে ক্রিসমাসে একটা কার্ডও পাঠায় না তারা বাবাকে। অথচ এই বাবাই তাদের কোলকাতার লা-মার্টিনিয়ারে, লরেটোয় পড়িয়েছিলেন, ভাল বিয়ে দিয়েছিলেন, সমস্ত সম্পত্তি মেয়েদের তাঁর জীবদ্দশাতেই সমানভাবে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সেই সৎকর্মের এই পরিণতি। সত্যিই, ভাবলে অবাক হতে হয়।

কি করে চলে মিস্টার বয়েলস্-এর?

চলেই না, বলতে পারো, হাওয়া খেয়ে থাকেন।

ভাবলেও খারাপ লাগে।

এ জায়গাটা সেদিক দিয়ে অভিশপ্ত। এখানে অনেক অসহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দেখতে পাবে, তাদের দেখে আমি যে বিয়ে-থা করিনি, তোমরা যাকে সংসার করা বলো, তা করিনি বলে, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হয়।

সংসারের জন্যে অনেক কিছু করলে মানুষ স্বাভাবিক কারণে সংসারের কাছে কিছু আশাও করে। এবং মনে হয়, সে আশা করাটা অন্যায়ও নয়। শেষের দিনে যদি এই-ই ঘটে, যখন মানুষ একটু সঙ্গ চায়, একটু সহানুভূতি চায়, তখন যদি তার অশক্ত হাতে তাকে এমন করে বাঁচার জন্যে, নিছক বাঁচার জন্যেই লড়াই করতে হয়, তাহলে এই সংসার-সংসার মিথ্যে পুতুল-খেলা খেলে লাভ কি বল?

একটু থেমে প্যাট বলল, কাল রাতে ঝড় উঠতেই আমার মিস্টার বয়েলস্-এর কথা মনে হল, মনে হল, হয়ত গিয়ে দেখব এই দারুণ ঠান্ডায় মরে কুঁকড়ে আছেন মিস্টার বয়েলস্। বুঝলে মিস্টার বোস, মিস্টার বয়েলসের তুলনায় আমি সুস্থ, যদিও আমার চলাফেরার জন্যে এই ক্রাচের উপর নির্ভর করতে হয়। আমার তবু একজোড়া ক্রাচ আছে, যে-দুটোকে আমি এমন ঠান্ডা দিনে বুকের কাছে চেপে ধরে আমার চতুর্দিকের স্বার্থপর পৃথিবীর মুখে লাথি মেরে মেরে ঘৃণার সঙ্গে আমার একটা পা মাটিতে ফেলে ফেলে আমি হাঁটতে পারি।

কিন্তু এই বয়েলস্দের তাও নেই। আঁকড়ে ধরার মত কিছুমাত্র আর এঁদের অবশিষ্ট নেই এ-পৃথিবীতে। অথচ এঁদের সব কিছুই থাকার কথা ছিল। তোমার কি মনে হয় মিস্টার বোস, এ-সংসারে আমাদের আপনার বলতে কেউই নেই? কেউই থাকে না?

আমি জবাব দিলাম না। কোটের দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি নিঃশব্দে ওর পাশে পাশে হাঁটছিলাম।

প্যাট ওর সাঁতরাগাছির ওলের মত মুখটি ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার শুধোল, কি? উত্তর দিচ্ছো না যে?

আমি বললাম, উত্তর একটা জিভের ডগায় আসছে, কিন্তু সেটা ঠিক উত্তর কিনা জানি না। কারণ আমার আমাদের জীবন সম্বন্ধে এখনও অনেক দেখার বাকি, জানার বাকি, নিজেকে জানারও অনেক বাকি।

আমার কি মনে হয় জানো প্যাট, আমার, তোমার আমাদের সকলের জীবনই একটা চলমান অভিজ্ঞতা—এতে কোনো জানাই, কোনো মতই স্থিতিশীল নয়। আজ যা নির্ভুল বলে জানছি, কাল সেটাকেই চরম ভুল বলে মনে হয়। আজ যেটাকে চমকপ্রদ বুদ্ধিমত্তা বলে ভাবছি, কালই জানব যে সেটা একটা পরম নির্বুদ্ধিতা। তাই কোনো ব্যাপারে কিছু বলার আগে, বলতে ভয় হয় আজকাল।

প্যাট দাঁড়িয়ে পড়ে উইন্ড-চিটারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো, বলল, তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।

আমি হাসলাম, বললাম, উত্তর—মানে আমার উত্তর যদি শুনতেই চাও ত বলছি। আমার কি মনে হয় জানো প্যাট, আমাদের জীবনে, এই সংসারে আপনার বলতে, নিজের বলতে শুধু একটিই জিনিস আছে। একটি মাত্র জড়পদার্থ।

তার মানে? প্যাট বলল।

বললাম, সে জিনিসটি হচ্ছে বাথরুমের আয়না এবং সে আয়নায় প্রতিফলিত তোমার সত্যি-কারের ব্যথাতুর মুখ। ঐটুকুই।

এই সংসারে নিজের বলতে কেউই নেই প্যাট। কেউ কেউ আপনার হয়, আপনার হতে চায়;

ক্ষণকালের জন্যে, কিছুদিনের জন্যে। তুমি যদি সমস্ত জীবনটাকে ছোট করে হাতের মধ্যে তুলে ধরে একটা বলের মত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখো ত' দেখবে যে, তুমি ছাড়া, তোমার আয়নার মুখ ছাড়া, তোমার আপনার বলতে আর কেউই নেই; সত্যিই কেউ নেই।

প্যাট বলল, বাথরুমের আয়না কেন? ঘরের আয়না না কেন?

আমি হেসে বললাম, ঘরের আয়নার সামনে তোমার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ ও গোপনীয়তা ত নেই। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠবে, তোমার স্ত্রী (যদি থাকতেন) তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার মা-বাবা হঠাৎ পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকবেন। আর যেই তাঁরা ঢুকবেন, অমনি তোমার অভিনয় শুরু করতে হবে। তুমি আর তোমার নিজের মধ্যে থাকবে না।

প্যাট বলল, এ আবার কি কথা? তুমি কি বলতে চাও, আমাদের জীবনের সমস্ত সম্পর্কই অভিনয়ের? সত্যি সম্পর্ক বলতে কি কিছুই নেই?

সত্যি সম্পর্ক আছে। আমি বললাম, যেমন আমার এবং তোমার সম্পর্ক। এ-সম্পর্কে কোনো প্রত্যাশা নেই কারো। আমি তোমার পাশের বাড়িতে অল্প ক'দিনের জন্যে এসেছি। আমাকে তোমার এবং তোমাকে আমার ভালোও লাগতে পারে, খারাপও লাগতে পারে, কিন্তু যেমনই লাগুক সেই সত্যি অনুভূতিটুকুকে গোপন করার কিছুই নেই।

তোমার যদি আমাকে খারাপ লাগে, আমার সঙ্গে তুমি কথা না বলতে চাও, সকালে বিকালে 'উইশ' না করতে চাও দেখা হলে, নাও করতে পারো। এবং তা না করলে আমারও কিছু লাভ বা ক্ষতি নেই। কিন্তু সাংসারিক সব সম্পর্কই ত অন্য রকম।

মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো, এই সংসার একটা দারুণ অর্কেস্ট্রা। কোনো বুড়ো, মান্ধাতার আমলের প্রস্তরীভূত সামাজিক প্রতিভূ একজন কনডাকটরের মতো তার হাতের ছড়ি ওঠায় নামায় এবং তুমি যে বাজনাই বাজাও না কেন, তোমাকে সকলের সঙ্গে একই সুরে, একই লয়ে, একই মাত্রায় বাজাতে হবে।

তোমার ভাল লাগুক, কি নাই-ই লাগুক। তোমার তার ছিঁড়ে গেলে তাড়াতাড়ি তার বেঁধে নিতে হবে, হাত শ্লথ হয়ে এলে তবুও অন্যদের সঙ্গে একই সঙ্গে বাজাতে হবে। যদি তুমি থেমে যাও, না বাজাও; সমস্ত অর্কেস্ট্রা তখনই থেমে যাবে।

যদি তুমি থেমে যাও, সেই পলিতকেশ কনডাকটর এবং তোমার এতদিনের সঙ্গীরা, তোমার সঙ্গে এক সুরে এক লয়ে বাজানো বহুবছরের সঙ্গীরা সবাই বাজনা থামিয়ে তোমার দিকে তাকাবে। সবাই বলবে, ছিঃ ছিঃ। সবাই বলবে, কি খারাপ! সবাই বলবে, কি দুশ্চরিত্রতা, কি বিদ্রোহ।

তুমি অমনি আবার বাজনা তুলে নেবে, আবার বাজাবে সেই একই সুরে, একই লয়ে—তুমি আবার সেই মেষপালের একজন হয়ে যাবে—তোমার ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, তোমার সুখ-দুঃখ, স্বকীয়তা, তোমার নিজের শরীর, নিজের মন আবার নতুন করে বাঁধা দেবে সেই সামাজিক জনগণের স্টিমরোলার রায়ের কাছে। একজন সস্তা বেশ্যার মত তুমি নিজেকে বিক্রী করবে। কারণ সমস্ত-রকম উপায়ের উৎসমুখে বাস করেও তুমি নিরুপায়।

প্যাট বোধ হয় আমার কাছ থেকে ওর সহজ ও ক্যাজুয়াল প্রশ্নের এমন একটা ডিসটার্বিং উত্তর আশা করেনি।

তাই ও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সো হোয়াট? তোমার গাটস্ থাকলে তুমি বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহ করতে ভয় কিসের?

আমি বললাম, ভয় তোমাদেরই। ভয় সকলকে। ভয় কাকে নয়? তোমরা মানে সংসারের তোমরা। নিজেরা যা চিরদিন করতে চেয়েছ। চিরদিন বাঁধন-ছিঁড়ে পালিয়ে এসে নিজের শরীর ও মনের নৌকোয় নিজের খুশীর পালে ইচ্ছার হাওয়া লাগিয়ে নিজের জীবনের দরিয়ায় ভেসে পড়তে চেয়েছ, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি যে চড়ুই-পাখি তোমাদের; সেই তোমরাই একজন পুরুষ কি একজন নারী সেই সাহস দেখালেই ছিঃ ছিঃ করে উঠবে, তোমরাই তার ঘাড়ে পড়ে জংলী কুকুরের পালের মত তাকে ছিন্নভিন্ন পদদলিত করবে।

কি? করবে না? তুমি করোনি? আমি করিনি? এ পর্যন্ত কখনও কি করিনি আমরা? ভেবে দেখো ত?

তাই-ই বলছিলাম প্যাট, পারা যাবে না কেন? কিন্তু এমন যে করতে চায় সেই বিদ্রোহীর মেরুদণ্ডে যথেষ্ট জোর থাকা দরকার। তোমার আমার মত শ্যাওলা-ধরা মরচে পড়া সামাজিক

জয়গানগাওয়া মেরুদণ্ডে সে জোর নেই।

প্যাট কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওয়েল, আই থিঙ্ক উ্য আর রাইট।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ভাঙ্গা পলেস্তারা-খসা ক্ষয়েরী হয়ে-যাওয়া, গায়ে ঘাস ও অশ্বত্থের চারা-গজানো পুরোনো বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা একটা পায়ে চলা পথে ঢুকে পড়লাম।

পথটা উঁচু নীচু—বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দু'ধারে ঘন শালের জঙ্গল—সে জঙ্গলে যেন গতরাতে হাতীর দল মত্ততা করে গেছে। কোথাও মাটি দেখা যায় না—ঝরা-পাতা ফুল আর কুটোয় ভরে আছে সমস্ত জমি। এক দারুণ গালিচা যেন কেউ অদৃশ্য হাতে পেতে দিয়েছে। সে গালিচার রঙের বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। সবুজ লাল এবং হলুদের যে কত বিচিত্র নরম ও তীব্র রেশ হতে পারে তা এই গালিচা না দেখলে বোঝা যাবে না।

পা ফেললে এখানে কোনো শব্দ হয় না। পাতার নরম আর্দ্র গালচেয় পা পড়ে। ভুরভুর করে আতরের মত বনজগন্ধ ওঠে।

এখনও হু হু করে হাওয়া বইছে, ভেজা জঙ্গল—পাহাড়ের প্রভাতী গন্ধ বয়ে--সেই পরিষ্কার, নির্মল শীতল হাওয়া ফুসফুসের হয়ত হৃদয়েরও যা কিছু কালিমা সব সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিচ্ছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একটা বাঁকের মুখে দেখা হল লাবুর সঙ্গে।

এই শীতেও লাবুর খালি পা, গায়ে একটা প্রাপ্তবয়স্কদের ছেঁড়া কোট, পরনে সেই গুটিয়ে-পরা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুলপ্যাণ্ট।

বুকের কাছে কি একটা জিনিস দু' হাতে সযত্নে ধরে লাবু এদিকে আসছিল। আমাদের ও দেখতে পায়নি।

কাছাকাছি আসতেই মুখ তুলে আমাদের দেখেই লাবু যেন খুব ভয় পেল, পথ ছেড়ে জঙ্গলে দৌড়ে যেতে চাইল যেন ওর পা।

আমি ডাকলাম, লাবু।

লাবু থমকে দাঁড়াল।

আমরা এগিয়ে যেতেই লাবু দু' হাত তুলে দেখাল ওর হাতের জিনিস।

একটি নেতিয়ে-পড়া হলদে-কালোয় মেশা হলুদ-বসন্ত পাখি।

পাখিটাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে পাখিটা বেঁচে আছে। ঘাড়টা একপাশে হেলানো—অমন সুন্দর রেশমী-নরম তেল-চকচকে উজ্জ্বল পালকগুলো যা স্বাভাবিক অবস্থায় গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে সেগুলো ভিজে গিয়ে চতুর্দিকে এলোমেলো হয়ে গেছে। পালকের ফাঁকে ফাঁকে ওর নরম কোমল বুক দেখা যাচ্ছে।

লাবু বলল, বেঁচে আছে। দেখুন, বুকটা এখনও গরম। ধরে দেখুন।

আমি বললাম, তুমি কি করবে এটাকে নিয়ে?

লাবুর কটা চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল।

ও বলল, বাঁচাবো—কাল ঝড়ে ও ঠাণ্ডায় ও মাটিতে পড়েছিল, ও মরে যাচ্ছিল, আমি দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে আনলাম। আমি ওকে ঠিক বাঁচাব, দেখবেন।

বাঁচিয়ে কি করবে? পুষবে?

লাবু হাসল, ওর দাঁত-ভাঙ্গা রুক্ষ আন্তরিক হাসি। বলল, ধ্যাৎ।

ওকে তাহলে বাঁচিয়ে লাভ কি?

ওকে বাঁচিয়ে, তারপর ওকে উড়িয়ে দেব।

তারপরই বলল, খাঁচার মধ্যে বাঁচা কি বাঁচা নাকি?

প্যাট আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে ততক্ষণে।

প্যাট কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, বাঁচিয়ে তোমার লাভ?

লাভ? বলে লাবু অনেকক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল প্যাটের মুখের দিকে।

ওর চোখ দেখে মনে হল ওর জীবনে লাভ-ক্ষতির হিসেবটা এখনও ওর সমস্ত কাজ ও অকাজকে আমাদের যে-ভাবে করেছে, সে-ভাবে আচ্ছন্ন করেনি।

একটু ভেবে বলল, কিসের লাভ? এমনিই বাঁচাব। ভাল লাগে; তাই। তারপর বলল, বাঁচাতে, কাউকে বাঁচাতে আমার দারুণ লাগে।

লাবু আর কথা না বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেমন আপনভোলা হয়ে হাঁটছিল তেমন

আপনভোলা হয়ে চলে গেল।

আরো কিছুদূরে যাবার পর একটা টিলার একেবারে নীচে একটা ছোট্ট কটেজ চোখে পড়ল।

এককালে কটেজের গায়ের রং বোধ হল লাল ছিল, এখন জলে, রোদে, বাসি-পচা-ফ্যাকাসে পাতার মত হয়ে গেছে। ছাদটা টালির; এখানের সব বাড়িরই যেমন। বাইরে একটা ছোট্ট বারান্দা, কাঠের রেলিং দেওয়া।

বাড়িটার সমস্ত পরিবেশে, বাড়িটার এই হিমে রোদ-না-ওঠা সকালে অসহায় অসংলগ্নভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভংগীর মধ্যে কেমন একটা গা-ছমছম অজাগতিক ভাব ছিল।

ঝরা-পাতা, ঝরা-ফুল মাড়িয়ে আমরা বারান্দায় উঠে দরজার কাছে দাঁড়ালাম।

বারান্দার এক কোণায় একটা ভাংগা কাঠের ইজি-চেয়ার। বসতে বসতে যেন কাঠের চেয়ারটা ক্ষয়ে গেছে। এককালে সবুজ রং ছিল চেয়ারটার, এখন শুধু একটা সবুজের অস্পষ্ট আভা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

এ বাড়ির কোথাও কোনো রং নেই—সমস্ত বাড়িটাই কেমন ম্যাটমেটে পাংশুটে।

প্যাট ওর তীক্ষ্ম ভাংগা গলায় ডাকল, মিস্টার বয়েলস্, মিস্টার বয়েলস্, আর উ্য ইন?

ভিতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

প্যাট আবার ডাকল গলা চড়িয়ে, মিস্টার বয়েলস্, আর উ্য ইন?

তবুও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

যতিহীন ঝোড়ো হাওয়াটা শালের বনে, টালির ছাদের খাঁজে খাঁজে হুইসেল বাজিয়ে ভূতের বাঁশীর মত বেজে যেতে লাগল।

প্যাট এবার দরজায় ধাক্কা দিল। পরক্ষণেই ধাক্কা দেওয়া বন্ধ করল, পাছে দরজাটা ভেংগে যায়। পাতলা কাঠের টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে দরজাটা বানানো—বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকছে সাঁ সাঁ করে। কাঠের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করলাম, কিছুই দেখা গেল না।

প্যাট এবার প্রায় চীৎকার করে ডাকল, মিস্টার বয়েলস্, ফর গডস্ সেক, প্লিজ ওপেন।

এমন সময় পাহাড়ের গা বেয়ে একজন দেহাতী লোককে নেমে আসতে দেখা গেল।

প্যাট ওকে দেখে হিন্দীতে জিগ্যেস করল, সাব কা কা হো গ্যায়া?

লোকটি নিরুত্তাপ গলায় বলল, বুখার হ্যায়।

কবসে?

তিন চার রোজসে।

লোকটা আর বাক্যালাপে উৎসাহ না দেখিয়ে বাড়ির পেছনে গিয়ে কি প্রক্রিয়ায় কোন্ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জানি না। কিন্তু দেখলাম, ঢুকল। তারপর সে-ই এসে ছিটকিনি খুলে সামনের দরজা খুলে ফেলল।

প্যাট আমাকে বলল, প্লিজ কাম ইন।

প্যাটের সংগে সেই প্রায়ান্ধকার বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

বাইরে একটা বসবার ঘর। ভাঙা-চোরা কতগুলো ফার্নিচার—একটা রোঁয়া-ওঠা অপরিষ্কার পাটের কার্পেট।

সেই ঘর পেরিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকলাম। ঢুকেই আঁৎকে উঠলাম।

মানুষের মুখ যে এমন হয় আমার তা জানা ছিলো না; দেখা ছিলো না। ইংরিজী অভিধানে "এমাসিয়েটেড" বলে একটা কথা আছে। সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ কি হওয়া উচিত তা আমি জানি না।

তবে, সেই প্রথম, কথাটার মানে বুঝতে পারলাম।

দেখলাম, একজন কংকালসার বৃদ্ধ। তাঁর অস্থিচর্মসার মুখ দেখা যাচ্ছে কম্বলের আড়ালে, এবং তিনি যে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে আছেন সেই বালিশেই আর একজন ঝাঁকড়া চুলের মাথাওয়ালা ছোটখাট মহিলা শুয়ে আছেন।

পাশের মানুষটি কে বুঝতে পারলাম না—কারণ প্যাট বলেছিল মিসেস বয়েল্স অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

প্যাট কাছে গিয়ে ওর ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে ডাকল, মিস্টার বয়েলস্, মিস্টার বয়েলস্।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কোনো সাড়া দিলেন না। প্যাট কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখল, জ্বর আছে কি নেই।

তারপর এ ঘরের লাগোয়া খাবার ঘর ও রান্নাঘরে এসে প্যাট সেই লোকটিকে, যে আমাদের দরজা খুলে দিয়েছিল তাকে শুধোল, জ্বর ত এখন নেই? সাহেব কখন শেষ খেয়েছিলেন? কবে খেয়েছিলেন?

লোকটি বলল, পরশু দিন।

তার পরে?

বলে প্যাট চোখ বড় বড় করে তাকাল ওর দিকে।

ও বলল, তার পরে আমি আসার সময় পাইনি। আমাকে ত করে খেতে হয়। সেদিন রোজ আমি যেমন বাইরে থেকে পিছনের দরজা বন্ধ করে চলে যাই, তেমনই চলে গেছিলাম। কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টির পর এই আবার আসছি খোঁজ নিতে।

প্যাট একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর খাওয়ার ঘর ও রান্নাঘর হাতড়ে হাতড়ে সমস্ত আনাচকানাচ খুঁজেও কিছু খাওয়ার জিনিস খুঁজে পেল না। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, হ্যাভ উ্য ইউর পার্স অন উ্য?

আমি বললাম, আছে, পার্স সংগে আছে। কেন, কি চাও?

প্যাট বলল, তোমার কাছে দশটা টাকা ধার চাই।

আমি কথা না বলে দশ টাকার একটা নোট বের করে দিলাম। প্যাট টাকাটা নিয়ে, পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে একটা ফর্দ লিখতে বসলো। ফর্দ লেখা শেষ করে সেই লোকটিকে দিয়ে বলল, শীগগির মুদির দোকান থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে। প্যাট আরও একটা ছোট চিঠি লিখে দিল ওর বাড়ির মালির কাছে—ওর ঘরে একটি বোতলের তলায় পুরোনো দেশী ব্রান্ডির সামান্য তলানী অবশিষ্ট আছে। সেই ব্রাণ্ডিটা দিয়ে দিতে বলে লিখল।

লোকটি চলে গেল।

প্যাট রান্নাঘরের কোণা থেকে একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে আমাকে বলল, তুমি ওদের দেখো। যদি উঠে পড়ে এর মধ্যে তাহলে আমার নাম কোরো। আমি এক্ষুনি একটু কাঠ কেটে নিয়ে আসছি। যা হোক কিছু রান্না করে খাওয়াতে হবে মিস্টার বয়েলসকে ও কুকুরটাকে। এই ঠাণ্ডায় না খেয়ে থাকায় ওদের দুজনেরই কোমা'র মত হয়েছে। ক্ষিদে এবং শীতে দুজনেই এমন কুঁকড়ে গেছে।

আমি বললাম, কুকুর মানে? কুকুর কোথায়?

প্যাট বলল, মিস্টার বয়েলসের পাশে ওঁর কুকুর লুসি শুয়ে আছে। ককারস্প্যানিয়েল। অন্ধকারে তুমি কি মানুষ বলে ভুল করলে নাকি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি ত তখন থেকে তাই-ই ভাবছি যে, মিস্টার বয়েলসের পাশে শুয়ে থাকা সাদা চুলের বৃদ্ধাটি কে?

প্যাট একটু হাসল—শব্দ না করে, তারপর বলল, এক্ষুনি আসছি।

ঐ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি লাগছিল। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

প্যাট কাছেই জঙ্গলের মধ্যে ঝড়ে-পড়া কাঠ কাটছিল। ওর কুড়ুল চালানোর শব্দ হতেই আমার হুঁস হল যে আমার ওকে পাঠানো উচিত হয়নি। ও ওর এক-পা নিয়ে কাঠ কাটবে কি করে? কিন্তু আমি শব্দ পেলাম যে ও কাঠ কাটছে।

দৌড়ে গিয়ে ওর হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিতেই ও হাসল, বলল, অল রাইট, লেটস্ ডু ইট টুগেদার, বলে ও এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঠগুলোকে পা দিয়ে চেপে ধরতে লাগল, আমি কুড়ুল চালাতে লাগলাম। দেখতে দেখতে, বেশ অনেকক্ষণ জ্বালানোর মত কাঠ জড়ো হয়ে গেল।

চারিদিকে শুকনো বলে কোন কিছু ছিলো না যে, তাড়াতাড়ি আগুন করবার জন্যে আনা যায়।

সূর্য তখনো ওঠে নি। আকাশ ও চতুর্দিকের ভেজা সুগন্ধি শীতার্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে মনে হল সূর্য আর কোনদিনও উঠবে না।

আমি যখন প্রথম কিস্তির কাঠগুলো বয়ে আনছি, এবং প্যাট আমার পাশে পাশে হাঁটছে তখন হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একটা সাদা কিন্তু কালচে হয়ে-যাওয়া ককারস্প্যানিয়েলকে আসতে দেখা গেল আমাদের দিকে।

কুকুরটা দৌড়ে আসছিল না। কেমন নেশাগ্রস্তের মত হেলতে দুলতে আসছিল।

কুকুরটা এগিয়ে কাছে এসেই প্যাটকে দেখে অনেক কষ্টে একবার লেজ নাড়ল, তারপর

একবার ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাকের বদলে যে শব্দটা তার মুখ থেকে বেরোল সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। ডাকটা বড় করুণ। এক অবলা জীবের অশেষ সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পেঁছে জান্তব যন্ত্রণার সে এক করুণ অভিব্যক্তি।

প্যাট কুকুরটাকে অনেকক্ষণ আদর করল।

আমি, প্যাট ও কুকুরটা একসঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকলাম।

আমি যখন কাঠগুলো ঢেলে রাখছি, তখন মিস্টার বয়েলস যেন জীবনের অন্য পার থেকে ক্ষীণ দুর্বল, অথচ তীক্ষ্ণ গলায় শুধোলেন, হুজ দ্যাট্?

প্যাট জোরে উত্তর দিল, ইটস মী, মিস্টার বয়েলস, ইটস মী, প্যাট গ্লাসকিন।

পরক্ষণেই প্যাট বলল, আমরা একটু কাজ করছি, এক্ষুনি যাচ্ছি ও ঘরে। সঙ্গে আমার এক প্রতিবেশী আছে, নিয়ে যাচ্ছি।

তারপর উনুনে কাঠ সাজাতে-সাজাতে প্যাট বলল, এখন ও ঘরে গেলেই কথা বলতে চাইবে বুড়ো। আগে আগুন করি, ঘরেও ফায়ার প্লেসে আগুন করব, কিছু খাবার বানাই, তারপর বুড়োকে খাইয়ে-দাইয়ে কথা বলব। এখন ওঁর কথা বলার মত অবস্থা নেই।

তারপর অনেকক্ষণ আমরা কাজ করতে লাগলাম।

কখন যে সেই লোকটি প্যাটের লিস্ট অনুযায়ী সব রসদ এনে হাজির করল, কখন যে প্যাট উনুন ধরিয়ে, লোকটিকে দিয়ে শোবার ঘরের ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে ডালের স্যুপ, টোস্ট এবং আলু ও ডিম দিয়ে একটা কারিমত বানিয়ে ফেলল বুঝতেই পারলাম না।

দ্রুতগতিতে কাজ করতে করতে প্যাট ফিসফিস করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল, দ্যাখো, এরকম করেও মানুষ বেঁচে থাকে, মানুষের প্রাণ বড় শক্ত। শুয়োরের প্রাণের চেয়েও শক্ত। মানুষের বাঁচার সাধ বড় লজ্জাকর।

আমি বললাম, তুমি কি এই অবস্থায় থাকলে বাঁচতে চাইতে না প্যাট!

প্যাট দেওয়ালে হেলান দিয়ে ওর ক্রাচ দুটো রেখে একটা টুলের ওপর বসে টেবিলের উপর ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটছিল।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, খুব ভাল লোককেই প্রশ্নটা করেছ বোস—কারণ আমারও একদিন এ অবস্থা হতে বাধ্য। মিস্টার বয়েলসের তাও মেয়েরা ছিল, এক সময় স্ত্রীও ছিল, তবুও আজকে তার এই অবস্থা। কিন্তু আমার ত আজও কেউ নেই, সেদিনও কেউ থাকবে না। তবে একটা কথা তোমাকে বলছি বোস, তুমি জেনে রেখো যে, আমি নিজেকে এই অবস্থায় পেঁছতে দেব না। দেখবে, তার আগেই কোন-না-কোন উপায়ে আমি পালাব এই নিষ্ঠুর শীতার্ত জগৎ থেকে। তোমাকে বলেছি, আমি আমার জীবনকে ভালোবাসি। ডেসপাইট অফ এভরীথিং আমি আমার জীবনকে ভালবাসি। কিন্তু এরকম জীবনকে নয়।

যতদিন এই গায়ের উইন্ড-চিটারের মত, আমার বুকের ভিতরের মনের উইন্ড-চিটারটা অক্ষত থাকবে, ততদিনই আমি বাঁচব। আমি কাউকে আমাকে করুণা করতে দেব না, কোন কিছুর জন্যেই নয়। আই উইল কিক্ মাই ওওন বাকেট উইদাউট দা হেল্প অব আদারস্। তুমি দেখো। যদি তখনও তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকে, তবে তখন দেখো। জেনো, আমি এরকম কুঁই কুঁই করে কখনো বাঁচবো না। মরবও না। আই ওয়াণ্ট টু ডাই উইথ আ ব্যাং, নট উইথ আ হুইম্পার। আমি সশব্দে সমস্ত অনুভূতির তীব্রতার মধ্যে বাঁচতে চাই, মরার সময়েও সচকিত শব্দতার মধ্যে মরতে চাই। বিলিভ মি, আমাকে বিশ্বাস করো বোস।

প্যাটের মুখে একটা আশ্চর্য হাসি দেখলাম। সে রকম হাসি টলস্টয়ের গল্পের নায়করাই শুধু হাসতে পারে বলেই জানতাম—।

আমার সামনে এক-পা ঝুলিয়ে বসে-থাকা এই সাদার মধ্যে কালো ছিট-ছিট মুখের প্যাটও যে অমন দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসতে পারে তা আমার জানা ছিলো না।

প্যাটকে এই গত এক ঘণ্টা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। ও ওর শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও কত কর্মক্ষম—কত চটপটে—কথায়-বার্তায় ওর নিজের প্রতি সম্মানজ্ঞান, ওর জীবনের প্রতি ভালোবাসা দেখে মনে হচ্ছিল যে, আমাদের ধারে-কাছের. চেনা-পরিচিত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই কত কি শেখার আছে। প্রত্যেককে খতিয়ে দেখলে, খুঁটিয়ে দেখলে তাদের সম্মান-অসম্মানজ্ঞান, স্বার্থপরতা-স্বার্থহীনতা, সততা-অসততা কত প্রাঞ্জলভাবে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ইচ্ছে হয়,

ইচ্ছে করে আমার চোখের-দেখা, কাছের মানুষদের সবাইকে ভালোবাসতে, বা শ্রদ্ধা করতে,—কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ মানুষই মনুষ্যত্বহীনঃ মানুষের অংগপ্রত্যংগে শোভিত জীব বিশেষ। দুঃখটা সেখানেই।

কলাই-করা চলটা-ওঠা ডিশে করে স্যুপ ঢেলে নিয়ে, অন্য ডিশে টোস্ট ও কারি সাজিয়ে, প্যাট যখন ক্যানেস্তারার টিন-কাটা-ট্রেতে করে সব ওঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তখন মিস্টার বয়েলস্ আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

প্যাট ওঁকে জাগিয়ে, খাটের পাশে বসে সব আস্তে আস্তে খাওয়াল।

কুকুরটা খাটেই মিস্টার বয়েলসের পাশে গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। প্যাট ডাকল, লুসি, লুসি।

লুসি চোখ খুলে খাটের উপরই দাঁড়িয়ে পড়ল। প্যাট লুসিকে নিয়ে গিয়ে ঘরের কোণায় ওকেও গরম ডালের সংগে মিশিয়ে খাবার দিল।

লুসি লম্বা জিভ বের করে চাক্ চাক্ শব্দ করে খেতে লাগল।

মিস্টার বয়েলসের খাওয়া শেষ হতে সময় লাগল। খাওয়া শেষ হলে প্যাট গরম জলের সংগে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে ওঁকে খেতে দিল।

মিস্টার বয়েলস ব্রাণ্ডির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বললেন—এত বড় ভোজ আজ কিসের জন্যে? তারপরই দেওয়ালে টাঙ্গানো রাঁচীর একটা জুতোর কোম্পানীর ক্যালেন্ডারের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন। বললেন, বাই জোভ, টু-ডে ইজ মাই বার্থডে! হোয়াট্ আ কো-ইন্সিডেন্স্।

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।

প্যাট বলল, মেনি মেনি হ্যাপী রিটার্নস্ অব দা ডে।

কথাটা শুনেই বৃদ্ধ কেমন মুষড়ে গেলেন—বললেন, ফর গডস্ সেক, ডোণ্ট সে দ্যাট টু মী। ঐ সব আমার চেয়ে ভাগ্যবান লোকদের জন্যে। তার চেয়ে তোমরা উইশ কোরো, আমাকে যেন পরের জন্মদিন আর দেখতে না হয়।

প্যাট একটা সিগারেট ধরিয়ে মিস্টার বয়েলসের দিকে এগিয়ে দিল।

খেয়ে-দেয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে মিস্টার বয়েলস বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। দাঁড়িয়ে উঠে দেওয়াল থেকে গ্রেট-কোটটা পেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেন। তারপরই বললেন, ওয়েল, হাউ বাউট ইউ জেণ্টেলমেন, ওণ্ট ইউ হ্যাভ এনিথিং টু ড্রিঙ্ক?

প্যাট বলল, আমরা চা ভিজিয়েছি। চা খাব পুরো এক কেটলি। বলেন ত চায়ের সংগে ব্র্যাণ্ডি মিশিয়েও নিতে পারি। আজকের মত ঠান্ডা দিন বোধহয় এ বছর আর পড়বে না।

মিস্টার বয়েলস্ প্যাটের কথা শেষ হবার আগেই বললেন, আর সেই জন্যেই বোধহয় আমার জন্মদিন আজই পড়েছে।

মিস্টার বয়েলস্ যেন বরফে ঢাকা পাহাড়তলীর ওপার থেকে কথা বলছিলেন, তাঁর গলার ও গালের চামড়া শকুনির গলার মত ঝুলে ছিল। গালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে ছিল। কোটরগত দুটি এককালীন-তীক্ষ্ম চোখ ঘোলা রক্তবাহীন হয়ে উঠেছিল।

উনি বলছিলেন, ওয়েল, মিস্টার বোস, আপনার কথা আমি শুনেছি প্যাটের কাছে। আশা করি এখন আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। জানেন, আমি এখনও শুধু প্যাটের জন্যে বেঁচে আছি। প্যাট যে আমার জন্যে কি করে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমার ছেলে নেই, কেউ নেই, আমার টাকা-পয়সাও নেই। প্যাটের আমার প্রতি ব্যবহারের বদলে আমি যে কিছু করব সে সামর্থ্যও আমার নেই। তবে মানুষের হৃদয়ের দানের যদি কোন দাম থাকে, মানুষ যদি সে দামের বিন্দুমাত্র মর্যাদাও দেয়, তাহলে আমি বলব, প্যাটকে আমি অনেক কিছু দিয়েছি। সব সময় দিই।

বলেই বৃদ্ধ গলার ক্রশ মুঠো করে ধরে বললেন, মানুষের প্রার্থনার যদি কোন দাম থাকে, তাহলে প্যাট একদিন খুব সুখী হবে, আপনি দেখবেন, মিস্টার বোস।

প্যাট হেসে বলল, আমি কি এখনও অসুখী? আমার সবসময়ই সুখ—আপনি আমার জন্যে প্রার্থনা করুন আর নাই করুন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল, দেখি দশটা বেজে গেছে। আমার চোখের দিকে চেয়ে প্যাট বলল, ইয়েস, উই থিঙ্ক, উই শ্যাল মেক আ মুভ নাউ।

বৃদ্ধকে প্যাট কথাটা জোরে বলল, বৃদ্ধ বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ, যেতে ত হবেই—তোমরা ত সারাদিন এই বুড়ো মানুষ এবং একটা বুড়ি কুকুরের কাছে বসে থাকবে না। বুঝলে, তোমরা আমার ছেলের মত। আমার ছেলে থাকলেও ত তারা আমার জন্যে এত করত না।

আমি ওঠার সময় বললাম, আমি কি আপনার জন্যে কিছু করতে পারি মিস্টার রয়েলস্?

বৃদ্ধ চমকে উঠলেন, বললেন, ও থ্যাঙ্ক ঊ্য। থ্যাঙ্ক ঊ্য ভেরী মাচ। কিন্তু আমার জন্যে আর কি করবে বল? আমার জন্যে কিছু করার দিন শেষ হয়ে গেছে। বাট, ওয়েল; ইয়েস। ঊ্য ক্যান ডু মী আ ফেভার?

আমি ওঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললাম, কি? সেটা কি?

বৃদ্ধের বিষাদময় লোলচর্ম মুখে এক দারুণ কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, প্যাট যখন আমার কবর খুঁড়বে, তখন প্যাটকে একটু সাহায্য করো। মাই সোল উইল ফিল অনারড্। আমার আত্মা আনন্দিত হবে।

আমি উত্তর দিলাম না কোনো। কিন্তু বৃদ্ধের মুখে সেই আশ্চর্য বরফ-গলা হাসিটি অনেকক্ষণ ঝুলে রইল, ওঁর মুখের ঝুলে-থাকা চামড়ার মত।

আমরা বেরিয়ে এলাম।

আমাদের পিছনে পিছনে লুসি এল অনেকখানি ভেজা পথ মাড়িয়ে। খেয়ে-দেয়ে লুসির গায়ে জোর হয়েছিল।

কিছুটা গিয়ে প্যাট ঘুরে দাঁড়ালো, বললো, গো ব্যাক, ইউ বিচ।

প্যাটের মুখে কি যেন এক ঘৃণা ফুটে উঠল, অবাক ঘৃণা।

প্যাট বলল, গো ব্যাক লুসি, নাউ অফ্‌ফ্, ইউ গো।

লুসি কথা বলতে পারে না আমাদের ভাষায়, কিন্তু ওর এলোমেলো শনের নুড়ির মত চুলে ভরা মুখের মধ্যে থেকে দুটি চোখ তুলে সে প্যাটের দিকে এক দারুণ কৃতজ্ঞার চোখে চেয়ে রইল।

প্যাট বলল, আই উইল কিক্ ইউ গার্ল। ইউ বেটার গো নাউ।

প্যাটের চোখ মুখ এক হিংস্র ঘৃণায় ভরে গেল, কেন বুঝলাম না।

লুসি মুখ নামিয়ে পাতা-ঝরানো পথ বেয়ে ফিরে গেল।

প্যাট আমার পাশে পাশে হাঁটছিল।

আমি বললাম, তুমি মাঝে মাঝে বড় অপ্রয়োজনীয়ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠো। কেন? তোমাকে যত দেখছি, তত তোমাকে বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছে।

তুমি এরকম কেন?

প্যাট হাসল, হেসে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে বোঝা অত সহজ নয়। তুমি কি মনে করো, তুমি লেখক বলে একেবারে সবজান্তা হয়ে গেছ?

আমি একটু চুপ করে থাকলাম, তারপর বললাম, তুমি লুসির উপর এমন হঠাৎ চটে উঠলে কেন?

প্যাট ক্যাজুয়ালি বলল, আই কাণ্ট স্ট্যান্ড দা স্মেল অফ আ বিচ। বিশ্বাস করো, মেয়েদের আমি সহ্য করতে পারি না, সে মানুষই হোক, কি কুকুরই হোক।

আমি হাসলাম, বললাম, তোমার ঘর তাহলে পিন-আপ ছবিতে মুড়ে রেখেছ কেন?

প্যাট বলল, ওদের দূর থেকে ভালো লাগে, ওদের ছবি দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু কোনো মেয়ে কাছে এলে আমার গা-বমি-বমি করে। আই হেট দেম ফ্রম দা কোর অফ মাই হার্ট।

॥ চোদ্দ ॥

প্রথম বিকেলে সেদিন স্টেশানে গেছিলাম।

বহুদিন মাস্টারমশাই, গাঙ্গুলীবাবু, সাহাবাবুদের সঙ্গে দেখা হয় না। একটু গল্পগুজব করা গেল।

বিকেলের স্টেশান একটা বেড়াবার জায়গা।

শেষ-বিকেলের প্যাসেঞ্জার এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ায়। লোক ওঠে-নামে, ফেরিওয়ালার গলার স্বরে

সরব হয়ে ওঠে কিছুক্ষণের জন্যে নির্জন প্লাটফর্ম।

ফুল-ফুল স্কার্ট পরে, ফুল-ফুল কাপড়ের টুপী পরে মিসেস কার্ণি তাঁর স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটফুটে পুতুলের মত হাত নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলেন।

আলুর চপ ও সিঙাড়া ভাজার গন্ধ আসে, ভাঁড়ের চায়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধ তার সঙ্গে মিশে যায়।

শৈলেনের সঙ্গে দেখা হল। ওর আজ ডিউটি নেই। প্যান্টের উপর একটা পাঞ্জাবি পরেছে, তারপর একটা খয়েরী র‍্যাপার চাপিয়েছে।

স্টেশান ঘরের সামনের বেঞ্চে বসে সিগারেট খাচ্ছিল শৈলেন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন: আসুন দাদা। আপনাকে অনেকদিন দেখি না।

আমি হেসে বললাম, দেখতে চাও না, তাই দেখ না।

ও বলল, দেখতে চাই বলেই হয়ত দেখতে পাই না।

শৈলেন আমাকে একটু একা পেয়েই বড় বড় চোখে বলল, আমার এই সাদামাটা লাইফের এক দারুণ চ্যাপটারের মধ্যে দিয়ে পাস করছি দাদা। এখন রাজধানী এক্সপ্রেসের মত সময়টাকে সাঁ সাঁ করে নির্বিঘ্নে পাস করিয়ে দিতে পারলেই হয়। আপনার কি মনে হয়? কোনো খারাপ লোক কি লাইফ থেকে আমার সুখের ফিস্-প্লেটগুলো সরিয়ে নেবে?

আমি ওর কথার ধরন দেখে হেসে ফেললাম।

ও বোকা বোকা মুখ করে আমার দিকে তাকাল।

প্রেমে পড়লে সব লোকই বোকা হয়ে যায়, এবং সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সে-যে বোকা-বোকা ভাব করে তা সে নিজেও তখন বুঝতে পারে এবং বুঝতে পেরে যতই নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করতে চায়, ততই সেই চেষ্টার বোকামিটা বেশী করে চোখে পড়ে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্লাটফর্মের এক কোনায় টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ র‍্যাপারের মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে একটা মেটে-রঙা খাম বের করেই ছবিটা আমাকে দেখাল শৈলেন।

বিকেলের সোনালি আলোয় নয়নতারাকে দেখলাম।

কালোর মধ্যে খুব মিষ্টি বুদ্ধিমতী মুখ, রীতিমত ভাল ফিগার। নয়নতারার ছবির মুখ দেখে কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না যে সেই চিঠি ওর নিজের লেখা। কেন জানি না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো না।

আমি শুধোলাম, এ ছবি তোমাকে কি নয়নতারাই পাঠিয়েছে?

শৈলেন বলল, আরে দাদা, না। তাহলে ত হতই।

যখন এখানে ছিল, তখনই ওর সম্বন্ধের জন্যে ওর গুরুজনেরা ডজনখানেক এমন পাসপোর্ট সাইজের ছবি করে পাঠিয়েছিল। তখন ত আর তারা জানতো না যে, এ-জন্মের মত নয়নতারার সম্বন্ধ আমার সঙ্গেই হয়ে আছে। একেই বলে নির্বন্ধ। জানেন দাদা, জীবনে এই একটি পরের দ্রব্য না বলে নিয়েছি। ছবিটা ওর কাকীমার বাড়ি থেকে হাতিয়ে এনেছি। লোকে ত বলেই, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার, কি বলেন?

আমি বললাম, তাই ত।

শৈলেন বলল, কি বলব দাদা, এই ছবিটা বুকের কাছে থাকলে আমার শীত লাগে না। আমি শীতের রাতে খালি গায়ে এই ছবি বুকে করে তামাম লাপরা-হেসালঙ্-কঙ্কার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারি।

পরক্ষণেই শৈলেন বলল, আপনি আমার পাগলামি দেখে হাসছেন, না? আমি খুব এমোশানাল, না?

একটু চুপ করে থেকে বললাম; শুধু তুমি কেন? সমস্ত মানুষই কম-বেশী এমোশানাল। তবে তোমার মত সরল মানুষদের এমোশন বেশী। যারা ঘা-খাওয়া লোক, বা যারা জীবনের আঁকা-বাঁকা পথে চলতে চলতে তাদের মনটাকে অন্য রকম করে ফেলেছে তাদের এমোশন কম। আমরা প্রত্যেকেই বোধ হয় অনেক পরত ভঙ্গুর ভাবাবেগ নিয়ে জন্মাই, বড় হই; হয়ত সেটাই স্বাভাবিক। তারপর এই জীবনের ছায়াময় রুক্ষ পথে চলতে চলতে, বাড়তি-পোশাকের মত, এক এক করে এমোশনের এক এক পরতকে পথে ফেলে যেতে থাকি।

আমার তোমাকে দেখে মনে হয় শৈলেন যে, তুমি নিজে এখনও কাউকে কোনো দুঃখ দাও নি, এবং অন্য কেউও তোমার সুন্দর সরল মনটাকে বিদ্ধ করে নি। এরকম মন নিয়ে যদি চিরদিন বাঁচতে পারো, তবে বুঝবে, কিছু একটা করলে।

এটা কি একটা কিছু করা হল দাদা? মানুষের মন, আমার মন, আপনার মন ত নৌকোর পালের মতই—হাওয়া লাগলেই ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে, হাওয়া না লাগলেই চুপসে যায়, কুঁকড়ে গুটোয়। এতে আমার বিশেষত্ব কি?

আছে বিশেষত্ব। আমি বললাম।

তোমার আমার চারপাশের লোকদের যদি তেমন করে লক্ষ্য কর, ত দেখবে যে, তাদের বেশীর ভাগের মনই স্যান্‌ফোরাইজড্‌। তাদের মনে কোন সংকোচন প্রসারণ নেই। তাদের মনের পাল যেমন ছিল তেমনিই থাকে, হাওয়া লাগলেও ফোলে না, দোলে না, হাওয়া না লাগলেও চুপসোয় না, কুঁকড়ে গুটোয় না। তারা তাদের মনকে জীবনের সঙ্গে কণ্ডিশানড করে নিয়েছে। এয়ার কণ্ডিশনড ঘরের মত। সেখানে শীতে-গ্রীষ্মে একই তাপ।

তারা কি সুখী হয় দাদা? শৈলেন বলল। তারা কি অমন করে সুখী হতে পারে?

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, সুখের ত কোনো বিশেষ চেহারা নেই শৈলেন। প্রত্যেকের সুখ আলাদা-আলাদা রকম। আসলে আমাকে যদি শুধোও ত আমি বলব, সুখের নিজস্ব কোনো চেহারাই নেই, সুখ যে কোনো তরল পদার্থের মত—যে মানুষের মনের যেমন আয়তন, যেমন পরিধি, যেমন ঘনতা, সুখ ঠিক সেই আকার ধারণ করে। কাজেই যারা এমোশনকে জীবন থেকে বাড়তি পোশাকের মত ফেলে দিয়েছে তারা তাদের মত সুখী, আবার তুমিও তোমার মত সুখী। মনে হয়, জীবনে সুখ বলতে কে কি মনে করে তার উপরই সব কিছু নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা সকলেই সুখী এবং সকলেই দুঃখী।

আমরা দুজনেই ট্রেনটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

প্লাটফর্মের সামনের শালের জঙ্গল আসন্ন সন্ধ্যার পাখিদের কলকাকলিতে ভরে গেছিল। মানুষের গলার নানারকম সুর ছাপিয়ে সেই একটানা কলরোল, দূরের নদীর স্রোতের মত আমাদের কানে এসে লাগছিল। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলাম। আমি এবং শৈলেন। চুপ করে নিজেদের, প্রত্যেকের বুকের ভিতরে যে-পাখিরা এই শীতের সন্ধ্যেবেলায় ডাকে, তাদের ক্ষীণ শীতার্ত স্বর শুনছিলাম।

শেষ-বিকেলের প্যাসেঞ্জার প্লাটফর্ম ছেড়ে ধীরে ধীরে একসময় চলে গেল।

শৈলেন কখন যে চলে গেছিল, যাবার সময় নিশ্চয়ই বলে গেছিল, হয়ত নমস্কার জানিয়েও গেছিল; আমার মনে নেই।

পিছনের পথ দিয়ে যখন বাড়িতে এসে উঠলাম ছোট গেট খুলে, তখন সবে অন্ধকার হয়েছে। মুর্গীর-ঘর কাঠ-রাখার ঘরের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ রমার গলা শুনলাম বাড়ির ভিতর থেকে।

প্রথমে বিশ্বাস হল না।

তারপর বাড়ির পাশে আসতেই দেখি বাড়ির সামনে একটা ঘন বেগুনি রঙা মার্সিডিস গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটায় সাদা কাপড়ের সীট কভার লাগানো।

বসবার ঘরের আলো জ্বলছিল। ওরা গোল হয়ে বসেছিল। রমা, সীতেশ, সীতেশের স্ত্রী ডলি এবং আর একজন মহিলা।

আমি ঘরে ঢুকতেই সীতেশ আমাকে আপ্যায়ন জানিয়ে বলল, এই যে! অতিথিরা কখন এসে বসে আছে আর গৃহস্বামীর পাত্তা নেই। আমরা তোমার বিনা অনুমতিতেই কফি-টফি খাচ্ছি। আশা করি তাড়িয়ে দেবে না। আমরা কালই লাঞ্চের পর চলে যাব।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রমা বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই যে আমার বান্ধবী মাধুরী সেন। মিস্টার সেন, মানে ওঁর স্বামী গ্যান্ডার এণ্ড রবসন কোম্পানীতে আছেন—হি ইজ ভেরী হাই-আপ দেয়ার।

সীতেশের স্ত্রী ডলিই প্রথমে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শুধোলো, বলল, তারপর? শরীর এখন কেমন? শুনলাম এখন একেবারে সুস্থ—নর্মাল লাইফ লীড করছেন—তাই, নর্মাল লাইফ যাতে পুরোপুরি নর্মাল হয় সেই জন্যেই রমাকে নিয়ে এলাম সঙ্গে করে। কি? খুশী ত? বলে রমার দিকে চকিতে তাকাল।

এরকম পরিবেশে আমি চিরদিনই বোকা হয়ে যাই, মুখে কথা জোগায় না। আমি তাই জবাব দিলাম না কোনো।

বললাম, আপনারা বসুন, আমি বাবুর্চিকে খবর পাঠাই, দোকানেও পাঠাতে হবে একবার মালুকে। পাঁচ মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।

সীতেশ বলল, বাবাঃ দায়ে পড়ে বেশ সংসারী হয়েছিস ত।

ওদের উচ্চগ্রামের কথা বাজছিল কানে। ভাঁড়ারঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম।

মিসেস সেন, যাঁর নাম মাধুরী, তিনি বললেন, তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম তা কিন্তু ভেঙে গেল ভাই।

সীতেশ চিরদিনই সপ্রতিভ, সীতেশ কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ভেঙে গেল মানে কি? কল্পনার তুলনায় ভাল লাগল, না খারাপ লাগল?

মাধুরী বলেন, তা বলব কেন? মানুষটিকে যেমন ভেবেছিলাম তেমন উনি নন।

আমি ফিরে এসে ওদের সঙ্গে বসলাম।

রমা খুব সেজে-গুজে আছে। দেখে ভালই লাগছে। মেয়েরা সেজে না-থাকলেই আমার খারাপ লাগে, তবে আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগা নিয়ে মাথা ঘামানো রমা বহুদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছে। তবু যেন ও আমার স্ত্রী নয়, ও যেন কোনো স্বল্প-পরিচিত দূরের কোনো মহিলা তেমনি ভাবেই ও আমার সামনে বসেছিল।

রমা নিরুত্তাপ গলায় কিছু বলতে হয় তাই বলল, তুমি বেশ মোটা হয়ে গেছ। আরও মোটা হলে আনকুথ্ দেখাবে।

আমি জবাব দিলাম না।

সীতেশ আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আলোর মধ্যে বসে সীতেশের দিকে চেয়ে আমার মনে হল স্যাংচুয়ারীর মধ্যে, যেখানে কোনোরকম শিকার করাই বারণ, সেখানে আমার সঙ্গে হঠাৎ কোনো দাঁতাল শুয়োরের দেখা হয়ে গেছে। আমাকে বিনা প্রতিবাদে নিরস্ত্র অবস্থায় শুয়োরের লম্ফ ঝম্ফ আস্ফালন সব সহ্য করতে হচ্ছে: অথচ কিছুই করার নেই।

সীতেশ বলল, তারপর? তুই এখানে কি মধু পেয়েছিস রে? প্রফেশান কি ছেড়ে দিবি? ভাল হয়ে গিয়েও তোর কোলকাতা যাবার নামটি নেই?

রমা হঠাৎ বলল, ও-ও তোমাকে বলা হয় নি, মিস্টার ঘোষ হাইকোর্টে এলিভেটেড হয়েছেন—হাইকোর্টের জাজ হয়ে গেছেন গত সপ্তাহে।

এমনভাবে রমা কথাটা বলল, যেন হাইকোর্টে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর ওর নখদর্পণে, যেন ও-ই গত কয়েক বছর ধরে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার।

তারপর বলল, এখন তুমি ফিরলে তোমার প্রাকটিস আরো ভাল হবে। কারণ হাবুল সেন ছাড়া তোমার লেভেলে আর কোনো কর্মাপটিটর রইল না তোমার। তুমি ফী বাড়াবে না?

আমি জবাব দিলাম না। এসব কথার জবাব হয় না।

সীতেশের স্ত্রী বলল, বমা বলেছে, আপনি ফিরে গেলেই ক্যালকাটা ক্লাবে একটা দারুণ পার্টি দেবে। ফীস্‌টা না হয় সেই দিন থেকেই বাড়াবেন। কত মোহর করবেন?

আমার ঠাস করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছা করল মহিলার ফোলা ফোলা ফর্সা গালে।

কিন্তু তবুও চুপ করেই রইলাম।

সীতেশ কথা ঘুরিয়ে বলল, বাইরেটা এখন কি যে প্লেজেণ্ট তা কি বলব। মনে আছে ডলি, গতবার যখন কণ্টিনেণ্ট থেকে ফিরছিলাম আমি আর তুমি, তখন আজকের দিনে, গত বছরের ঠিক এই দিনে, এই সময় প্যান-এ্যামের ফ্লাইট ধরছি। ওঃ হোয়াট আ ওয়াণ্ডারফুল টাইম উই হ্যাড—না, ডার্লিং?

পরক্ষণেই সীতেশ তার ডার্লিং-এর অপেক্ষা না করেই আমাকে বলল, এখানে সোডা পাওয়া যাবে? বোতলটা বের করি?

আমি বললাম, না। সোডা পাওয়া যায় না।

কি হরিবল্ জায়গা। তুই কি করে এখানে আছিস বল্ ত একা একা? তোর ঐ কি চামা না ঝামা, তার মোড় থেকে এই বাড়ি অবধি এটা কি একটা রাস্তা? মাই ফুট'

আমি বললাম, হুইস্কী জল দিয়েই খেতে হবে। জল ত রয়েইছে টেবিলে। তেষ্টা কি জোর পেয়েছে?

সীতেশ বাহাদুরীর হাসি হেসে বলল, তা সানডাউন যখন হয়ে গেছে, একটা সানডাউনারের সময় ত হয়েই গেছে।

বলেই, ও উঠে গিয়ে হুইস্কীর বোতল এনে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরপর দুটো বড় হুইস্কী খেল। কুইক ওয়ানস্। তারপর বলল, একটু বেড়িয়ে আসি। আই উইল গো ফর আ স্ট্রল। কে যাবে আমার সঙ্গে?

রমা বলল, পাঁচ বছরের আদুরে মেয়ের মত, আমি যাব।

রমার দিকে তাকিয়ে মিসেস সেন বললেন, আমার খুব টায়ার্ড লাগছে, আমি যাব না।

ডলি বলল, আমিও যাব না।

সীতেশের মুখ দেখে মনে হল ও এই-ই চাইছিল।

সীতেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তবে আর দেরী কেন? চল রমা, একটু হেঁটেই আসি। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে পা ধরে গেছে। দা ড্রাইভ ওয়াজ ভেরী টায়ারিং। বলেই সীতেশ উঠে পড়ল, টেবিলের উপর-রাখা টর্চটা তুলে নিয়ে দরজা খুলল।

রমা হ্যাঙ্গার থেকে ওর ওভারকোটটা তুলে নিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে বলল, চল।

বরা দুজনে বেরিয়ে গেল।

আমার জন্যে রেখে গেল একটি গোলগাল ব্যক্তিত্বহীন সুগন্ধি জড়পদার্থ এবং আর একজন আকাট বড়লোকের আড়ষ্টকাঠ স্ত্রী।

ডলি আলোর নীচে বসে মুখ নীচু করে নেইল-পালিশের রঙ তুলছিল লোশান দিয়ে। ডলির চেহারাতে কোনো খুঁত ছিল না। ধবধবে গায়ের রঙ, নাক, চোখ, মুখ এবং যেখানে যা যতটুকু থাকার তা। এবং সেই খুঁতহীনতাই ওর চেহারার একমাত্র খুঁত ছিল বলে আমার মনে হত। স্বামী-সোহাগিনী, দোকানে চুল-বাঁধা, ভোজ রাজে শাড়ি-কেনা এবং সাত্‌রামদাসে গয়না কেনাই যাদের হোল্‌টাইম অকুপেশান, তেমন অনেক ইন্‌সিপিড মেয়ে-বউ আমার দেখা ছিল। এদের উপর আমার কোনো রাগ ছিল না। কিন্তু, করুণা ছিল চিরদিনের। এদের আশ্চর্য সুযোগ ও অফুরন্ত সময়-ভরা জীবনকে এরা কি অবহেলায় নষ্ট করতে পারে তা দেখে এদের উপর একটা ঘৃণামিশ্রিত করুণা জাগত।

কোনো কথাই বলার নেই, বলা চলে না; এরকম মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ মিসেস সেন বললেন, আপনার লেখার আমি একজন দারুণ ভক্ত।

আমি মুখ তুলে বললাম, আপনি আমার কি কি বই পড়েছেন?

বই? বলে মিসেস সেন থেমে গেলেন। তারপর থেমে থেমে ভেবে তিন-চারটে বইয়ের নাম বললেন।

আমি একটি বইয়ের নাম করে বললাম, এই বইয়ের কোন্ চরিত্র আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?

ভদ্রমহিলা চুপ করে থেকে বললেন, সত্যি কথা বলছি আপনার সম্বন্ধে, মানে সুকুমার বোস লেখক সম্বন্ধে আমার ইণ্টারেস্ট হয়েছে হালে এবং আপনার নাম শুনেই এবং আপনি যে আমাদের রমার হাজবেন্ড তা জেনেই আপনার সব বই কিনে ফেলেছি।—কিন্তু জানেন, এত ঝামেলা যাচ্ছে, যে একটাও এখনও পড়া হয়নি। ফিরে গিয়েই সব পড়ে ফেলব।

আমি নির্লজ্জের মত বললাম, মিস্টার সেন পড়েছেন?

ও? বলে মিসেস সেন চোখ নাচালেন, বলতে চাইলেন, আমার কি আস্পর্ধা। সাহেবী মার্কেনটাইল ফার্মের এতবড় একজন অফিসারের কি বাংলা বই পড়ার সময় আছে?—তাও সুকুমার বোসের মত এত স্বল্পপরিচিত ও নতুন লেখকের লেখা?

মিসেস সেন মুখে বললেন, ও পড়ে। পড়ে না, বললে মিথ্যে কথা বলতে হয়। তবে বাংলা বই নয়।

ইংরাজী বই পড়েন বুঝি? বাঃ খুব ভাল ত!

হ্যাঁ।—হ্যারল্ড রবিনস ওঁর খুব ফেভারিট্‌—উনি কি বলেন জানেন? কিছু মনে করবেন না ত, শুনে?

বললাম, না। বলুনই না।

উনি বলেন, বাংলা-সাহিত্যে আজকাল কিছুই লেখা হচ্ছে না—যা হচ্ছে সব ট্রাশ,—ম্যাদামারা। ঐসব পড়ে সময় নষ্ট করার সময় নেই ওঁর। বোঝেনই ত। অত বড় কোম্পানীর এরিয়া ম্যানেজারের কত রকম ঝামেলা। বেচারী। সবসময়ই ত কনফারেন্স করছে। ফোন করেও একটু কথা বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, বাংলা বই বলতে কি পড়েন উনি জানেন?

কি?

পঞ্জিকা। গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা। খুব রেলিশ করে পড়েন বিজ্ঞাপনগুলো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

এই জেনারেশনের ম্যাদামারা বাংলা-সাহিত্যের একজন ম্যাদামারা লেখক হবার যে কী যন্ত্রণা, তার যে ন্যক্কারজনক অস্বস্তি তা এই স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার বোস হাড়ে হাড়ে জানতে পেল।

আমার স্ত্রীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী যদি মিসেস সেন হন এবং সীতেশ হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

কিন্তু রমা কখনও এমন ছিলো না আগে। অলস অবকাশ, ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা লোকের হাতে, বিশেষ করে মেয়েদের হাতে পড়লে তাদের মাথার ঠিক থাকে না।

ডলি বলল, এখানে গীজার আছে বাথরুমে?

আমি বললাম, গীজার নেই, ক্যানেস্তারা করে জল গরম করে দেবে। কেন? চান করবেন?

হ্যাঁ। একটু চান করে ফ্রেশ হওয়া যেত।

লালি বাইরে কাঠের আগুন করে ক্যানেস্তারায় জল বসিয়েই রেখেছিল। ওকে দুই বাথরুমেই জল দিতে বললাম।

ওঁরা উঠে ফ্রেশ হতে গেলেন।

মহিলারা চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে দেরী হয়েছিল।

রমা আর সীতেশ বেরিয়ে ফিরেছিল প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে।

এখানে রাতে বাঘ না বেরোলেও হায়না, শিয়াল, নেকড়ে, শুয়োর ইত্যাদি মাঝে মাঝে বেরোয়—বিশেষ করে কঙ্কার এদিকে, যেদিকে এখনও জঙ্গল আছে।

ওদের জন্যে বেশ চিন্তা হচ্ছিল। দুজনেই নতুন এ জায়গাতে। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকার। শেষে পথ হারিয়ে না ফেলে।

কিন্তু সীতেশ পথ হারায়নি। রমাও নয়।

ওরা যখন ফিরল, দেখলাম রমার চুল এলোমেলো, কপালের টিপ সরে গেছে। ওরা এসেই সমস্বরে বলল, বাবাঃ, যা বিপদে পড়েছিলাম, পথ ভুলে সেই কোথায় গিয়ে পড়েছিলাম।

আমি বললাম, স্বাভাবিক। এখানে পথ ভোলা খুবই স্বাভাবিক।

রমা আমার চোখের দিকে একবার চাইল, বোঝবার চেষ্টা করল আমি ওকে সন্দেহ করছি কিনা। কিন্তু আমার চোখে হিংসা অথবা সন্দেহ কিছুই ছিল না। আমার চোখ এবং মন এখন রমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাস। রমা সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, ও যেন আর একটু আত্মসম্মান-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। নিজেকে এত সহজে এমন সস্তায় ছোট না করে। এছাড়া ওর কাছে আমার আজ আর চাইবার কিছুই নেই।

ডলির মুখ দেখে মনে হল না, ও কিছু বোঝে বলে। বুঝলেও বোধহয় ডলির কিছু মনে করা সম্ভব ছিল না। কারণ পৃথিবীতে স্বামী ছাড়া নিজের বলতে যাদের আর কিছুই কেউই থাকে না, ডলি সেই ধরনের মেয়ে। স্বামী যা-ই করুক তার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস বা শিক্ষা তার ছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডলি বলল, আমরা মেয়েরা সবাই একঘরে শোব।

মিসেস সেন বললেন, আমার কিন্তু ভয় করবে মেয়েরা একা একা শুলে। কি রকম জায়গা বাবা, মনে হচ্ছে কোন অন্ধকূপে এসে পেঁৗছেচি।

আমি বললাম, তাহলে সীতেশও ঐ ঘরে থাকুক, মেয়েদের পাহারা দিক।

সীতেশ বলল, আই এ্যাম এ গেম—খুব রাজী।

হঠাৎ ডলি বলল তোমরা অত্যন্ত ইনকনসিডারেট। রমা কতদিন পরে এল, কতদিন পরে

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হল আর ওরা বুঝি আলাদা আলাদা শোবে।

ব্যাপারটায় আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল।

সীতেশ দারুণ উৎসাহ দেখিয়ে বলল, আরে তাই-ই ত! সকলেই ভুলে মেরে দিয়েছি! আজ যে এমন হ্যাপী-রি-ইউনিয়নের দিন তা আমার একেবারে খেয়াল ছিল না।

শেষকালে রমা আমার ঘরেই এল। মানে আমার পাশের ঘরে।

ওদিকের ঘরে ডলি আর মিসেস সেন শুল। মধ্যের দরজা খুলে রেখে শুল সীতেশ।

সমস্ত বাড়ির বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টেবল-ল্যাম্পটা জ্বলছিল। যাতে আমার অতিথিরা ভয় না পান।

আমি আমার ঘরে শোওয়ার বন্দোবস্ত করছিলাম আমার, এমন সময় রমা চাপা গলায় বলল, ঢং করো না। ওরা জানলে কি ভাববে? এ ঘরে এসে আমার পাশের খাটে শোও।

আমার কথাটা শুনে হাসি পেল, কিন্তু হাসলাম না।

আসলে, আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমরা সকলে. মানে রমা, সীতেশ এবং আমি—আমরা একটা দারুণ নাটক মঞ্চস্থ করব বলে ঠিক করে রিহার্শাল একেবারে না দিয়ে, আজই সন্ধ্যায় নাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছি।

ফলে, অভিনয় কারোই ভাল হচ্ছে না। প্রমপ্‌টারও নেই কেউ যে, পিছন থেকে প্রমপ্‌ট্ করবে। তাই আমরা সবাই ছেঁড়া ছেঁড়া সংলাপ বলছি। সবচে মজার কথা এই যে, আমরা তিন-জনই অভিনেতা অভিনেত্রী এবং এই তিনজনই দর্শক। কার অভিনয় কেমন হচ্ছে সেটুকুও বুঝতে পাচ্ছি না আমরা। সকলেই একটা অসহায় অবস্থায় অবস্থান করছি। কখন কার মুখে আলো পড়ছে অজানা জায়গা থেকে তা বুঝতে পারছি না, কখন বেরিয়ে যাওয়া উচিত উইংস থেকে, কখন ঢোকা উচিত উইংস-এ কিছুই আগে থাকতে ঠিক করা নেই।

মনে হচ্ছে, এমন আধুনিক নাটক কোলকাতার মুক্তাঙ্গনেও কোনো নাট্যগোষ্ঠী এর আগে মঞ্চস্থ করেননি।

বাইরে ফিস ফিস করে শিশির পড়ছে। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা।

ওঘরে ডলি আর মাধুরী পুটুর পুটুর করে কি সব মেয়েলী গল্প করছে।

সীতেশের গলা শোনা যাচ্ছে না। ও বোধহয় এখন গ্রীনরুমে মেক-আপ ধুতে গেছে।

হঠাৎ পিছনের নালা থেকে শিয়াল ডেকে উঠলো—একসঙ্গে অনেকগুলো—হুয়া হুয়া—হুক্কা হুয়া—কৈসে হুয়া?

ওঘর থেকে মাধুরী চেঁচিয়ে বলল, রমা ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রমা আয়নার সামনে বসে ক্রীম লাগাচ্ছিল মুখে। বলল, কেন? ভয় করছে?

মাধুরী বলল, না। কি রোম্যান্টিক জায়গা রে! সুইট ড্রিমস্।

সীতেশও পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, সুইট ড্রিমস্।

রমা চাপা গলায় আমাকে বলল, সত্যি। অবাক লাগে। তুমি কি আর চেঞ্জে আসার জায়গা পেলে না? কোনো ভদ্রলোক এরকম জায়গায় থাকে?

আমি খাটের ফ্রেমে বসেছিলাম। বললাম, আমি ত ভদ্রলোক নই।

সত্যি। রেসপেকটেবল লোকদের নিয়ে এরকম শ্যাবী জায়গায় আসতে লজ্জা করে।

তুমি এলে কেন? আমি ত আসতে বলিনি।

তুমি বলোনি জানি, কিন্তু লোকে কি বলে?

কি বলে?

বলে, আমি রমার দিকে চেয়ে রইলাম—। ভাবলাম, ছুটির কথা উঠবে এখুনি। এবং উঠলে প্রসঙ্গটা অত্যন্ত অপ্রিয় হবে। কিন্তু রমা ওদিকে গেল না। মনে হল, রমা ইদানীং আমাকে কিছু স্বাধীনতা মঞ্জুর করে নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। রমা হয়ত জানে না, যে-সুকুমার বোসকে ও আগে জানত, সে সুকুমার বোস মরে গেছে। ও নিজে হাতে তাকে একদিন মেরে ফেলেছে।

সে আর কখনও বেঁচে উঠবে না।

রমা বলল, লোকে কি বলে? স্বামী এই জঙ্গলে একা পড়ে আছে আর স্ত্রী আরামে দিন কাটাচ্ছে শহরে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কোনো কর্তব্য নেই?

লোকে এসব বলে নাকি? আমি বললাম। লোকের কথা শোনো কেন? তুমি ত লোকের কথা

নিয়ে কখনও মাথা ঘামাওনি। ঘামানো উচিতও নয়। আমি ত ঘামাই না।

রমা ক্রীম মাথা থামিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

বলল, এখন শরীর একেবারে ভাল? পুরোপুরি সুস্থ?

হ্যাঁ। বললাম আমি।

তুমি কি কাজকর্ম একেবারে ছেড়ে দেবে?

মাঝে মাঝে সেরকম ইচ্ছা হয়; কিন্তু উপায় নেই।

উপায় নেই কেন? আমার জন্যে? আমি তোমার কিসের তোয়াক্কা করি? তুমি কি মনে কর আমি তোমার মুখাপেক্ষী? ইচ্ছা করলে তোমার দ্বিগুণ রোজগার করতে পারি আমি—আমার সে কোয়ালিফিকেশান আছে। করি না; তাই। সেটা অন্য কথা।

আমি জবাব দিলাম না।

রমা বলল, কি? জবাব দিচ্ছ না যে?

আমি বললাম, তোমার জন্যে বা অন্য কারো জন্যে নয়, আমি আমার কাজকে ভালোবাসি সে জন্যে। ফিরে একসময় যাবই। তবে ছেদ যখন পড়েছে তখন আরো এক-দেড়মাস কাটিয়ে তারপরই যাব। গিয়ে শুধু কাজ করব। মাথা তুলে আর কোনোদিকে চাইবও না।

রমা বলল, তাইই ত উচিত। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে লেট-ডাউন করবে না।

কিসের লেট-ডাউনের কথা বলছ তুমি?

মানে একজন সাকসেসফুল ব্যারিস্টারের স্ত্রী হিসেবে আমাকে সকলে জানে—তোমার পরিচয়েই আমার পরিচয়—যদিও আমার নিজেরও একটা পরিচয় আছে—তবুও—আশা করি তুমি হাইকোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে আমার মাথা হেঁট করাবে না সকলের কাছে।

আমি কাজ ছাড়লে তোমার মাথা হেঁট হবে কেন?

কারণ সমাজে মিসেস বোস বলে আমার একটা পরিচয় আছে। এই ত সেদিন মিঃ গুহ'র পার্টিতে মিসেস গুহ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—হিয়ার ইজ মিসেস সুকুমার বোস। তোমাদের হাইকোর্ট পাড়ার যত ঘাঘু লোক সব ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল।

সে তুমি সুন্দরী বলে।

না। সেটাই সব নয়। আমি তোমার স্ত্রী বলেও।

তাই বুঝি? হবেও হয়ত বা, আমি বললাম।

তারপর বললাম, দ্যাখো রমা, আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। আমার প্রতি তোমার কোনো ফীলিংস নেই তা যেমন তুমিও জানো, আমিও জানি, তবু তুমি আমার স্ত্রী বলে সর্বসমক্ষে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হও কেন? আমরা কি দুজনে এই সম্পর্কের প্রতি কখনোই সীনসিয়র হতে পারি না? আর তা না যদি পারি...।

রমা কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কি কোনো নতুন পাঠশালায় ভর্তি হয়েছ নাকি। আজকাল অনেক কথা বলতে শিখেছ দেখছি?

তারপর বলল, জিজ্ঞেস করছ, তাইই বলছি, তোমার স্ত্রী বলে পরিচিত হয়ে যে আনন্দিত হই সেটা সামাজিক কারণে। তোমার সঙ্গে আমার ঘরের মধ্যে যে রিলেশানই থাকুক না কেন—সমাজের লোক তা জানবে কেন? তাদের তা জানতে দেবই বা কেন? এ সব কথা তুমি বুঝবে না।

পরক্ষণেই রমা বলল, আমার কিছু টাকা লাগবে।

টাকা ত আমার এখানে নেই। জানো ত পোস্টাফিস থেকে প্রতি মাসে টাকা তুলি এখান থেকে।

তা আমি জানি। চেক দাও।

ড্রয়ার খুলে আমি একটা চেক সই করে দিলাম। বললাম, ফিগার বসিয়ে নিও।

তারপর বললাম, টাকা দিয়ে কি করবে? তোমার সংসারের টাকা মনোজ প্রতি মাসে পৌঁছে দেয় না?

তা দেয়। এটা সংসারের জন্যে নয়। এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। একজনকে আমি একটা জিনিস দেব।

ঠিক আছে। আমি বললাম। কি জন্যে দরকার আমাকে বলার দরকার নেই।

থ্যাঙ্ক ইউ! বলে খুব খুশী খুশী মুখে রমা তাকাল আমার দিকে। তারপরই এসে, আমি যে খাটের ফ্রেমে বসেছিলাম তার পাশের খাটে শুয়ে পড়ল। বলল, লাইট-টাইট তুমি নিবিয়ে দিও।

আমি কিছু বলার আগেই রমা ফিসফিস করে বলল, তোমার কাছে ত ওসব কিছু নেই। আমি আসার সময় নিয়ে এসেছি। আমার হ্যান্ডব্যাগে আছে। তার পরই হঠাৎ বিনা ভূমিকায় বলল, তাড়াতাড়ি করো, আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

আমি যেমন বসেছিলাম, বসেই রইলাম। কোনো কথা বললাম না।

রমা ভুরু কুঁচকে বলল, কি? ইচ্ছা কি? আমার এসব ভালো লাগে না। আমার বলা কর্তব্য, তাইই বললাম; আমি কিন্তু এক্ষুনি ঘুমোব।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, না। থ্যাঙ্ক উ্য।

বলতে ইচ্ছে হল, ইটস্ ভেরী কাইন্ড অফ উ্য।

কিন্তু বললাম না।

ওঘর থেকে আসবার আগে, আলো নিবিয়ে রমার গায়ে কম্বলটা ভাল করে টেনে, গলার কাছে গুঁজে দিয়ে আমার ঘরে এলাম।

শোবার আগে বললাম, কাল সকালে কি খাবে বল? ব্রেকফাস্টে? হাসান খুব ভাল লিভার-কারী বানায় ব্রেকফাস্টের জন্যে। আমার যা ভালো লাগে তা ত তোমার ভাল লাগে না, তাই তোমার পছন্দমত মেনু বলে দিও—যা তোমার ভাল লাগে। এখানে সবই পাওয়া যায়।

ঠিক আছে। কালকে ওসব কথা হবে। আমার ঠান্ডা লেগে গেছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা ছিল। তারপর বলল, ঘুমোলাম, বুঝলে?

আমি বললাম, রুণ কেমন আছে? ওকে নিয়ে এলে না কেন?

আহা। কি যে বলো, ওর স্কুল নেই? তাছাড়া ছোটরা এরকম বড়দের সঙ্গে ট্যাং ট্যাং করে সবজায়গায় যায় নাকি? ছোটরা সঙ্গে থাকলে এ্যাডালট্রাও এনজয় করতে পারে না, ছোটদেরও খারাপ লাগে।

তা বলে, বাচ্চারা মা কি বাবার সঙ্গে কোথাও যাবে না?

যাবে না কেন? এরকম ট্রিপে নিয়ে আসা যায় না।

আমি বললাম, রুণকে অনেকদিন দেখি না।

আমিও দেখি না।

কেন? তুমিও দেখো না কেন? শুধোলাম আমি।

সময় কোথায়? একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। আজ পার্টি, কাল সেমিনার, তার পর দিন ফ্লাওয়ার শো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি একটা 'ইকেবানার' স্কুল খুলব ভাবছি কিংবা মেয়েদের চুল-বাঁধার দোকান। আমার টাকা দরকার।

বিলেত থেকে ডাক্তারী পড়ে এসে চুল-বাঁধার দোকান? আস্তে বললাম আমি।

তাতে কি? অনেক টাকা আছে এই ব্যবসায়। সেদিন আমার এক সিন্ধী বান্ধবী বলছিল কি জানো? বলছিল, লুক, মানি ইজ মাই ফার্স্ট হাজব্যান্ড। টাকাই হচ্ছে সব। স্বামী বল পুত্র বল টাকার কাছে কেউ কিছু না—।

আমি চুপ করে রইলাম।

রমা বলল, কথা বলছ না কেন? কথাটা কি মনঃপূত হলো না?

আমি বললাম, ঘুম পেয়েছে। তুমিও ঘুমোও।

রমা বলল, বুঝেছি। ঘুমোলাম। কাল ভোরে নটার আগে আমাকে তুলো না কিন্তু।

বললাম, আচ্ছা।

॥ পনের ॥

শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পরেই রমার নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

সুন্দরী মেয়েরাও যে কি বিশ্রী আওয়াজ করে নাক ডাকে তা যাঁরা স্বকর্ণে শোনেন নি তাঁরা বোধহয় জানেন না।

আমার ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। অনেক মাস পরে রমা আমাকে ওর শরীরে আসার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিল আজ রাতে। যদি একে নেমন্তন্ন বলা চলে।

কিন্তু আমার ঘেন্না হয়েছিল।

ঘেন্নাটা রমার উপরে ত বটেই, ঘেন্নাটা পুরো ব্যাপারটার অশ্লীল প্রস্তাবনার উপরও হয়ত বা।

আমি জানি না অন্য পুরুষরা এ বাবদে কি ভাবেন, জানি না এজন্যে যে, ব্যাপারটা এত ডেলিকেট ও ব্যক্তিগত যে তা নিয়ে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেও আলোচনা করার ইচ্ছা হয় নি কখনও।

মনে হয় যে, প্রত্যেকটি নারীই এক একটি তারের বাজনার মত—তাদের সুরে বাজালে তারা ভরপুর সুরে বাজে—তারা রবিশঙ্করের সেতারের মত গমগমে সুরে বাজে—কিন্তু তা না হলে আলাপ, বিস্তার, ঝালা সবই তখন বেসুরো। যাদের রসজ্ঞান আছে, সুরুচি আছে, তাদের কাছে সুরের আর অসুরের মধ্যে তারতম্যটা অনেকখানি।

যাঁরা বাজাতে হবে বলেই বাজাতে ভালবাসেন, এককথায়, যাঁরা কমপাল্‌সিভ বাজিয়ে, আমি তাঁদের দলে নই। যে-বাজনা আলাপের গভীর গম্ভীর অস্ফুট খাদ থেকে ঝালার চঞ্চল দ্রুতধাবমানা অস্থির আনন্দে শিহরিত অনুরণিত পঞ্চমে না পৌঁছয়, সে-বাজনা বাজাতে বা সেই বাজনায় সঙ্গত করতে আমি রাজী নই।

গানের সঙ্গে যেমন গায়কীর, সারেঙ্গীর সঙ্গে যেমন গায়কের, তেমন শরীরের সঙ্গে মনের পূর্ণ সমর্থন ও বোঝাবুঝি না থাকলে কারো শরীরে যাওয়ারই মানে নেই।

এতসব তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না আমি, এই সুকুমার বোস এ নিয়ে সোচ্চার চিন্তাও করত না। যদি না আমি ভুক্তভোগী হতাম; যদি না রমার এ ব্যাপারের অদ্ভুত শীতল ব্যাখ্যাহীন অশালীনতা আমাকে চিরদিন পীড়িত না করত।

শারীরিক সম্পর্ক ব্যাপারটাতে চিরদিনই গলদ্‌ঘর্ম কর্তব্যকর্ম যা ছিল, তা আমারই ছিল; রমা চিরদিনই একজন মহান, প্রাচীনা মহিলার মত তার গর্বিতা, দয়াবতী, কড়িকাঠ-গোনা প্যাসিভ ভূমিকায় কয়েক মিনিটের আড়ষ্ট অভিনয় শেষ করে এয়ারকণ্ডিশানার এবং দেওয়ালের নীরব টিক্‌টিকিদের (যারা তার কৃতিত্বের একমাত্র সাক্ষী থাকত) কাছ থেকে প্রচণ্ড হাততালি আশা করত।

জানি না, হয়ত আমি এই সুকুমার বোস, অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক, অতিমাত্রায় পারফেক্‌শনিস্ট বলে 'এই ব্যাপারটাকে' নিয়ে এমন মর্মান্তিক শীতল হেলাফেলা আমার কাছে ভণ্ডামিরই নামান্তর বলে মনে হত। যে ভণ্ডামি আমাদের দুজনকেই সুস্থ, স্বাভাবিক, খুশী জীবন থেকে পদে পদে বঞ্চিত করেছে।

আমি চিরদিনই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সম্মান করে এসেছি। কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁধতে চাই নি আমার কাছে, কারো উপর নিজের ইচ্ছা জোর করে চাপাই নি, বদলে এইটুকুই শুধু আশা করেছি যে, অন্য পক্ষও আমাকে এই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবে না।

রমার চরিত্রটা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ওকে বুঝতে পারি না।

ও এখন সীতেশের সঙ্গ চায়, অথচ সীতেশকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে চায় না। আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না, অথচ আমাকে স্বামী হিসেবে সমাজে প্রেজেণ্ট করতে চায়। কোনো ইম্প্রেসারিও যেমন করে ঘোঘল পাশা যাদুকর বা স্বামী শ্রীমৎ হঠযোগানন্দকে উপস্থিত করে, তেমন করে।

এই অবস্থাটা আমার পক্ষে নিতান্ত অস্বস্তিকর। একে মানিয়ে নেওয়া মুশকিল। আমার অসুখের আগে অবধি ছুটিই ছিল আমার সঙ্গে রমার মনোমালিন্যের একমাত্র কারণ। কিন্তু এবারে ছুটি সম্বন্ধে ওর এই ঔদাসীন্য আমাকে আশ্চর্য করেছে। কারণ এতে কোনো ভুল নেই যে, ছুটির সব খবরাখবর ওর নখদর্পণে। আমার মনে হয়, ওর মাইনে-করা অপেশাদার গুপ্তচর আছে এখন। তারা তাদের কাজে এমন দড় যে, সি-আই-এর বড়সাহেব জানতে পেলে অবিলম্বে তাদের মোটা মাইনেয় বহাল করতেন।

অথচ তবু সব জেনেশুনেও ওর এই ঔদাসীন্য আমাকে অবাক ও ব্যথিত করেছে।

এই সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে খাটে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

হঠাৎ সীতেশের সঙ্গে দেখা। ঘুমের মধ্যে।

আশ্চর্য!

দেখলাম সীতেশ কেতুর-চোখেই সিগারেট ধরিয়ে রোদে এসে দাঁড়াল।

লালি এসে আমাদের দুজনের চা দিয়ে গেল।

সীতেশকে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, তোরা হঠাৎ চলে এলি এখানে? খবর না দিয়ে?

সীতেশ হাসল। বলল, রমা বলল, চলো সরেজমীনে তদন্ত করে আসি।

আর তোর গার্লফ্রেন্ড সম্বন্ধে গুজবে কোলকাতার বাজার গরম।

তাই বুঝি? আমি বললাম। তারপর বললাম, তোর ব্যবসা কি বন্ধ করে দিয়েছিস না কি? কাজকর্ম নেই?

ও চমকে উঠল, বলল, ব্যবসা বন্ধ করব কেন? ব্যবসা চলছে।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ।

হঠাৎ সীতেশ বলল, রমা আসতে আসতে তোর কথা বলছিল। জানিস ত, শী ইজ ভেরী প্রাউড অফ ড্য।

আমি জবাব দিলাম না। তারপর বললাম, আর ডলি? তোর সম্বন্ধে ডলি প্রাউড না?

ফুঃ। ও বলল, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে। তারপর বলল, কি জানিস ত, ডলিকে ও যা চায় সবই আমি দিয়েছি—ওর বাইরে ওর কিছু চাইবার বা বোঝাবার নেই। ওকে নিয়ে আমার মস্ত সুবিধা এই যে, ও মনে করে ওর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে পৃথিবীতে হয় না। এবং সেখানেই আমার সুবিধা। বুঝলি সুকুমার, মেয়েদের বাড়তে দিতে হয়, সব সময় জানবি, মেয়েরা গ্যাস-বেলুনের মত। ওদের মধ্যে গ্যাস পুরোপুরি দিয়ে দেবার পর তুই বারান্দার রেলিং-এ শুধু সুতোটা বেঁধে রাখ। দেখবি উপরে যে চড়েছে সে আর নামতে পাচ্ছে না। তুই নিজে সুতো টেনে না নামালে আর নামতে পাচ্ছে না—তখন তুই ইচ্ছেমত তলায় চরে-বরে খা।

আমি বললাম, তুই যেমন খাচ্ছিস?

ও আমার দিকে ঘুরে বলল, হাউ ডু য়ু্য মীন?

আমি ওর বাঁ কানে হাত বুলিয়ে বললাম, তোর বাঁ কানটা ডান কানের চেয়ে বড় ছিল না? মনে আছে? এ নিয়ে কলেজের ছেলেরা ঠাট্টা করত। তোর এই বাঁ কানে পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেব—ডান কানের ফুটো দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে যাবে।

কি বুঝলি?

একটু থেমে বললাম।

সীতেশ অবিশ্বাসী গলায় বলল, হোয়াট?

আমি বললাম, চা খা। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সীতেশ অন্যমনস্ক গলায় চায়ে চুমুক দিল, বলল, কেন? তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—অন্যভাবে পরাস্ত কর আমায়।

আমি বললাম, তোর সঙ্গে লড়বার মত যথেষ্ট সম্মান তোকে আমি দিতে রাজী নই। বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কেউ কখনও লড়ে শুনেছিস? বিশ্বাসঘাতকদের জাপ্টে সাবড়ে দেওয়া হয়।

তোকে আমি ঘেন্না করি। রমার সঙ্গে তুই অন্তরঙ্গতা করেছিস বলে করি না, করি এই জন্যে যে তোকে আমি একদিন বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছিলাম। তুই সেই সম্পর্কের অমর্যাদা করেছিস। তোর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। বন্ধুত্ব যে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি তা তুই কখনও বুঝিস নি। তা তুই শেষের দিনে জানতে পাবি।

ঘুম ভাঙল চোখে আলো পড়তে।

তাড়াতাড়ি উঠলাম। বাড়িতে অনেক অতিথি।

বাবুর্চিখানার দিকে গিয়ে ব্রেকফাস্টের আয়োজন ঠিকমত করছে কিনা হাসান এবং লালি তা দেখে এলাম।

মুখটুখ ধুয়ে বাইরের রোদে পাইচারি করছি, দেখি, সীতেশ একটা চক্‌রা-বক্‌রা ড্রেসিং-গাউন গায়ে দিয়ে সিগারেটের টিন হাতে বেরিয়ে এল। দূর থেকে বলল, গুড মর্ণিং।

আমি হাসলাম। বললাম, রাতে ঘুম হয়েছিল?

ও বলল, দারুণ। তারপর বলল, জায়গাটা বেশ। তবে একা একা থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোর মত পাগলরাই পারে।

শুধোলাম, তোরা আজই ফিরে যাবি?

ও বলল, ও ইয়েস সার্টেনলি। লাঞ্চের ইমেডিয়েটলি পরেই।

ইতিমধ্যে ডলি ও মাধুরীও গরম ড্রেসিংগাউন পরে বেরিয়ে এল। ডলি বলল, এই সুকুমার —শিগগিরি চা—ভীষণ ঠান্ডা।

লালি চা নিয়ে এসেছিল—টী-কোজীতে কেটলি ঢেকে। চায়ের ট্রেটা বেতের টেবিলের উপর বসিয়ে রেখে গেল।

আমরা এক কাপ করে চা খেয়েছি এমন সময় রমা ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, বেয়ারা চায়ে লাও।

এখানে বেয়ারা কেউ নেই। যারা আছে তাদের প্রত্যেকের বাবা-মার দেওয়া একটা করে ভাল হোক খারাপ হোক নাম আছে। সেই নামেই আমি তাদের ডেকে থাকি। বেয়ারা বা বাবুর্চি কি আয়া বলে তাদের ডাকি না। কেউ ডাকলে কানে লাগে।

লালি যখন বেয়ারা বলে ডাকাতে বুঝতে পারল না, তখন আমিই এক কাপ চা ধানিয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে ওকে দিলাম। আর যাই হোক, রমা এইখানে আমার অতিথি। ওর জন্যে হাতে করে চা-টা নিয়ে যেতে খারাপ লাগল না। বরঞ্চ ভালোই লাগল। মনে হল, আমি মার্টিন লুথার কিং-এর মত ক্ষমাময় কেউ হয়ে গেছি।

ও বলল, বাবাঃ কত ঢঙ্। কি? লোকের সামনে ভালোবাসা দেখাচ্ছ?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম যে, চা-টা নিয়ে বাইরে এসো, বাইরে রোদ।

সীতেশ ওদের বলছিল, এইখানে একটা ওপেন-এয়ার বার থাকবে, আর ঐখানে বার-বি-কিউ হবে—ক্রিসমাস ইভে দুশো লোকের পার্টি দিতে বলব এখানে রমাকে। যদি তোমরা চাও ত এখানে একটা নাচের বন্দোবস্তও করা যেতে পারে। এবরিজিনালসদের দিয়ে।

আমি আসতেও সীতেশ বিন্দুমাত্র দমিত হল না। বলল, এসব জায়গা দলবেঁধে এসে হৈ-হুল্লোড় করার জন্যে—আদারওয়াইজ নো-গুড।

তিতিরগুলো ডাকছিল চতুর্দিক থেকে। টুনটুনি পাখি এসে রঙ্গনের ডালে দুলে দুলে অস্ফুটে কি কথা বলে চলে গেল বোঝা গেল না। বুলবুলিরা জোড়ায় জোড়ায় এদিকে ওদিকে ভর্‌র্‌-র্‌-র্‌র্‌-র্‌ করে উড়তে লাগল। টিয়ার ঝাঁক রোজ সকালের রুটিন মত পেয়ারা বনে এসে বসে ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল।

কিন্তু সীতেশের একতরফা বক্তৃতার জন্যে কোনো পাখির ডাকই আজ শোনা হল না।

মালু এসে সীতেশের গাড়িটা ঝাড়তে আরম্ভ করেছিল।

সীতেশ খেঁকিয়ে উঠল নেড়ি-কুত্তার মত। আমার দিকে ফিরে বলল, তোর লোকগুলো কি রে? মার্সিডিস গাড়িতে এরা জন্মে হাত দিয়েছে? এক্ষুনি রঙটার বারোটা বাজাত। গায়ে স্ক্র্যাচ পড়ে যেত। তারপরই বলল, যদি এখানে থাকিস আবো কিছুদিন ত এইগুলোকে ট্রেইন-আপ কর—এরকম সব জংলী লোক নিয়ে কাজ চলে?

আমি হাসলাম, বললাম, জায়গাটাও ত জংলী—এখানের মত জায়গায় আমাদের মত লোকের এ দিয়েই কাজ চলে যায়। তোদের মত লোকের জন্যে ত এ জায়গা নয়।

কিছুক্ষণ বিরতির পর সীতেশ বলল, বুঝলি সুকুমার, সেদিন তোর একটা গল্প পড়লাম, কোথায় যেন? কিছু মনে করিস না, তোর নায়কগুলো কেমন যেন মিনমিনে।

ডলি বলল, তার মানে?

সীতেশ বলল, মানে নায়ক নায়িকারা বাড়িতে গিয়ে পেঁছল, নায়িকার স্বামী বাড়িতে নেই—ট্যুরে গেছে। নায়িকা তাকে থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু নায়ক শুধু নায়িকার হাতে একবার হাত রেখেই চলে এল। আর কিছুই করল না।

তারপরই বলল, কিছু মনে করিস না, এর চেয়ে কোনো সীলি ব্যাপার ভাবা যায় না।

মাধুরী বলল সীতেশকে, ধরুন আপনিই যদি নায়ক হতেন ত কি করতেন?

সীতেশ হাঃ হাঃ করে হাসল অনেকক্ষণ, তারপর বলল, যা করতাম, তা নায়িকাই জানত, নায়িকা রেলিশ করত—তা কি অন্য লোককে বলে বেড়াবার?

ডলি খুব অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, সুকুমারবাবুর নায়কদের কিন্তু আমি বুঝতে পারি।
সীতেশ বলল, কি রকম? তাদের সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?
ডলি হেসে উঠল, বলল, তারা শুধু মনের কারবারী, তাদের শরীর নেই।
ওরা তিনজনেই সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠল।
আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগতে লাগল। রমার উপর প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল। রমা কোলকাতায় যা-ইচ্ছে-তাই করুক, তার যা প্রাণ চায়, আমি কখনও বাধা দিতে যাইনি। কিন্তু কতগুলো স্থূল শরীর-সর্বস্ব লোক সঙ্গে করে আমার এখানে আমার এই পাখি-ডাকা শান্তি বিঘ্নিত করার তার কোনোই অধিকার নেই। আজকে আর আমার উপর তার কোনো অধিকারই অবশিষ্ট নেই।
আমি বললাম, তোমরা চান-টান করে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নাও—আমি বাবুর্চিখানায় তাড়া দিয়ে আসি।
বাবুর্চিখানায় ওদের তাড়া দিয়ে আমি কারিপাতা গাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়েছিলাম।
ওদিকে ফিরে যেতে আমার ইচ্ছা করছিল না। স্থূলতার প্রতিবাদ স্থূলতা দিয়ে হয় না, সে প্রতিবাদে আমি বিশ্বাসও করি না।
আমার হঠাৎ মনে হল, ডলি এবং মাধুরীও রমার সঙ্গে সীতেশের যে একটা সম্পর্ক আছে তা জানে এবং জেনেও সেটাকে রেলিশ করে। এমনকি ডলিও করে।
ওরা হয়ত সকলে যুক্তি করেই আমাকে অপমান করার জন্যে এখানে এসেছে। আমি চীৎকার করতে পারি কিনা, অপমানে কাঁদি কিনা, রেগে নীল হয়ে যাই কি না, তা ওরা বোধ হয় দেখতে এসেছে।
কিন্তু ওরা জানে না, রমাও জানে না যে, জীবনে আমি এক নিজের পেটের কারণে ছাড়া অন্য কোনো রক্তক্ষয়ী প্রতিযোগিতায় নামতে চাই নি। এক প্রতিযোগিতাতেই আমি ফুরিয়ে গেছি। আমি লড়ব না, প্রতিবাদ করব না জেনেও ওরা কেন আমার মুখে মদ ছোঁড়ে?
ওদের সঙ্গে আমি ডুয়েল লড়ব না, কখনও লড়ব না। না-লড়ার কারণটা ওরা কখনও বুঝবে না। আমি ওদের বুঝিয়ে বলতে, নিজের এই নিদারুণ অপমান সহ্য কেন করি তা ওদের বুঝিয়ে বলতেও রাজী নই।
পিছনের নালাটায় রোদ এসে পড়েছিল।
কতগুলো হলুদ প্রজাপতি ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছিল ওদিকে। মালুর কালো-রঙা মেয়ে কুকুরটা বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় আশেপাশের বাড়ির কোনো একটা খয়েরী-রঙা মদ্দা কুকুর এসে তার পিছনে লাগল। কুকুরীটা প্রথমে বিরক্তি দেখাল, ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করল, তারপর কামড়াকামড়ি করল, সবশেষে পরাভূত অবস্থায় মদ্দা কুকুরটার প্রবৃত্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে পিছনের নালার অন্ধকারে নেমে গেল।
আমার হঠাৎ মনে হল, ডলি, সীতেশ এবং আরো অনেকে বোধহয় খুশী হত যদি সুকুমার বোসের নায়করা এই মদ্দা কুকুরটার মত হত। ওরা বোধ হয় একবারও বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না যে সুকুমার বোস, এই একজন সামান্য অখ্যাত লেখক মানুষদের নিয়েই লেখার চেষ্টা করে; কুকুরদের নিয়ে নয়।
মানুষদের জীবনেও এমন বহু প্রবৃত্তি আছে যা পশুদেরও আছে। কিন্তু আবার এমন কিছু মানুষদের আছে, যা পশুদের নেই; তা হচ্ছে মানুষের মন। বহু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিশীলিত হয়ে সে বস্তুটি আজ মানুষের জীবনের সবচেয়ে গর্বের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।
কি জানি, ঠিক বুঝতে পারি না।
যে-যুগে মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সে যুগেই কি মানুষ মানুষের মনের এক বিশেষ অংশে মানবিক সত্তা বিসর্জন দিয়ে পাশবিক সত্তা অনুরোপণ করার চেষ্টা কচ্ছে?
হঠাৎ রমা বলল, এখানে কি করছ?
রমা বাবুর্চিখানার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।
আমি বললাম, কিছু না।
রমা চান করে নিয়েছিল একেবারে। প্রসাধন করেছিল, দামী একটা বালুচরী শাড়ী পরেছিল, কানে মুক্তোর ইয়ার-টপ্, গলায় মুক্তোর মালা। রমার চুলে রোদ এসে পড়েছিল।
পেঁপে গাছের পাতায় বসে শালিক ডাকছিল। রমাকে খুব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

রমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছা করছিল দৌড়ে গিয়ে ওকে বুকের মধ্যে ধরি, ওকে বলি, আমার প্রথম জীবনের রমা, আমার জীবনের প্রথম নারী, প্রথম প্রেম রমা, তুমি ফিরে এসো, আমার কাছে ফিরে এসো—তুমি দেখো আমরা দুজনে—আমি আর তুমি দুজনে মিলে আবার নতুন করে সব আরম্ভ করব, ঘর বাঁধব সুখের ঘর, ফিরে এসো রমা।

ভাবলাম বলি, আমি ছুটিকে ভুলে যাব, তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করব, শুধু তুমি আমার কাছে তোমার সম্পূর্ণতায়, তোমার উচ্ছলতায়, তোমার সাবলীল বাধাবন্ধনহীন শরীরে এবং নিষ্কলুষ মনে ফিরে এসো আমার কাছে।

ইচ্ছে হল, ওকে চুমু খেতে খেতে বলি, এসো ক্ষমা করে দিই আমরা দুজনে দুজনকে—পুরানো জীবন বাতিল করে এসো একটা নতুন জীবন শুরু করি। এখনও বেলা আছে, এখনও সকালের আশাবাদী রোদ আছে; এখনও পথ আছে ফেরার।

রমা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল, বলল, তোমার রাতে ঘুম হয়নি?

হুঁ। বললাম আমি।

রমা বলল, আমি জানি তোমার কষ্ট আছে। কষ্ট হয় অনেক। কিন্তু তোমাকে কষ্ট পেতে হবে আরও। কারণ তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। কী কষ্ট দিয়েছ তুমি জানো না।

একটু থেমে ও বলল, আমি জানি আমি যা করেছি তা ভাল করিনি, কিন্তু তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে হাতের কাছে ওর চেয়ে ভাল হাতিয়ার আর কাউকে পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, আমার অপরাধ আমি জানি, কিন্তু তুমি একথা বলতে পারবে না যে, তোমাকে ঠকিয়ে আমি নিজেকে আনন্দিত করেছি। সেইসব পায়ে-দাঁড়ানোর দিনে তোমাকে যদি ঠকিয়ে থাকি ত সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ঠকিয়েছি। যা করেছি সে ত তোমার জন্যেও করেছি। আমার একার জন্যে ত করিনি?

রমা ঘৃণার সঙ্গে বলল, করেছ করেছ। তুমি যশ চেয়েছিলে। তুমি বড় স্বার্থপর। তুমি নিজেকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালোবাসোনি। তুমি কোর্ট করেছ, মক্কেল সামলেছ, তোমার সিনিয়রের প্রতি সিনসীয়র হয়েছ, তারপরও তুমি লেখক হয়ে নাম করতে চেয়েছ। কিন্তু কেন? এত স্বার্থপর তুমি কেন?

আমি ছোটবেলা থেকে লেখক হতে চেয়েছিলাম। এ দেশে কারো ইচ্ছাই ইচ্ছা নয়, ছিলো না। গুরুজনরা যা হতে বলেছিলেন, তাই-ই হতে হয়েছিল। নিজের মনের ইচ্ছাটা গুরুজনদের ইচ্ছা পূরণের পর বিকাশ করতে চেয়েছিলাম।

আর আমার ইচ্ছাটা? ইচ্ছা বলব না, বলব দাবী। আমার দাবী কি কিছুই ছিল না তোমার উপর? আমাকে কি তোমার লাইব্রেরীর তাকের রেফারেন্স বই ভেবেছিলে তুমি? ভেবেছিলে কোনোদিন কোনো মামলায় যদি প্রয়োজন হয় তবেই আমার পাতা খুলবে?

আমি চুপ করে রইলাম।

রমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, এসে বলল, ঐদিকে চল, কুয়োতলার দিকে।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে এ ক'মাস ছাড়াছাড়ি থেকে বোধহয় ভালই হল। তুমিও নিজেকে বুঝবার সুযোগ পাবে, আমিও পাব নিজেকে বুঝবার।

তোমাকে একটা কথা বলব? তোমার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। একটা ঘিনঘিনে করুণা হয়, কারণ তুমি অনেক টাকা রোজগার কর অথচ নিজের হাতে তোমার পাঁচ পয়সা খরচ করার অবকাশ নেই। তুমি যশ পেয়েছ অথচ সেই যশের কোনো মূল্য নেই তোমার নিজের কাছে। নিজের জীবনের মূল্যে কাউকে যদি যশ পেতে হয়, ত যশের দাম কি? যারা সেই যশ চায় চাক, তুমি চেও না।

হাজার হাজার লোক বলল, তুমি দারুণ সওয়াল কর, বলল, তুমি দারুণ লেখো, তোমাকে চিঠি লিখল, তোমার ছবি চাইল, তাতে তোমার কি? যখন তুমি ভীষণভাবে একা থাকো—যখন তুমি ভীষণভাবে কাউকে চাও তখন তোমার কোনো পাঠিকা কি তোমাকে আমি যা দিই. দিতে পারি, তা দেবে?

দেবে না। কেউ দেবে না। তারা বড়জোর তোমার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাবে, বন্ধুদের চোখ বড়-বড় করে বলবে, 'এ্যাই জানিস, সুকুমার বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।' ঠাট্টা করে বলবে, 'জানিস, আমার প্রেমে পড়েছে, হেড ওভার হীলস্।' তারা বড়জোর টেলিফোন করে তোমাকে

ন্যাকা-ন্যাকা কথা বলবে, তারা তোমার সত্যিকারের অভাব কখনও মেটাবে না; তোমাকে ভালোবাসবে না।

পাঠিকাদের ভালোবাসা পোশাকী ভালোবাসা, দামী শাড়ীর মতন, পার্টি শেষ হলে সযত্নে ন্যাপথলিন দিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে আলমারীতে তুলে রাখবে ওরা ওদের ভালোবাসা।

আমি চুপ করে ছিলাম। হঠাৎ রমাই বলল, আমি জানি, তুমি ছুটির কথা ভাবছ। মেয়েটা ভাল, হয়ত তোমাকে সত্যিই সে ভালবাসে, কিন্তু আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েরা ভালোবাসার কিছু বোঝে বলে আমার মনে হয় না। ওরা ওই গলায় ঝোলে, ঐ ঝুপ্ করে নেমে পড়ে দৌড় দেয়। এদের কোনো গভীরতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়—ভয় হয়, ছুটি যদি তোমাকে দুঃখ দেয়, সে দুঃখ তুমি সামলে উঠতে পারবে না। কারণ, তুমি আমার মত শক্ত নও।

আমি আগাগোড়া চুপ করেই ছিলাম। বললাম, আর সীতেশ? সীতেশ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

রমা হাসল। বলল, আমি জানতাম তোমার আত্মবিশ্বাস আছে, সীতেশ যে তোমাকে এমন পীড়া দেবে তা কখনও ভাবতে পারিনি আমি। তোমাদের এই পুরুষমানুষদের আমরা মেয়েরা মিথ্যাই ভয়-ভক্তি করি। তোমরা আসলে কাঁচের চেয়েও ঠুনকো। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার আত্মবিশ্বাস যদি এতই কম, তাহলে জীবনে সাক্‌সেসফুল হলে কি করে? কিসে ভর করে?

আমি বললাম, তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।

ও বলল, বলছি, তোমার বন্ধু সীতেশ একটি আস্ত সিলী-গোট। একটি বাবার পয়সায় বসে-খাওয়া আকাট বুড়ো-খোকা। তুমি জাস্ট দেখে নিও, ওর কি অবস্থা করি আমি। ও কেঁদে কূল পাবে না। ছুটি যেমন তোমাকে ভালোবাসে, আমি ওকে তেমনি করে ভালোবাসি। আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে—গিল্‌টি-করা গয়নাকে কিভাবে সোনা বলে চালানো হয়, তাই শিখছি।

একটু থেমে বলল, তোমার কথা বলতে পারি না, আমি কিন্তু আমার পার্ট দারুণ এনজয় করছি। ইটস্ গ্রেট ফান্। আই উইশ, তুমিও তোমার এই মিথ্যা এ্যাফেয়ারটা পুরোপুরি এনজয় করো।

রমার কথা ভাল করে আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রমা স্বগতোক্তি করল, বলল, টাইম ইজ আ গ্রেট হীলার। ছ'মাস ছাড়াছাড়ি না-থাকলে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়াত আমি জানি না। আজ দারুণ লাগছে। মনে হচ্ছে আমাদের হানিমুনের কোনো সকাল। জানো সুকু, আমি জানি, আমি কনফিডেন্টলি জানি যে, তুমি আমার এবং চিরকাল আমারই থাকবে। আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নেয় এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। ছুটিকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমার আত্মবিশ্বাস আছে। তোমারও যদি আমার সম্বন্ধে এই আত্মবিশ্বাসটুকু থাকত ত আমি খুশী হতাম। এ সম্বন্ধে তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকাটা আমার পক্ষে অপমানকর।

ওরা বাইরের পেয়ারাতলায় ব্রেকফাস্ট ঠিকঠাক করে লাগাচ্ছিল, হঠাৎ রমা বলল, তুমি কাল রাতে রাগ করেছিলে? না?

আমি মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। বললাম, না। রাগ করব কেন?

ও বলল, এখন যাবে?

ওর চোখ আনন্দে নেচে উঠল। এই রমাকে আমি চিনতাম না। হয়ত কখনও চিনতাম; কিন্তু ভুলে গেছিলাম।

ও বলল, বাথরুমের দরজা দিয়ে বেডরুমে চলে যাই। ওরা কেউ জানতে পারবে না—বলেই রমা আমাকে টেনে নিয়ে বেডরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার মন চাইছিল না, কিন্তু রমার এমন একটা খুশীর মুহূর্তকে আমি ফুঁ দিয়ে নিবাতে চাইনি।

তারপর আমার মনে নেই।

যা মনে আছে তা এই যে, অনেকদিন ভুলে যাওয়া, ফেলে-আসা কোনো নির্জন সুগন্ধী

পাহাড়তলীতে আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী রমার হাত ধরে আমি গিয়ে পেঁছেছিলাম।

অনেকগুলি বিস্মৃতপ্রায় বোধ, অনুভূতি, অনেক আশ্চর্য অবাক আরাম আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। যে কোষাগারের নরম দরজা বহু বছর খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেই কোষাগার হঠাৎ এই আলো-ঝলমল সকালে খুলে গেছিল। মণি-মাণিক্যে, হীরে-জহরতে চোখ ঝলসে উঠেছিল।

শরীর; দুটি বাঙ্ময় শরীর তাদের নিজেদের বিশেষ বিনোদনের বিভাসে স্বর্গরাজ্যের বীণার মত বাজছিল। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, আরতির শব্দ সমস্ত মিলে মিশে সেই পারিজাত-পাহারতলীর প্রথম সকাল এক বিস্মৃত ভরন্ত ভালোলাগায় ভরে দিয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা যখন গাড়িতে উঠছিল, রমা হঠাৎ আমাকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, কাল রাতে সীতেশের সঙ্গে যখন বাইরে গেছিলাম তখন সত্যিই কিন্তু ও পথ হারিয়ে ফেলেছিল। মাথার চুল আমি নিজেই এলোমেলো করে দিয়েছিলাম, হাত দিয়ে টিপ লেপ্টে দিয়েছিলাম। সীতেশ বলেছিল, ওরকম করছ কেন? আমি বলেছিলাম চুলের মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে।

তারপর বলল, যাইই করে থাকি তোমার মুখ দেখে বুঝেছিলাম তুমি যা মনে করবে ভেবেছিলাম, তাই ভেবেছ। তোমার মনটা বেশ ছোট, যাইই বল।

এক সময় সীতেশের বেগুনীরঙা মার্সিডিস ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

আমি অনেক, অনেকক্ষণ বাগানের চেয়ারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম।

মনে হলো, এই একদিনে আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেলো। ঝড়টা বসন্ত-বাতাসের না শিলা-বৃষ্টির এক্ষুনি তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই।

॥ ষোল ॥

সকালবেলা মালুকে পাঠিয়েছিলাম দীপচাঁদের দোকানে রসদ আনতে। ও গেছে অনেকক্ষণ। রোদ বেশ তেতে উঠেছে। আমি গাছতলায় বসে, ব্রেকফাস্ট খাবার পর চিঠি লিখছিলাম, এমন সময় লালির ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে খবর দিল, মালুকে ধরে কারা যেন খুব মারছে পিছনের মহুয়াতলার মাঠে।

লেখা ফেলে যত জোরে পারি দৌড়ে গেলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে লালিও এল উদ্‌ভ্রান্তের মত। হাসান রান্নাঘরে পেঁয়াজ কাটছিল, পেঁয়াজ কাটা ছুরি হাতে ও-ও সঙ্গে দৌড়ে এল।

আমরা পিছনের উঁচু ডাঙ্গায় উঠে, একটা ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করলাম।

মালু অনেক দূরে ছিল।

যে-মাঠে একসময় সর্ষেক্ষেত হলুদ হয়ে থাকত, এখন তা ফাঁকা, বিবাগী। বড় বড় ঝাঁকড়া মহুয়াগাছগুলোর নীচে অতবড় টাঁড়টা বুকের উপর পিটিসের এলোমেলো ঝোপ নিয়ে সকালের রোদে ধু-ধু দাঁড়িয়ে আছে।

দূরে দেখা গেল মালু আর বুধাই এদিকে হেঁটে আসছে।

ওদের পিছনে সেই সাদা ভূতুড়ে বাড়ির কাছে একটা জটলা মত।

দূর থেকে চেঁচামেচি ভেসে আসছে।

মারামারি যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে তখন।

লালি ও হাসান মালুর দিকে দৌড়ে গেল। আমি ঢিপিটাতে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ওরা এলে ব্যাপারটা জানা গেল।

মালুর একজোড়া হালের বলদ আছে। খরার সময় ওর খুব অভাব হওয়াতে বছরখানেক আগে ও এখানকার একজন লোকের কাছে বলদ দুটো জমা রেখে একশ ত্রিশ টাকা ধার নিয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই টাকার মধ্যে আশী টাকা সে শোধ করে দেবার পর পঞ্চায়েতে দরবার করে ওর বলদ দুটো ফেরত নিয়ে এসেছিল। কথা ছিল, বাকি পঞ্চাশ টাকাও সে শোধ করে দেবে।

কিন্তু সব কথা রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। মালুর পক্ষে ত সম্ভবই ছিল না। উপায়

ছিল না।

হাটে-মাঠে যখনি মালুকে সেই লোকটি ও তার জোয়ান ছেলে দেখতে পেত তখনি গালাগালি করত। কিন্তু মালু মাথায় পাগড়ি ঝুলিয়ে, গায়ে গণ্ডারের চামড়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াত। ইচ্ছা থাকলে যে সে টাকাটা দিয়ে দিতে পারত না তা নয়, কিন্তু চট্ করে পারত না। সঞ্চয় বলতে, ওদের কিছুই থাকে না, তাই পঞ্চাশ টাকা দেওয়া মুখের কথা নয়।

কিন্তু তবুও প্রতি শুক্রবার মহুয়া খাওয়া মালুর ঠিকই ছিল। গালাগালি খাওয়ার পর বোধহয় মহুয়ার নেশাটা আরো জমত ভাল। হয়ত নেশা করত, ভালো লাগার চেয়েও সবকিছু ভুলে থাকার জন্যেই বেশী করে।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। ওদের কর্তব্য ছিল গালাগালি দেওয়া এবং মালুর কর্তব্য ছিল তা ডান-কান দিয়ে শুনে বাঁ-কান দিয়ে বের করে দেওয়া। এই নিষ্পাপ প্রক্রিয়ায় একপক্ষের গলার জোর বৃদ্ধি এবং অন্য পক্ষের শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি কারোরই হচ্ছিল না।

গোলমাল বাঁধল যখন হাটের মধ্যে সেই লোকটির জোয়ান ছেলে বুধাইর শাড়ি ধরে টানাটানি করতে লাগল। এরকম দু-তিনবার নাকি হয়েছিল। বধির মালুকে কিছু বলে লাভ নেই জেনে, ওরাও মেয়েটাকে নিয়ে পড়েছিল। হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গার মত, হাটে ইজ্জৎ-নষ্ট করার অসাধু অভিপ্রায়ে ওরা নাকি দু-তিনদিন অমন করেছিল। কিন্তু জায়গাটা হাট বলে এবং ব্যাপারটার মধ্যে ভয়-দেখানোর ইচ্ছাটা যত প্রবল ছিল, প্রবৃত্তিটা তত ছিল না বলে, এবং বুধাইও ব্যাপারটা 'ইটস্ অল ইন দা গেম্' বলে নেওয়াতে এত কিছু করেও মালুর কাছ থেকে টাকা ওরা ফেরত পায়নি।

তাই আজ মালুকে পথে একলা পেয়ে বাপ-বেটা মিলে ওকে বেদম প্রহার করেছিল।

মালুর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, রক্ত বেরোয়নি বটে কিন্তু ভীষণ মার খেয়েছে ও। মাথার পাশে, রগের কাছে রীতিমত ফুলে উঠেছে। এবং মালু এমনভাবে হাঁটছে যে, মনে হচ্ছে ও মহুয়া খেয়েছে।

সরল সাদা-মাটা নির্বিরোধী লোকটা ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় একেবারে হকচকিয়ে গেছে।

এর প্রতিকার কিছু একটা করা উচিত।

প্রতিকারটা কিভাবে করা যায় তাই ভাবছিলাম। এর যোগ্য প্রতিকার হত, যদি ওদের টাকাটা শোধ দেওয়ার পর, মালুকে ওরা যেমন করে মেরেছে ওদের তেমন করে হাতের সুখ করে মারা যেত। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, আমার বদরক্তের দোষে।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি ঘরে জন্মে আমরা বই পড়তে শিখেছি, মনের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তা কাগজে-কলমে ফুলঝুরির মত উৎসারিত করতে শিখেছি। কিন্তু এক ধরনের লোক আছে, যাদের কাছে আমাদের এই ধরনের প্রতিবাদের কোন দাম নেই, কোনো ফল নেই। তাদের কাছে এরকম প্রতিবাদ হাস্যকর ভীরুতা ছাড়া কিছুই নয়। তারা যেমন লাঠি দু' হাতে ধরে কারো মাথায় সশব্দে বসানোকে তাদের অধিকারের সুস্থ বিকাশ বলে মনে করে, দুহাতে লাঠি ধরে তাদের মাথায় মেরেই শুধু তাদের তেমন শিক্ষা দেওয়া যায়। সেটাই তাদের একমাত্র শিক্ষা। অন্য কোনো ভাষা তারা বোঝে না।

যাই হোক, হাসানকে তক্ষুনি পাঠালাম। যারা মালুকে মেরেছে তাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলতে। দেখা করতে বললেই যে তারা দেখা করবে এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। কারণ আমি সেকালের জমিদার বা একালের এম-এল-এ নই, আমি কারোরই বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আর ক্ষতিই যদি কেউ কারু না করতে পারে, না-করার ক্ষমতা রাখে, ত তাকে মানে কোন্ বোকা লোকে? ক্ষমতা মানেই ত' আজকাল ক্ষতি করার ক্ষমতা।

কিন্তু হাসান এসে বলল যে, তারা আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বুঝলাম, লোকগুলো আর যাই হোক, বোকা নয়। তারা আমাকে কোনোরকম খাতির দেখানোর জন্যে মোটেই আসছে না—তাদের সিক্সথ সেন্সে তারা বুঝে গেছে যে আমি যখন বাড়ির মালির সঙ্গে অন্য লোকের ঝগড়ায় নাক গলিয়েছি, তখন তার একটা মাত্রই মানে হতে পারে। মানে হচ্ছে, মালুর ধার আমি শোধ করে দেব।

মালুকে কোডোপাইরীন খাইয়ে, গরম চা খাইয়ে সুস্থ করলাম।

কিছুক্ষণ পর ওরা দুজনে এবং ওদের বস্তীর আরো কজন লোক এসে হাজির হল গেটের

সামনে।

ওদের ভিতরে আসতে বললাম।

দেখলাম, খুব শক্ত-সমর্থ চেহারার লোক দুটি।

হাসান বলল, এরা হাসানের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অথচ হাসানের সঙ্গে এদের চেহারা ও কথাবার্তার কোনো মিল নেই। হাসান শান্ত, সভ্য এবং বিনয়ী এবং এই লোকদুটো উদ্ধত, উগ্র, এবং দুর্বিনীত।

লোকদুটো এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, শুধোল, কিসের জন্যে তাদের ডাকা হয়েছে? যেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে, এমন ভাব ঝরে পড়ল ওদের গলার স্বরে।

আমি বললাম, তোমরা ওকে মারলে কেন?

ওরা বলল, সেটা আমাদের ব্যাপার।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

যারা সকলের সঙ্গে এবং কাছ থেকেই ভদ্র-সভ্য ব্যবহার করে, পায় ও প্রত্যাশা করে; তারা যখন কারো কাছ থেকে নিষ্প্রয়োজনীয় খারাপ ব্যবহার ও অধিকারহীন ঔদ্ধত্যের ধাক্কা খায় তখন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই কুঁকড়ে যায়—হয়তো মনে ভাবে, এই খারাপত্বের সঙ্গে নিজেকে সমান করে কি হবে? তাতে নিজের সম্মানই নষ্ট হবে শুধু।

কিন্তু সুকুমার বোস চিরদিনই এইসব সিচুয়েশান দারুণভাবে রেলিশ করে এসেছে।

অসুখের পর, অনেকদিন নিরামিষ, ঘটনাহীন নিস্তরঙ্গ জীবনের পর হঠাৎ ভারী আনন্দ হল। মনে হল, অনেকদিন পর আমি একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কেবলমাত্র নিছক শারীরিক শক্তির ক্রুড নগ্ন প্রকাশের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াবার একটা সুযোগ পেলাম।

আমি বললাম, মালুর কাছে তোমাদের কত টাকা পাওনা আছে?

ওরা বলল, ছিল পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু সুদে বেড়ে একশ পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।

আমি অবাক গলায় বললাম, এক বছরে পঞ্চাশ টাকা সুদে বেড়ে একশ পঞ্চাশ টাকা হয় না।

ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে বলল, হয়। এখানের এইরকমই নিয়ম। এখানে এইরকমই হয়ে থাকে।

বললাম, মালু যদি টাকা শোধ না দিতে পারে?

তবে ওকে মারব, আবার মারব; দরকার হলে জান নিয়ে নেব।

অবাক হয়ে বললাম, জান নিয়ে নেবে? পুলিশ নেই?

ওরা হাসল। বলল, পুলিশ ত খিলাড়িতে থাকে। আসতে আসতে, খবর পাঠাতে পাঠাতে, অনেক ঘণ্টা। তাছাড়া কেউ কাউকে সাক্ষী রেখে ত খুন করবে না। ওসব পুলিশ-ফুলিশের ভয় আমরা পাই না—ওসব আপনাদের জন্যে, ভদ্রলোকদের জন্যে। আমরা ছোটলোক।

ওদের বললাম, শোনো, পুলিশের ভয় আমিও পাই না। তোমরা যদি নিজেদের ছোটলোক বলে বাহাদুরী করতে চাও ত জেনে রাখ, আমিও ছোটলোক। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোক; ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোক।

ইতিমধ্যে লালি কি একটা কাজে এদিকে এসেছিল।

ওকে দেখতে পেয়েই ছেলেটা একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল।

গালাগালি দিতেই আমার মধ্যের গোপন প্রতিবাদকারী মানুষটা তার নিরুদ্ধ উৎস থেকে চকিত ফোয়ারার মত বাইরে এল। আমার অজানিতে আমার ডান হাতটা উপরে উঠে গিয়ে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় হয়ে ছোকরাটার গালে পড়ল।

বদমাইস ছোকরা একবার চমকে উঠল, তারপরই বুনো শুয়োরের মত রাগে ফুলে উঠে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল।

যে দশ-পনেরো জন লোক আমাকে ঘিরে ছিল তারা এমন বেড়াতে-আসা, ছিপছিপে, চশমাপরা ভদ্রলোকের কাছ থেকে এতবড় একটা ছোটলোকী কর্ম আশা করেনি।

তারা সকলেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, এখানে দাঁড়াও। আমি টাকা নিয়ে আসছি।

লোকগুলো স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ভিতর থেকে পঁচাত্তর টাকা এনে বুড়োর হাতে দিলাম। বললাম, পঞ্চাশ টাকা ধার;

পঁচিশ টাকা সুদ, এটাই বেশী। এর বেশী এক পয়সাও পাবে না। আমি সালিশী করতে ডেকেছি তোমাদের শুধু এই জন্যেই; তোমাদের বেশী দেব না।

তারপর বললাম, এই টাকা নিয়ে চলে যাও। ভবিষ্যতে, এদের গায়ে হাত দিও না। যদি দাও ত বুঝবে যে, আমিও তোমাদেরই মত থানা-পুলিশে বিশ্বাস করি না। তোমরা যদি করতে, তাহলে হয়ত করতাম। তোমরা যখন না-করাটাকে বাহাদুরী বলে মনে কর, আমিও তাই করি। শুধু একটা কথা জেনে যাও যে, যদি আমার কথা না-শোনো তবে পরিণাম ভাল হবে না। তখন জানতে পাবে যে, আমি তোমাদের চেয়েও বড় ছোটলোক; বুঝেছ?

লোকগুলো চলে গেল। ছোকরাটা যাওয়ার সময় বার বার আমার দিকে পিছন ফিরে দেখতে লাগল।

ওরা চলে যেতে লালি দৌড়ে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবু এমন কেন করলেন? আমাদের জন্যে আপনি কেন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন? আমাদের এরকমই জীবন। এইরকম গালাগালি, মারামারির মধ্যেই আমরা ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, এইসব অসম্মান আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। এর জন্যে যদি আপনার কোনো বিপদ হয় তাহলে কি হবে। তাছাড়া কোনো সাহেব, কোনো বাবুরাই ত এমন করে আমাদের ছোটলোকদের ঝগড়ায় নিজেরা জড়ান না, কোথাওই জড়ান না, তাহলে আপনি কেন জড়ালেন?

আমি হাসলাম। বললাম, আমি ভদ্রলোক তোমাকে কে বলল?

তারপর লালিকে আমার জন্যে একটু চা নিয়ে আসতে বললাম।

হাসান এসে চুপ করে হাতের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে।

ওর সাদা উর্দির উপরে পেয়ারাগাছের কালো ছায়া কাটাকুটি করছিল। ওর কাঁচা-পাকা দাড়িতে রোদ পড়েছিল। হাসান বলল, ঐ ছোকরাটা গুণ্ডা, কাজটা আপনি ভাল করলেন না।

আমি হাসলাম, বললাম, তুমি আমাকে ভেবেছ কি? আমিও কি কম গুণ্ডা? আমার নাম সুকুমার গুণ্ডা। এক গুণ্ডা অন্য গুণ্ডাকে কি করবে?

ওরা চলে গেলে আমার ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। সকালের রোদ, ছায়া, পাখির ডাক, চতুর্দিকের এই সুস্থ সবুজ শান্তি আমাকে বলতে লাগল, 'ঠিক করেছ সুকুমার, তুমি ঠিক করেছ।'

অনেক অনেকদিন পর এই প্রায়শই বেঠিক জীবনে একটা যথার্থ ঠিক করায়, আমার মনের মধ্যের ছেলেমানুষ মনটা আনন্দে হাততালি দিয়ে আমাকে বাহবা দিতে লাগল।

ডান হাতের পাতাটা তখনও জ্বলছিল। থাপ্পড়টা সত্যিই প্রচণ্ড জোরে মেরেছিলাম। আমার হাতে এত জোর কিভাবে এল নিজেই তা ভেবে পেলাম না। হাতের পাতাটা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

লালি যখন চা নিয়ে এল, লালিকে শুধোলাম, ঐ লোকগুলো কোথায় থাকে?

লালি বলল, স্টেশানে যাবার পথের পাশেই ওদের বাড়ি। তাইত মালুকে ওরা পথের পাশে পেয়ে অমন মারল।

আমি বললাম, ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।

চা খেতে খেতে হঠাৎ আমার ভয় ভয় করতে লাগল। যা একটু আগে করলাম, করে ফেললাম, সেটা ভাল করলাম না বলে মনে হতে লাগল।

হয়ত চিরদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে একাই দাঁড়াতে হয়। আজকাল ত নিশ্চয়ই। এবং আজকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে বুক কাঁপে না এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়।

হঠাৎই রোদে বসে বসে চা খেতে খেতে আমার শীত করতে লাগল। বুঝতে পারলাম যে আমার ভয় করছে, ভয় করতে শুরু করেছে।

ভয় একবার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করলে দেখতে দেখতে তা অতিকায় রূপ নেয়, সে যে-ভয়ই হোক না কেন। তাই ভয়কে বড় হবার আগেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

চা শেষ করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম, পিছনের গেট খুলে সেই মহুয়াতলার মাঠের দিকে চললাম।

আমার অন্য কোনো গন্তব্য ছিলো না। একমাত্র গন্তব্য ছিল ভয়ের বিপরীত মুখে।

গাছগুলো পেরিয়ে ঘরগুলোর পাশের রাস্তায় পড়লাম। আর একটু এগোলেই ওদের বস্তী। ভুতুড়ে বাড়িটা পেরিয়ে যখন ওদের বস্তীর পাশে এসেছি, তখন পথে কাউকে দেখলাম না।

যখন একেবারে বস্তীর সামনে চলে এসেছি তখন হঠাৎ সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল।

ও একটি বছর দেড়েকের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে উঠোনে একটি কাঠের গুঁড়ির উপর বসে ছিল। আমাকে দেখেই ও চমকে উঠল—মনে হল ও দাঁড়িয়ে উঠবে অথবা দৌড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে আঘাত করবে। ওর চোখে আগুন জ্বলছিল।

আমি যেন ওকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরিনি এমন ভাবে রাস্তা ধরে এগোতে থাকলাম। আমার চোখ ছেলেটার চোখে লেগে রইল। আমি যখন ওদের উঠোনের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি, হঠাৎ আমার মনে হল, আমার বুকের অস্বস্তিকর ভয়টা হঠাৎ আমার বুক ছেড়ে উধাও হয়ে যেন ঐ ছেলেটির বুকেই সেঁধিয়ে গেল।

ছেলেটা চোখ নামিয়ে নিল, নিয়ে যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি, এইভাবে মাটির দিকে চেয়ে রইল।

এই নিঃশব্দ, অপ্রচারিত ভয়-জয়ের খবর আর কেউ জানল না।

কেবল আমি জানলাম এবং আমাকে যে ভয় পাইয়েছিল, সে জানল।

অতদূর যখন এলামই, তখন ভাবলাম স্টেশানে একবার ঢুঁ মেরে যাই।

স্টেশানে পৌঁছেই দেখি সেখানে হুলুস্থুলু কাণ্ড। আজ নাকি স্টেশান ইন্সপেকশান হবে। তাই এত তোড়জোড়।

সমস্ত প্লাটফর্ম ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। পয়েণ্টসম্যান, গ্যাংম্যান সকলে একেবারে ঝকঝকে তকতকে পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কি মাস্টারমশাইও লুঙ্গি গেঞ্জী ছেড়ে, বোতাম-আঁটা কোট প্যাণ্ট পরে ত্রস্ত হয়ে আছেন। পানিপাঁড়ের জলের মগও ঝকঝকে করে মাজা হয়েছে। স্টেশান রুমের ভিতরে সব ছবির মত। সিংবাবু ফোন ধরে কোন স্টেশানকে যেন ক্রমাগত ডেকে চলেছেন আকুল হয়ে,—পত্রাতু বা বাড়কাকানা। মাঝে মাঝে তাঁর গলা শোনা যাচ্ছে—ম্যাকলাসকি, ম্যাকলাসকি, ম্যাকলাসকি।

মিসেস কার্নির দোকানও আজ ঝকঝক করছে। মাটির খুরি, কাপ-ডিস সমস্ত গোছানো রয়েছে। ছেলেগুলো, যারা সিঙাড়া চপ ভাজে, তারাও সব জামাকাপড় কেচে পরেছে।

মিসেস কার্নিও একটা হালকা গোলাপি গাউন পরে, ভাল জুতো পরে, সংকটে-পড়া হিটলারের মত পিছনে হাত দিয়ে প্লাটফর্মে তাঁর দোকানের সামনে পায়চারি করছেন।

বাড়কাকানার দিক থেকে একটা কয়লা-বোঝাই ডিজেল এঞ্জিনে-টানা মালগাড়ি এসে দাঁড়াল। ওয়াটারিং-পয়েণ্টের কাছে তার মুখ রইল—আর তার লম্বা খয়েরী শরীরটা বিছিয়ে রইল ঐদিকের ক্যাবিন পর্যন্ত। এই ডিজেলগুলো এমন নিঃশব্দে চলে যে, যতক্ষণ না কাছে চলে আসে ততক্ষণ বোঝাই যায় না যে এল।

এখানের নীচু কাঁকর-ফেলা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ডিজেল ট্রেনের দিকে চাইলে মনে হয় এক সারি একতলা খয়েরী বাড়িকে টেনে নিয়ে একটা দোতলা বাড়ি চলে যাচ্ছে। এরা সব সময় হুইসেলও বাজায় না। যখন বাজায় তখন মনে হয় মেঘলা দুপুরের কোনো বিরহী বাইসন বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই ধাতব দীর্ঘশ্বাসের শব্দ চারিদিকের বন পাহাড়ে অনুরণিত হয়ে ফেরে।

আউটার পয়েণ্ট ছাড়িয়ে বরাবর বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে চাট্টি নদীর ব্রিজ পড়ে। তার পাশে চাট্টি নদীর দহ। সাহেবদের যখন খুব রবরবা ছিল তখন এখানে সাঁতার কাটতে এবং পিকনিক করতে আসতো সাহেব-মেমরা। এখন বড় একটা কেউ আসে না।

কিছুদিন আগে এই নদীর কাছেই একটা গুহার মধ্যে ভালুক ছানার ফটো তুলতে সাহায্য করতে গিয়ে থ্রুপ্ সাহেবকে ভাল্লুকে জখম করেছিল। তাঁর বন্ধু ক্যামেরা নিয়ে গেছিলেন, উনি বন্দুক নিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। যখন দুজনেই গুহার দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়েছিলেন, ভাল্লুক তখন পিছন থেকে এসে ওঁকে আক্রমণ করে জখম করে দেয়। কয়েকমাস ওঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

মিসেস কার্নিকে খুব চিন্তিত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। উনি কাছে আসতেই বললাম, কি হল? এত চিন্তা কিসের?

উনি টেনে টেনে বললেন, আমার এই দোকান এখানে থাকুক তা অনেকেই চায় না। অনেক ব্যবসায়ী আমার নামে মিথ্যামিথ্যি কমপ্লেন করেছেন যাতে আমার ভেণ্ডর-লাইসেন্সটি বাতিল হয়ে যায়। অথচ কি করে যে আমি চালাই তা আমিই জানি। এই বাজারে রাঁচী থেকে ময়দা

জোগাড় করতে হয়—তারপর রুটি বানিয়ে বিস্কিট বানিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রী করা, তাও কোনো-রকমে চলে যাচ্ছে একমাত্র খিলাড়ির কারখানার জন্যে।

আমি শুধোলাম, কেন? কারখানার জন্যে আপনার কি লাভ?

উনি বললেন, বাঃ, কারখানার ক্যান্টিনে নিয়মিত রুটি দিই যে আমি। সপ্তাহে একদিন করে নিজে যাই পেমেণ্ট আনতে। আমি ত একদমই একা, আমার খুঁটি ত কেউ নেই, পয়সার জোরও নেই, তাই আমাকে কোনো অজুহাতে এখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারলে কোনো ব্যবসায়ী এই স্টলে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করতে পারে। ভগবান ছাড়া আমার সহায় কেউই নেই।

দেখতে দেখতে সারা স্টেশানে একটা হৈ হৈ রব উঠল। দেখবার মত দৃশ্য। দূরে থেকে একটা ট্রলি আসতে দেখা গেল।

ট্রলির উপর লাল-নীল ছাতা। কুলীরা এক একবার নেমে পড়ে ঠেলছে এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় তড়াক করে লাফিয়ে পিছনে উঠে পড়ছে।

খাকি হাফ-প্যান্ট পরা মোটাসোটা এক ভদ্রলোক শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ট্রলি থেকে নামলেন—তার সঙ্গে রোগা রোগা দুজন ভদ্রলোক।

পরে আরো দুটি ট্রলি এল পর পর। ট্রলিগুলো সবই ডালটনগঞ্জের দিক থেকে এল। এ'রা কারা আমি জানি না, তবে এ'রা যে রেলের অফিসার তা বুঝলাম।

মাস্টারমশাই এগিয়ে এসে হ্যান্ডসেক করলেন, এ-এস-এমরা সকলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ওঁদের কি সব দেখালেন। শুনলাম, এ'দের মধ্যে একজন খুব বড় অফিসার—উনি কাছাকাছি কোন বড় স্টেশানে সেলুন-এ ক্যাম্প করে আছেন। সারাদিন ইন্সপেকশান করছেন এ অঞ্চলের স্টেশানগুলো।

ওঁরা স্টেশান-রুমের মধ্যে ঢুকে কীসব কাগজপত্র চেক করলেন।

আমি মিসেস কার্নি'র দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে এইসব সাংঘাতিক ক্রিয়াকান্ড প্রত্যক্ষ করছিলাম।

যাঁরা ইন্সপেকশান করছিলেন—এই ছোট্ট ছবির মত জঙ্গল-ঘেরা স্টেশানটি, তাঁদের মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল এ'রা প্রত্যেকে এক একজন জেনারেল রোমেল—মরুভূমির মধ্যে যেন ট্যাঙ্ক-বাহিনী ইন্সপেকট করছেন।

ওঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই বোধহয় বড়সাহেব। তাঁর মুখ দেখে তাঁকে বিলক্ষণ ভদ্রলোকই মনে হচ্ছিল। মিসেস কার্নি'র দোকানের সামনে ওঁরা যখন এলেন তখনও আমি উঠে দাঁড়ালাম না দেখে ওঁদের মধ্যে একজন বেশ কটমটে চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমার খুব মজা লাগল।

আমি শুধু ওঁর কেন, আমি যে কোন লোকেরই চাকরী করি না, আমি যে স্ব-নিয়োজিত একজন কর্মচারী একথা মনে পড়ে খুব ভাল লাগল। চাকরী, সে যতবড় চাকরীই হোক, তা চাকরীই। তাতে গ্লানি থাকেই—এ জীবনে সেই গ্লানি থেকে যে মুক্তি পেয়ে গেছি এ কথাটা নতুন করে মনে হয়ে ভাল লাগল।

সেই ভদ্রলোক চোখে চোখ পড়তেই হাসলেন, বললেন, ভাল?

আমিও হাসলাম, বললাম, ভালো।

অথচ উনি আমাকে চেনেন না এবং আমিও ওঁকে চিনি না।

মনে হল, এমনি কোনো সুন্দর রোদ-ঝলমল সকালে কাউকে না চিনলেও, কারো কাছে কোনো কাজ না থাকলেও, একজন চেয়ে থাকলে এবং অন্যজনের কাজ ছেড়ে চোখ তোলার মত অবকাশ থাকল নিশ্চয়ই এমনি করে 'ভালো' বলা উচিত। ইংরিজী হ্যালোর চেয়ে আমাদের ভালো অনেক ভালো।

মনে মনে ভদ্রলোকের তারিফ করছিলাম। কারণ ভদ্রলোক এতবড় অফিসার হয়ে গিয়েও এখনও ভদ্রলোকই আছেন। এমনটি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

সঙ্গের অন্য দুজন অফিসার প্যান্টের থলিয়া-সমান দু' পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁদের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ওঁরা আর এই ইন্সপেকশানের ঝামেলায় থাকতে রাজী নন।

ওদিকের বড় স্টেশানে, মুরগী রান্না হয়েছে, কনট্রাকটরেরা সব দেব-দর্শনের জন্য লাইন

দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—খাতির, খিদমদ্‌গারী, হুজোর, সেলাম ইত্যাদি, ইত্যাদি। সকাল থেকে ট্রলি চড়ে ক্ষিদে পেয়েছে খুব। পালামৌর স্বাস্থ্যকর হাওয়া লেগেছে চোখে মুখে। ঢের হয়েছে কাজ-কাজ খেলা, এখন ফিরে গিয়ে কোল্ড-বীয়ার খেয়ে হাপুস-হুপুস করে মুরগীর ঝোল আর ভাত খাবেন ওঁরা, তা না, বড়সাহেবের কাজ আর ফুরোয় না।

ওঁরা চলে যাবার সময় সেই ভদ্রলোক আবার হাসলেন। এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করলাম। উনি বড়সাহেব বলে নন; ভদ্রলোক বলে।

ওঁরা যেমন এসেছিলেন, তেমন লাউগড়-গড় গাড়িতে করে চলে যেতেই সমস্ত স্টেশান আবার আগের রূপ ফিরে পেল। মেয়ে দেখতে এসে বরপক্ষের লোকজন বিস্তর মিষ্টি-সিঙ্গাড়া লুচি-মাংস ধ্বংস করে চলে যাবার পরক্ষণেই মেয়ের বাড়ির বসবার ঘরের অবস্থা যেরকম হয়, ঠিক তেমন।

মিসেস কার্নি, ওঁরা চলে যেতেই দু' হাতে আমার হাত চেপে ধরলেন; বললেন, তোমার সঙ্গে যে বড়সাহেবের এত খাতির জানতাম না। তুমি আজ এখানে ঠিক এই সময়ে না এসে পড়লে কি হত জানি না। থ্যাঙ্ক-উ সো মাচ্ মাই বয়, উ্য ডোণ্ট নো, হাউ গ্রেটফুল আই এ্যাম।

আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না।

মিসেস কার্নি বললেন, বড়সাহেব বলছিলেন, তোমার ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই—তুমি ভাল করে দোকানটা চালাও—যত ভাল করে পারো—তবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে কোরো। আমি যতদিন আছি, তোমার উপর যাতে অন্যায় না হয়, দেখব। কথা দিলাম। এই অবধি বলেই, মিসেস কার্নি তাঁর ছোট্ট নরম ফুলের মত হাত দুটো দিয়ে আমার হাত আবার জড়িয়ে ধরলেন।

দেখলাম তাঁর চোখের কোণা দুটি চিকচিক করছে—দুঃখে নয়, স্বস্তির আনন্দে।

আমি অনেকক্ষণ সেই সাহসী যুবতী-বৃদ্ধার হাত দু'খানি আমার হাতে ধরে থাকলাম—অনেকদিন আগে এক রাতে লণ্ঠনের আলোর সামনে বসে শোনা অনেক কথা মনে পড়ে গেল।

আমার হাতে হাত রেখে মিসেস কার্নির এখন কি ঘুমিয়ে থাকা অতীতের অন্ধ কার্নি-সাহেবের কথা মনে হচ্ছিল?

যখন স্টেশান থেকে চলে এলাম তখন মাস্টারমশাইকে দেখলাম না। ভালোমানুষ ঢিলে-ঢালা মাস্টারমশাই-এর তলপেটে মাড় দিয়ে ইস্ত্রী করা ট্রাউজারের অত্যাচার আর বুঝি সহ্য হচ্ছিল না। উনি নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে আবার লুঙ্গি গেঞ্জী পরে স্বাভাবিক হচ্ছেন।

আজকে স্টেশানে শৈলেনকে একবারও চোখে পড়ল না। শুনলাম ও টোড়িতে গেছে কাজে।

ফেরার পথে পোস্ট-অফিস ঘুরে গেলাম।

ছুটির লেখা একটা চিঠি ছিল।

ঠিক করলাম, চিঠিটা ফেরার সময় ঝর্ণাতলায়, পাথরের উপর বসে পড়ব, মনে হবে, ছুটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। রোদ এসে কাটাকুটি খেলছে ওর উজ্জ্বল তরুণ অপাপবিদ্ধ মুখে—আর ও ওর অনাবিল মনের সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছে।

মিসেস কার্নিকে সত্যি কথাটা বলিনি, বলিনি যে, তাঁদের বড়সাহেবকে আমি চিনি না। যদি আমার এই সত্য গোপনের জন্যে তাঁর মনে শান্তি দৃঢ় হয়, তাহলে সেটা না বলাই ভাল।

আজকের দিনটা খুব লাকি দিন বলে মনে হচ্ছে। কেন? তা যাঁরা কুষ্টিটুষ্টি গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরাই হয়ত বলতে পারতেন।

দেখতে দেখতে ঝর্ণাটার কাছে এসে পৌঁছলাম।

ঝর্ণায় নেমে পথের ডানদিকে ঝর্ণার ভিতরে ঢুকে গেলাম, গিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে একটা পাথরে বসে ছুটির চিঠিটা খুললাম।

ছুটি লিখেছে,

সুকুদা, দিন চারেক আগে ভোরের দিকে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছিল আমার।

আমি দেখলাম, আপনি আমার ঘরে আমার খাটের সামনের চেয়ারে বসে আছেন। একটা সাদা ট্রাউজার আর নীলরঙা টেনিস খেলার গেঞ্জী পরে আছেন আপনি। আপনি আমাকে কি যেন জরুরী কথা বলতে এসেছেন।

আমি খাটের উপর সামনে দু'পা মুড়ে দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে বসে আছি আপনার দিকে চেয়ে।

আপনি বলছেন, দ্যাখো ছুটি, তোমাকে আমি ভালবাসি। একথা অস্বীকার করার নয় যে, তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে চিরদিন ভালবাসব। কিন্তু ছুটি, তুমি যা আমার কাছে চাও, তা আমি তোমাকে কখনও দিতে পারব না।

এই অবধি বলার পরই দেখলাম, আপনি মুখ নীচু করে ফেললেন, যেন আপনার কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

সে কথা শুনতে আমার কষ্ট হয়েছিল কি হয়নি সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

আমি মুখ তুলে বলেছিলাম, কেন? তাছাড়া, আমি আপনার কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কী চেয়েছি বলে আপনার ধারণা? আমি ত কখনও আপনার কাছ থেকে আর কিছু চাইনি, এমনকি স্ত্রী হিসেবে সামাজিক সম্মানটুকুও চাইনি। আপনার সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে, শুধু আপনার জন্যেই আপনাকে চেয়েছি। এ ছাড়া আর ত কিছু আমার চাইবার ছিল না।

আপনি বললেন, সে কথা নয়। আমি শরীরের কথা বলছি। আমার প্রতি রমা ট্রু, আমি ওর প্রতি আনট্রুথফুল হতে পারি না। কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসব।

আমি বললাম, ভালবাসার এমন শব-ব্যবচ্ছেদের কথা ত আমার জানা ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না কাউকে ভালবাসলে তাকে শুধু মনের ভালবাসাই বাসা যায়, শরীরের ভালবাসা থেকে আলাদা করে। যে বলে, কাউকে শারীরিকভাবে না চেয়ে শুধু মনে মনে চেয়েই কেউ সার্থক হয়, সে মিথ্যা কথা বলে। আপনাকে কোনদিন আমার সামনে দেবদাসের অভিনয় করতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।

আমি দেবদাসের ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না। সেই সব পার্বতীদের যুগ চলে গেছে। যদি আমি কাউকে ভালোবাসি ত তাকে পুরোপুরি ভালবাসি। স্বামীর ঘরের ভাঁড়ার সামলে ধন্য ধন্য সতীলক্ষ্মীর মহিমা কুড়িয়ে আমার মৃত প্রেমিকের শবের উপর আছড়ে পড়ে আমি কারো সমবেদনা বা সহানুভূতি চাই না। আমি যা চাই, যতটুকু চাই, তা এই জীবনে; এই যৌবনেই চাই।

আপনি বললেন, তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। বললাম, ভবিষ্যতে আপনি আমার সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ না রাখলেই আমি কৃতার্থ হব। রমাদিকে শরীরের ভালবাসা বাসবেন, আর আমাকে মনের—এমন একটা হাস্যকর অবিশ্বাস্য অনিশ্চয়তা-ভরা ভবিষ্যৎ-এ ভর করে আমি জীবনে বাঁচতে চাই না। আপনাকে আগেও বলেছি যে, অতীত বা ভবিষ্যতে আমি বিশ্বাস করি না, কখনও করব না। আমি শুধু বর্তমানে বিশ্বাসী।

আপনি তবুও বললেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ; ভুল বুঝেছ, আমার কিছু বলার নেই।

এই বলে, আপনি উঠে চলে গেলেন।

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি উঠে তিন-চার গ্লাস জল খেলাম, বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিলাম, তবুও আমার ঘুম আসল না।

সকালের আলো যখন ফুটল তখন খুব ভাল লাগল একথা জেনে যে, যা শুনলাম, যা বললাম, সবই স্বপ্নের মধ্যে, সবই একটা দুস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়।

সুকুদা, আমাকে আমি যতখানি আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী বলে জানতাম, আমি বোধহয় ততখানি নই। এই স্বপ্নটা আমাকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে গেছে যে, সাইক্লোনের মত আমার পুরোনো ও গর্বময় বিশ্বাসের মহীরুহগুলোকে এমন করে উপড়ে দিয়ে গেছে যে, আপনাকে এ চিঠি না লিখে পারছি না।

আপনি কেমন আছেন? এই মুহূর্তে কি করছেন? এ চিঠি পড়েই আমাকে জানাবেন।

আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এ স্বপ্ন কেন দেখলাম।

মনে হচ্ছে, এ দুঃস্বপ্ন যদি কখনও সত্যি হয়, তাহলে সেদিন আমি কি ভাবে সেই সত্যকে গ্রহণ করব? আমার মধ্যে এমন জোর কি আছে? এমন শক্তি কি আছে যে, কাউকে ছাড়াই, কারো ভালোবাসা ছাড়াই আমি এই শীতার্ত পৃথিবীতে একা একা বাঁচতে পারব?

নিজের কোনো-কিছু সম্বন্ধে আমার কোনোদিনও সংশয় ছিলো না, ভয় ছিলো না। আমি বিশ্বাস করতাম যে, আমি একজন আধুনিক আত্মনির্ভরশীল নিজেতে-নিজে-সম্পূর্ণ মেয়ে।

আমাকেও কি কারো দানের উপর, কারো খেয়ালী দয়ার উপর নির্ভর করে বাঁচতে হবে? তেমন করে কি কখনও আমি বাঁচতে পারব? জানি না।

আমার বড় ভয় করে সুকুদা, আমার বড় ভয় করে।

আপনি এর মধ্যে হাতে সময় নিয়ে একদিন রাঁচীতে আসবেন। আপনার মুখোমুখি বসে অনেকক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে করে। অনেক কথা জমা হয়ে আছে। ইতি—

আপনার ভয়-পাওয়া ছুটি।

॥ সতর ॥

বিকেলবেলা হেঁটে ফিরে এসে ছুটিকে চিঠি লিখতে বসলাম।

ছুটি,

আজ বিকেলে একা একা হাঁটতে গেছিলাম জঙ্গলের পথে। জঙ্গলের পথে একা একা হাঁটার মত এমন আনন্দ আর কিছু নেই। সঙ্গে অন্য লোক থাকলে তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, মনোযোগ নষ্ট হয়। মন ভরে, চোখ ভরে আমার প্রেমিকা, আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রেমিকাকে দেখা যায় না, তাকে প্রেম নিবেদন করা যায় না।

প্রকৃতিই আমার একমাত্র প্রেমিকা যে আমাকে শুধু আনন্দই দিয়েছে, দুঃখ দেয়নি কোনো-রকম; তাই ত মাঝে মাঝে প্রকৃতির ছায়ায় এসে নিজের মনের যত রক্তাক্ত ক্ষত আছে সেগুলোকে সারিয়ে তুলি।

পথটা চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উঁচু নীচু। বিকেলের ম্লান সোনা রোদ এসে তার সোনার আঙুল ছুঁইয়েছে বনের নরম কোমল সবুজ গায়ে। যেখানে যেখানে জঙ্গল ফাঁকা, সেখানে চোখ পৌঁছয় দূরের পাহাড়ে—উপত্যকা পেরিয়ে সবুজ ঢাল গড়িয়ে গিয়ে আবার উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশে গেছে।

এখানে ওখানে পায়ে-চলা শুকনো লাল মাটির পথ বুড়ো মানুষের উধাও ভাবনার মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে জঙ্গলের গভীরে।

ইচ্ছে করে, এই সমস্ত পথই যদি আমার জানা থাকত তাহলে কি ভালোই না হত। তাহলে সমস্ত গন্তব্যেই যাওয়া যেত নির্ভুল ঠিকানা চিনে। কিন্তু জীবনের সুঁড়ি পথগুলোর মতই জঙ্গলের সুঁড়ি পথগুলোও সব চেনা যায় না। জানা হয়ে ওঠে না। চোখে পড়ে কোনো ওঁরাও যুবতী লাল শাড়ি পরে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে এসে পৌঁছেছে সুঁড়ি পথ বেয়ে বড় রাস্তায়, কোথাও বা দেখা যায় কোনো বিবশ বৃদ্ধ সমস্ত নতুনত্বকে দ্বিখণ্ডিত করবে বলে কোন কঠিন সংস্কারের কালো কুৎসিত কুঠার হাতে অন্য কোনো সুঁড়ি পথে মিলিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তা ছেড়ে।

কত কী ভাবনা ভীড় করে আসে মাথায়, কত কী ভাবনা দানা বাঁধে, গুঁড়িয়ে যায়; আবার দানা বেঁধে ওঠে। কত সুখস্মৃতি মনে পড়ে যায়, কত অতীতের আরক্ত কথা, ভাবনায় অজানা ভবিষ্যৎ কোনো হলুদ পাখির মত ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে হারিয়ে যায় জঙ্গলের শরীরে—তাকে ভাল করে দেখার আগে, বোঝার আগেই।

হাঁটতে হাঁটতে পথটা যেখানে একটা টিলার উপরে এসে উঠেছে সেখানে উঠে আসতেই সমস্ত কান, সমস্ত ইন্দ্রিয় দুঃখে ভরে গেল—চতুর্দিকের তিতিরের কান্নায়।

অনেকদিন আগে রমাপদ চৌধুরীর একটা গল্প পড়েছিলাম, নাম 'তিতির কান্নার মাঠ'। তুমি কি গল্পটা পড়েছ? না পড়লে, গল্পটা পড়ে নিও—রমাপদবাবুর কোনো-না-কোনো গল্প-সংগ্রহের বইয়ে এ গল্প নিশ্চয়ই স্থান পেয়েছে।

যখনি কোনো তিতির কান্নার মাঠে একা একা এমনি কোনো নির্জন ম্লান বিকেলে এসে দাঁড়াই, অমনি আমার ঐ গল্পটার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের প্রত্যেকের বুকের ভিতরেই একটা তিতির কান্নার মাঠ আছে—সেখানে শুধুই বোবা প্রতিকারহীন প্রাত্যহিক কান্না—যে মাঠে দাঁড়িয়ে কেবলি ঝড়ের প্রদীপের মত উজ্জ্বল অথচ অনিশ্চিত জীবনকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু তিতির কান্নার মাঠ পেরিয়ে যেই টিলা ছাড়িয়ে নেমেছি, দেখি, সামনেই ডানদিকে

একটি সবুজ মাঠ—কি সব ফসল লেগেছে তাতে—অসময়ে। রোদের সোনা, বনের সবুজ মিশে এক দারুণ ছবির সৃষ্টি হয়েছে। এই মাঠ দেখেই আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে প্রদীপটাকে দু-হাতে আড়াল করেই আমাদের চলা উচিত, আমাদের বাঁচা উচিত।

বনের মধ্যে এলেই আমার নতুন করে মনে হয় এখানে দুঃখও আছে, আনন্দও আছে, মৃত্যুও আছে, জীবনও আছে, আশাও আছে, নিরাশাও আছে। প্রকৃতির মত করে আর কোনো প্রেমিকা আমাদের শেখাতে পারে না, এমনকি ছুটিও না, যে জীবনের চরম ও পরম মানে ও গন্তব্য হচ্ছে একটু উষ্ণতা, সমস্ত শীতার্ত মুহূর্ত সত্ত্বেও নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা সব সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকা উচিত—বেঁচে থাকা উচিত এই জন্যেই যে প্রত্যেক তিতির কান্নার মাঠের পরেই একটি সবুজ-সোনার ঢাল থাকে।

মনে পড়ে যায় যে, জীবনে আনন্দ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সুখও নয়; এই দুঃখ, এই একাকীত্ব, এই মনে মনে আত্মহননের অনুক্ষণ চিন্তা পেরিয়ে এলে কখনও হঠাৎ আনন্দের উষ্ণ হাতে হাত রাখা যায়।

কিন্তু শুধু কিছুক্ষণের জন্যেই।

তবু এত দুঃখ, এত গ্লানি, এত অনিশ্চয়তার মাঝে আনন্দই, একমাত্র আনন্দই নীরবে বিরাজ করে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একমাত্র এক অমোঘ অনাবিল আনন্দই বাঁশী বাজায়।

হঠাৎ একটা অচেনা পাখি ডাক দিতে দিতে সে ডাক আমার সমস্ত মন, সমস্ত মনের কেন্দ্রবিন্দুকে চমকিয়ে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। হারিয়ে যাবার আগে এ গাছে একবার ও-গাছে একবার বসে বসে তার ছোট্ট ঠোঁটে একরাশ আনন্দের আভাস বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমার খুব ইচ্ছে করতে লাগল—তুমি যদি এখন আমার পাশে থাকতে।

তোমার ছিপছিপে তন্বী সুগন্ধি শরীর, তোমার কেয়াফুলের গন্ধভরা মন, তোমার ভেজা-ভেজা মিষ্টি নরম ঠোঁট, তোমার ফিঙেমত কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি নিয়ে তুমি যদি আমার পাশে এই মুহূর্তে থাকতে। যদি থাকতে, তাহলে বিশ্বাস করো, কোনো কথা বলতাম না তোমার সঙ্গে। তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম না। শুধু তোমার পাশে পাশে নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে তোমার দিকে চাইতাম আর ভালো লাগায় মরে যেতাম।

আমি তখন নিশ্চয় করে জানতাম যে, আমি মিসেস কার্নি নই, প্যাট প্লাসকিন নই, আমি মিস্টার বয়েলস্ নই, এমনকি পরশপাথর খুঁজে-বেড়ানো অশান্ত, অবুঝ কৈশোরের যন্ত্রণার লাবুও নই। অন্তরে বুঝতে পেতাম যে, আমি একা নই, আমার সমস্ত অস্তিত্ব সার্থক তোমার অস্তিত্বে।

তুমি যদি পাশে থাকতে, তবে তোমাকে কোনো স্থূলভাবে পেতে চাইতাম না, মনে মনে পাওয়া ছাড়া। তোমার শারীরিক অস্তিত্ব আমার মানসিক সত্তাকে এক দারুণ সুগন্ধি জৈবিক বনজ-গন্ধভরা পাওয়াতে ভরিয়ে দিত। বনের মত বনজ ও শারীরিক স্থূলতা আর কিছুতেই নেই, আবার বনের মত মনজ ও মানসিক সূক্ষ্মতাও আর কিছু নেই। যারা বনকে দু চোখ ভরে দেখেছে, দেখতে চেয়েছে, যারা হৃদয় ভরে বনকে পেয়েছে তারাই একথা স্বীকার করবে।

ছুটি, ও আমার জন্মজন্মের ভালোবাসার ছুটি, তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ, কিন্তু আমারও তোমাকে অনেক কিছু শেখাবার আছে।

আমি আইনজ্ঞ বলে তোমাকে জুরিসপ্রুডেন্স বা কনস্টিটুশ্যানাল আইন শেখাবার মত মূর্খ নই। কারণ আমার চেয়ে বড় আইনজ্ঞ, বড় ব্যারিস্টার লক্ষ লক্ষ আছে। পৃথিবীর সবচাইতে বড় ব্যারিস্টারের রাজত্বও হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বড় বড় খিলানওয়ালা থমথমে বাড়িগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—সেই রাজত্বে কোনো গর্ব নেই; সে রাজত্ব লাবুর রাজত্বের চেয়েও দরিদ্র—।

আমি সে রাজত্বের রাজা নই। রাজা হতে চাইনি।

আমি আমার বনের রাজা, আমার মনের রাজা। এ রাজত্ব কোনো গম্বুজে-খিলানে, কোনো তকমাধারী আর্দালীর সেলামে সীমিত নয়—এ রাজত্ব দিগন্ত অবধি ছড়ানো আছে—কত ফুল, কত পাখি, কত প্রজাপতি, কত কাঁচপোকা, কত পাহাড়, কত নদী, কত লতা, কত গাছ। এ রাজত্বের সীমানা অসীম।

আমার প্রজা হবে? আমার ছাত্রী হবে তুমি ছুটি?

তোমার হাত ধরে বনে বনে ঘুরে তোমাকে কত কি শেখাব আমি, কত পাখির নাম, কত ঘাস

ফ্লের নাম, কত কাঁচপোকার নাম। আমি তোমার মত নোট-বই মুখস্থ করে তুমি যেমন ছাত্রদের পড়াতে তেমন করে পড়াব না, আমি তোমাকে বনের গালচেয় পা ফেলে ফেলে, পাখীর গানের সংগে সুর মিলিয়ে, সূর্য ওঠা এবং সূর্য ডোবার ঘড়ির দিকে চোখ রেখে পড়াব।

আমার ছাত্রী হলে তুমি জানবে, একদিন নিশ্চয়ই জানবে যে বইয়ের মধ্যে কোনদিনও কিছু লেখা থাকে না, লেখা যায় না। শাশ্বত যা চিরস্থায়ী যা তীব্র অনুভূতিতে মেশা জারজ জীবন-যন্ত্রণায় সত্য, সেই সব চিরকালীন জানা শুধু আছে বনের মধ্যে, তোমার আমার মনের মধ্যে।

তোমার সুন্দর লতানো নারী শরীর, আমার স্বয়ম্বর ঋজু পুরুষ শরীর, তোমার শারীরিক আর্তি, আমার শারীরিক আর্তি, তোমার মনের দুঃখ এবং আনন্দ মেশা গোঙানী, আমার মনের মণ্টাজ এ সমস্তই আমাদের প্রকৃতিই দিয়েছে। প্রকৃতির চেয়ে বড় এনসাইক্লোপিডিয়া কখনও কোনো দেশে হবে না। এর মধ্যেই সব প্রশ্ন, জীবনের সব উত্তর, এর মধ্যেই জ্বালা, এর মধ্যেই নিবৃত্তি, এর মধ্যেই উদ্দাম অশান্তি, আবার এর মধ্যেই সমাধি।

কি ছুটি ? তুমি আমার পড়ুয়া হবে ?

দ্যাখো কি বলব বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম, আর কি বলতে বসেছি।

তোমাকে আজ চিঠি লেখার প্রধান কারণ ছিল তোমাকে জানানো যে, রমা এসেছিল আমার কাছে সবান্ধবে।

তোমাকে একটা কথা বলার দরকার যে, রমার এবারের ব্যবহার আমাকে অবাক করেছে।

ও আমার কাছে এসেছিল সাদা পতাকা উড়িয়ে, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, বুঝতে পারছি না, আমার কি করা উচিত।

তুমি তোমার চিঠিতে তোমার স্বপ্নের কথা লিখেছিলে। আমার ও চিঠি পড়ে খুব অবাক লেগেছে। তাহলে বোধহয় এখনও টেলিপ্যাথী বলে কিছু আছে।

তোমাকে মিথ্যা বলব না, কারণ আমি বিশ্বাস করি না যে মিথ্যাকে বা ভানকে আশ্রয় করে জীবনে কিছু পাওয়া যায়। পাওয়া যে যায় না, তা নয়, কিন্তু তা নিতান্তই মেকী, স্বল্পস্থায়ী; তাতে আনন্দ নেই। যে-কোনো গভীর আনন্দই গভীর দুঃখ থেকে জন্মায়। গভীরতা না থাকলে দুঃখ বা সুখ কোনোদিনই তেমন করে নিজেকে আচ্ছন্ন করে না বলেই মনে হয়। আশ্লেষে আচ্ছন্নতার মধ্যেই যদি না বাঁচলাম, জীবনকে সুখে বা দুঃখে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ধরেই যদি না বাঁচলাম, তবে জীবন ত একটা সাড়ে-ছ-আনার নীলামি অভিজ্ঞতায় দাঁড়ায়। জীবন ত তা নয়। আমার তোমার কারো জীবনই ত তা নয়।

রমা আমাকে বলল, আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনি, নাকি ভালবাসতে পারিনি। এ কথাটা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। সত্যিই কি তাই ? তাই-ই যদি হয়, তাহলে ত কারো কাছেই আমার কিছু পাবার নেই।

রমা তোমার সম্বন্ধে কতগুলো কথা বলেছে। সে কথাগুলো খারাপ নয়, তোমার চারিত্রিক গভীরতা সম্বন্ধে ওর যা অনুমান তাই-ই বলেছে। আজকালকার অল্পবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে ও জেনারালাইজ করে বলেছে। সে-কথা কি, তোমাকে নাই-ই বা বললাম। রমাই ঠিক না তুমিই ঠিক একদিন তা জানা যাবে হয়ত, এও হয়ত জানা যাবে যে, তোমরা দুজনেই ঠিক, কেবল আমিই বেঠিক।

তুমি যে কথা স্বপ্নে শুনেছ, সে কথা অবচেতনে আমি তোমাকে যে বলিনি তা নয়। রমাকে দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, তবে কি আমিই ভুল করলাম ? আমার প্রতি ওর উদাসীনতা, ওর খারাপ ব্যবহার, ওর শীতলতা সবই কি ওর উষ্ণ ভালোবাসারই এক অভিমানী প্রকাশ ? তাও কি সম্ভব। আমিই কি ওর সংগে খারাপ ব্যবহার করলাম ?

আবার ভাবলাম, অসম্ভবই বা কি ? সব মানুষ ত একরকম নয়। নয় তাদের অভিব্যক্তির প্রকাশ, তাদের মনের স্বরূপ। ভাবলাম, রমা যে-ভাবে আজ নিজেকে প্রতিভাত করেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে রমার প্রতি আমি কি অবিচার করব না ? অন্যায় করব না ? তার প্রতি অন্যায় করে, তার সত্যিকারের ভালবাসা পদদলিত করে আমি যদি তোমাকে নিয়ে সুখী হতে যাই তাহলে কি আমি সুখী হব ?

অন্যকে দুঃখ দিয়ে কি কখনও সুখী হওয়া যায় ? সত্যিকারের সুখী হওয়া যায় ?

আমি জানি, তুমি কি বলবে। তুমি বলবে যে, অন্য কাউকে দুঃখী না করে এ পৃথিবীতে

কেউই কখনও সুখী হয়নি। সুখী হতে হলে জীবনে একটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। তুমি বলবে যে, সুখ কেউই কাউকে হাত বাড়িয়ে দেয় না। আজকের দিনে দাঁতে-দাঁত চেপে শক্ত হাতে নিজের সুখ নিজেকেই কেড়ে নিতে হয় অন্যের অনিচ্ছুক হাত থেকে। যে তা না করে, সে মরে।

আমি জানি, আমার এ চিঠি পড়ে তুমি কি ভাববে; কি করবে।

তুমি বিশ্বাস করো, তুমি অন্য-কেউ হলে এ কথা অকপটে তাকে লিখতে পারতাম না। সে আমাকে ভুল বুঝত, ভাবত, লোকটা কি রকম ? লোকটার কোনো মতিস্থির নেই, কোনো চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই, লোকটা নিজের সিদ্ধান্তের পাশে নিজে পিস্তল হাতে দাঁড়াতে পারে না সেই সিদ্ধান্তকে বাঁচাবার জন্যে ?

কিন্তু আমি জানি, তুমি তা ভাববে না।

কারণ, তোমার বয়স অল্প হলেও তোমার মনের গভীরতা তোমার দু'গুণ বয়সী মেয়েদেরও নেই। তুমি আমার যথার্থ বন্ধু। তোমার মন এবং আমার মনের সমতা আছে বলেই তোমাকে আমার এই বহুরূপী মনের সব কথা বলা যায়, সব রঙ দেখানো যায়—কারণ আমি বুঝেছি যে তুমি এই অনেক রঙের আপাত-বিরোধিতার মধ্যেও আমার আসল মনকে চিনতে পেরেছ। চিনতে চেয়েছ।

আমার মনে বরং এই ভয়ই হয়েছে যে তোমাকে সত্যি কথা না বললে, আমার মনে কি হচ্ছে তা না জানালে তোমার প্রতি আমি মিথ্যাচারী হব। সে অপরাধ তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না।

আমি এও জানি যে, তুমি আমাকে ভালোবেসে তোমার অল্পবয়সী জীবনে কতখানি ঝুঁকি নিয়েছ, কতখানি স্বার্থত্যাগ করেছ, এই পরশ্রীকাতর পরনিন্দায় মুখর সমাজে তুমি নিজেকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছ এবং যা করেছ সব আমারই জন্যে। সমাজে তোমার কোনো স্বীকৃতি নেই, হবে না (রমা যদি ডাইভোর্স না দেয়) তা জেনেও, শুধু আমার জন্যেই তুমি তোমার সব দাবী ত্যাগ করেছ।

এ যে আমার কতবড় প্রাপ্তি, কত বড় গর্ব তা তোমাকে মুখে কোনোদিনও না বললেও তুমি নিশ্চয়ই আমার চোখের ভাষায় তা অন্তরে নিরন্তর বুঝেছ।

এই প্রাপ্তির মধ্যে অনেক দায়িত্বও আছে। তোমার প্রতি আমারও অনেক দায়িত্ব জন্মে গেছে। সে দায়িত্ব তুমি কখনও চাপাওনি, কিন্তু সম্পর্কের নিকটতায় সে দায়িত্ব স্বাভাবিক কারণে আপনা থেকেই আমার উপর বর্তেছে। হয়ত আমি দায়িত্ব-জ্ঞানহীন নই বলেও সে দায়িত্ব আপনা থেকে এসেছে।

তুমি সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এই প্রবাসে চাকরী করবে, একথা আমার ভাবতেই খারাপ লাগে। তুমি জানো যে তুমি সারা মাস কষ্ট করে যা রোজগার করো আমি কোর্টে দিনে যদি একবার মাত্রও দাঁড়াই তাহলেই তার চারগুণ রোজগার করি।

তবে ? তুমি যদি আমার প্রিয়জন হও, তুমি যদি স্বীকার করো যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমাকে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে কেন বঞ্চিত করো ? আমার কী তা না করতে পেরে কষ্ট হয় না ? তুমি কি আমার দিকটা কখনও ভেবে দেখোনি ? ভালোবাসার জনের জন্যে কিছু করার, করতে পারার মত সুখ আর কি আছে ? তুমি কি এ সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও ?

আমার ইচ্ছা, তুমি এ চাকরী ছেড়ে দাও। কোলকাতায় ফিরে চল আমার সঙ্গে। তোমাকে প্রতি মাসে আমি এক হাজার করে টাকা দেব। তুমি আমার পার্সোনাল সেক্রেটারীর কাজ করবে, আমার লেখা ফেয়ার করে দেবে, ফ্যান-মেইলের উত্তর দেবে, প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, লেখার প্রুফ দেখে দেবে।

তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান অত্যন্ত তীব্র, আর কেউ না জানুক আমি তা জানি, তাই তোমাকে বিনা-পরিশ্রমে টাকাটা দিতে চাই না। তাতে তোমারও সম্মান থাকবে আমারও আনন্দ হবে: স্বস্তি হবে।

কি বলো ছুটি ? কোলকাতা যাবে ত ? আমার চিঠি পড়ে তুমি কি ভাবছ জানি না। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। রমার এই হঠাৎ-আসায় আমার মন বড় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কেবলই ভয় করছে, ওর প্রতি আমি অবিচার করলাম না ত ?

কারো প্রতিই আমি অন্যায় করতে চাই না ছুটি—তুমিও নিশ্চয়ই চাও না যে, আমি অন্যায় করি কারো প্রতি। তাই তোমার কাছে একটু সময় চাইছি। আশা করি আমাকে এই সময় তুমি দেবে। আশা করি, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। যদি মনে করো আমার এই ভাবনাটাও অন্যায়, তাহলে তোমার কাছে আগেই ক্ষমা চাইছি।

—ইতি তোমার সুকুদা'

চিঠিটা লিখে ফেলতে পেরে অনেকটা হালকা বোধ করলাম।

রমা চলে যাবার পর থেকে এবং ছুটির চিঠি পাবার পর থেকেই এ চিঠিটা লিখব লিখব করে লেখা হয়নি।

আমি নিজেকে সত্যিই বুঝতে পারি না।

যারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে, বুঝে ফেলেছে, তাদের আমি ঈর্ষা করি।

বোধহয় আমার মন অত্যন্ত নরম বলেই এত কষ্ট পাই, এত দ্বিধা এত দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে ছটফট করি। লোকে বলে, পুরুষমানুষদের মন শক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু শক্ত হওয়া দরকার তা জানার মধ্যে এবং শক্ত করার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। আর শক্ত করতে হলেও গোড়াটা যথেষ্ট শক্ত কিনা তাও যাচাই করে নেওয়া দরকার। সংশয়ের চোরাবালির উপরে শক্ত মনের কংক্রীটের ইমারত গড়লে তা যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। সেই বাইরের শক্তি দুর্বলতারই নামান্তর।

আসলে আমি জীবনে এত স্বল্প-সংখ্যক মানুষের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছি—ব্যক্তি-গত জীবনে যে, সেটাই আমার কাল হয়েছে।

রমাকে, এবং কিছুদিন হল ছুটিকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে জানিনি। অনেক জনকে জানায় আমি বিশ্বাস করিনি। জীবনটা এত ছোট, অবকাশের সময় এত কম যে, বেশী লোকের মধ্যে, বেশী লোকের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে কোনো সম্পর্ককেই গভীরভাবে উপভোগ বা উপলব্ধি করা যায় না বলেই সব সময় মনে হয়েছে।

আমার যা মনে হয় তা যে অন্য সকলেরও মনে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি কেবল আমার নিজের অনুভূতির কথাই বলতে পারি। নিজেকেই জানতে পারলাম না, অন্যকে কেমন করে জানব?

বেশ ছিলাম, মনে মনে রমাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে, মনে মনে ছুটিকে তার নতুন সিংহাসনে বসিয়ে মহা আনন্দে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ রমা এসে সব গোলমাল করে দিল। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি সম্পর্কই যেন হীরের টুকরোর মত। কোন্ দিক থেকে, কোন্ কোণ থেকে আলো পড়লে মনের সম্পর্কের কোন্ কোণে কোন্ রঙ কখন ঝিলমিলিয়ে ওঠে তা বোঝা শক্ত।

রমাকে এতদিন একই আলোয়, একই কোণ থেকে দেখে তার মনের রঙ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে ফেলেছিলাম। এবং সে ধারণা যে অভ্রান্ত সে কথাও মনে মনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম। হঠাৎ রমা নিজেকে এক অন্য কোণ থেকে প্রকাশ করে আমার পুরোনো জীবনটাকে বাতিল করে দিয়ে এবং নতুন জানাটাকেও নির্দ্বিধায় মানবার সুযোগ ও সময় না দিয়েই চলে গেল।

আমাকে এক নিদারুণ সমস্যার মধ্যে ফেলে গেল।

একবার রমার মুখ অন্যবার ছুটির মুখ আমার মনে বারে বারে ফিরতে থাকে এখন।

রমার মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন চোখে পড়ে আদরিণী, গর্বিতা এক আত্ম-বিশ্বাসী দাম্ভিক মুখ—সে মুখ আমার অনেক অবহেলায় বুঝি আজ কঠিন হয়ে গেছে।

ছুটির মুখের দিকে চাইলে দেখি, অল্পবয়সের অপাপবিদ্ধ সরলতায় ভরা ভালোবাসায় জরজর তরুণ এক খুশীর মুখ, সে মুখের মালিক স্বর্ণলতার মত আমার মনের গাছকে পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে আছে—। ও কখনও কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতে পারেনি যে, আমার মনে ওর সম্বন্ধে এখনো কোনো দ্বিধা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছা করছিল।

কি করে এই সমস্যার সমাধান করব আমি জানি না।

হয়ত রমাও আমার জীবনে সত্য ছিল এবং সত্য আছে এবং ছুটিও আমার জীবনে সত্য—। কিন্তু সত্য বলে কোনো সত্যকে জানলেও একাধিক সত্যকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষমতা বা

উপায় ত আমাদের নেই।

তাই আমার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে, আমাকে জানতে হবে, কোন্ সত্যটা দুই সত্যের মধ্যে বড় সত্য। কোন্ সত্যের জন্য অন্য সত্যকে বিসর্জন দেওয়া চলতে পারে।

আমি জানি না, কবে কি করে এই গবেষণা সফল হবে।

চিঠিটা শেষ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাইরে ফিকে আলো, ঝোপঝাড়, ঝুপড়ি ঝুপড়ি অন্ধকার। আকাশময় ঝকঝকে তারা। দূরের পথ দিয়ে কয়লা বোঝাই একটা ট্রাক চামার দিকে যাচ্ছে। ফার্স্ট গীয়ারের গোঙানী শোনা যাচ্ছে, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে টেইল-লাইটের লাল আলো।

হঠাৎ চোখে পড়ল, হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে কে যেন গেট খুলে বাড়ির দিকে আসছে।

তাড়াতাড়ি বাইরের আলো জ্বালিয়ে, দরজা খুলে দেখি, মাস্টারমশাই।

এই পরোপকারী আপনভোলা লোকটি শীতে গ্রীষ্মে যারই যখন অসুখ করে তক্ষুনি রাত-বিরেতে হোমিওপ্যাথি বাক্স বগলে করে বেরিয়ে পড়েন। কোনো আবেদনেই তাঁর 'না' নেই। এখানের কত লোক যে তাঁর ভরসায়ই থাকেন, তার ইয়ত্তা নেই।

মাস্টারমশাই বললেন, লাবুর খুব জ্বর—তাই একবার দেখে গেলাম। তারপর বললেন, বুঝলেন মশাই, আমার কিন্তু অবস্থা ভাল বলে মনে হল না। আমি এ দায়িত্ব একা নিতে চাই না। তাই আপনার কাছে এলাম।

আমি শুধোলাম কত জ্বর।

জ্বর অনেক—। কিন্তু শুধু তার জন্যেই নয়, বলছে, ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা—আমার ভয় হচ্ছে হয়ত বা মেনেনজাইটিস।

তাহলে কি হবে? আমি বললাম।

আপনি একবার চলুন। প্যাট সাহেবকে বলে কর্নেল সাহেবের গাড়ি করে যাতে ওকে মান্দারের হাসপাতালে এক্ষুনি নিয়ে যাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আমি মোটা কোটটা গায়ে চাপিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

প্যাটকে ডাকতেই প্যাট আলো জ্বালিয়ে বাইরে এল। আমাদের বলল, তোমরা লাবুদের বাড়ি চলে যাও, আমি এক্ষুনি কর্নেল সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি—ওঁর গাড়ির বন্দোবস্ত করতে।

প্যাটকে ডেকে নিয়ে কি কি করা উচিত তা ওকে বললাম।

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে যখন লাবুদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখি বাড়ির বাইরের মাঠে তিন-চারটে খরগোশ কান-উঁচিয়ে শুঁটিক্ষেতের মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

আলো দেখে ও আমাদের গলার আওয়াজ শুনে পালালো বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এসে ক্ষেত সাবাড় করবে বলে মনে হল।

মাস্টারমশাই বললেন, সহায় যখন থাকে না মানুষের, তখন খরগোশের মত প্রাণীও কতখানি ক্ষতি করতে পারে! এদের শুঁটিক্ষেত নষ্ট করা কি কম ক্ষতির? খরগোশ, শুয়োর, সজারু, ভালুক, এদের জ্বালায় ক্ষেতখামার করার উপায় আছে?

আমি বললাম, কেন? হরিণ শম্বর আসে না?

উনি বললেন, এখানের যত হরিণ শম্বর ছিল, সব সাহেবদের আর ওরাওঁদের পেটে। হাড় চুষেছে, মাস খেয়েছে, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছে।

আমরা দরজা ধাক্কা দিতেই লাবুর বড় ভাই ডাবু দরজা খুলে দিল, মুখে কিছু বলল না।

ভিতরের ঘরে আমি আগের দিন ঢুকিনি—এই প্রথম ঢুকলাম।

সমস্ত ঘরেটায় দারিদ্র্য যেন দাঁত বের করে আছে। মনে হচ্ছে সবকিছু গ্রাস করে ফেলবে, ফেলেছে।

লাবুর মা লাবুর পাশে বসে আছেন সোজা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ শিখার মত। মাথার কাছে কেরোসিনের একটা কুপী জ্বলছে। কুপীটা ওঁর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

আমি গিয়ে লাবুর মাথার কাছে দাঁড়ালাম। লাবুর চোখ বন্ধ। ও কোন কথা বলল না। বাইরের ঘরে বেঁধে-রাখা বাছুরটা জোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বাইরের ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে, শিশির পড়ার ফিসফিস শব্দের মধ্যে এবং ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ গরুর দীর্ঘশ্বাস কেমন অলক্ষুণে শোনাল।

জঙ্গল থেকে একটা হুতুম-পেঁচা দুরগুম দুরগুম করে ডেকে উঠল। অকারণেই বুকটা

ছমছম করে উঠল।

আমি লাব্বুর মার মুখের দিকে তাকালাম।

সে মুখে কোন বৈকল্য নেই। যাঁরা অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে গেছেন, যাঁদের যেতে হয়, তাঁদের কাছে দুঃখের নতুন কোন ভয়াবহতা বোধহয় থাকে না। আনন্দের মত দুঃখেরও একটা উদ্বেলিত প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু এ'দের জীবনে সুখ বা দুঃখের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। সমস্ত তরল অনুভূতিগুলো অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে। আনন্দেও তাঁরা পাথর, দুঃখেও।

লাব্বু হঠাৎ বিড় বিড় করে কি বলে উঠল, বলল চাঁদের পাহাড়, বলল সাদা ঘোড়া, বলল পাখিটা।

বলেই, থেমে গেল।

আমি বললাম, আমাকে একটা খবর দিলেন না কেন? কবে থেকে জ্বর?

লাব্বুর মা বলল, খবর দেব কি বাবা—ঐ বেদেগুলোর জন্যেই এমন হল।

মাস্টারমশাই বললেন, বেদে কোথায়?

লাব্বুর মা বললেন, বেদেদের একটা দল এসে ইটটিটিকারীর জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে যে। ছেলের রোজ সেখানে না গেলে নয়। ওখানে গিয়ে কি খায়, কি করে জানি না। ঐ নোংরা লোক-গুলোর কাছে কেন যে ও যায় তাও জানি না।

দ্যাখো ত কোথা থেকে কি অসুখ বাধিয়ে এল। আমার আর ভাল লাগে না। একজন ত অনেক দিন আগেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেছেন—রেখে গেছেন আমার জন্যে যত চিন্তা, যত রাজ্যের কষ্ট। ভগবান আমাকে যে কেন নেন না তা ভগবানই জানেন। গত জন্মে যে কি পাপ করেছিলাম, জানি না বাবা। সত্যিই আমি এই সংসার আর টানতে পারি না। বড় ক্লান্ত লাগে আজকাল।

আমরা বসে থাকতে থাকতেই কর্ণেল সাহেবের এ্যাম্বাসাডর গাড়ি এল।

তাঁর ড্রাইভার, তিনি নিজে এবং প্যাট ভিতরে এল।

লাব্বুকে ভাল করে গরম জামা-কাপড় পরিয়ে কম্বল-ঢেকে গাড়ির পিছনের সীটে তোলা হল।

লাব্বুর মা বললেন, আমিও যাব।

প্যাট একটুক্ষণ কি ভেবে বলল, বেশ ত! চলুন।

উনি একটা ছে'ড়া-নীলরঙা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম।

উনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ম্লান হাসলেন, বললেন, কি দেখছ বাবা? এসব কিছু নয়। এ সবের জন্যে কোনো কষ্ট নেই আমার—আমার শীত করে না আজকাল। কষ্ট শুধু এই ছেলে-গুলোর জন্যে। ওদের ত এরকমভাবে মানুষ হবার কথা ছিল না।

আমিও গাড়িতে উঠে বসলাম। কিন্তু প্যাট এবং কর্ণেল সাহেব আমাকে বকাবকি করে নামিয়ে দিলেন।

প্যাট আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, তুমি ত যা করার করেছ। তোমার যাওয়ার কি দরকার? সঙ্গে গেলে কি বেশী ভালবাসা দেখান হবে? যা করার আমরা করব। তোমার টাকাটা খুব উপকারে লাগবে।

তারপর বলল, আমি টাকা দিয়ে করতে পারি না, গতরে করি যা পারি। তুমি টাকা দিয়ে পারো, করো। দুই-ই করা। দুই-ই সমান করা। কোনটা কোনটার চেয়ে খাট নয়। যাও, বাড়ি যাও।

লাব্বুর মা বললেন, বাবা যাও, তুমি বাড়ি যাও। আমার লাব্বু তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তোমার কথা সবসময় বলে ও। তোমার দেওয়া চাইনীজ চেকারটা নিয়ে আমরা মায়ে-বেটাতে অবসর হলেই বসি। ও কি বলে জানো? আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, পৃথিবীতে তুমি ফার্স্ট আর সুকুদা সেকেন্ড।

আমি ওকে শুধোই, কিসের ফার্স্ট সেকেন্ড রে?

লাব্বু বলে, আমাকে ভালবাসার।

সকলেই হেসে উঠল মাসীমার কথা শুনে।

আমি বললাম, মাসীমা এখন নয়, সব গল্প পরে শুনব; তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যান।

ওরা চলে গেলে আমি ফিরে এলাম মাস্টারমশাইকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে।

লাব্বুর কথা ভাবছিলাম।

ছেলেটা ভুল বকছিল। ওর মুখটা মনে পড়ছিল। এক মাথা রুক্ষ চুল, বোঁজা চোখ, লাল ঠোঁট—ও বিড় বিড় করে বলে উঠেছিল, চাঁদের পাহাড়।

সাদা ঘোড়া।

পাখিটা।

লাবু কোন্ পাখির কথা বলছিল কে জানে?

মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা করে জীবনটাকে ব্যাক গীয়ারে ফেলে আবার লাবুর বয়সে ফিরে যাই, তারপর আবার চাঁদের পাহাড়, সাদা ঘোড়া এবং পাখিদের জগতে নির্বিকার দ্বিধাহীনতায় প্রবেশ করি।

এই মন নিয়ে, আর এ জীবনে কখনও লাবুর জগতে পৌঁছতে পারব না। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেছে।

কেন জানি না, আমার মন বলছিল, লাবু ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।

ওর সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে একদিন ও আর আমি হাত ধরাধরি করে চাঁদের পাহাড়ে যাব।

॥ আঠার ॥

আমার অবকাশের স্বাধীনতার দিন ফুরিয়ে আসছে। শীগগির কোলকাতা ফিরতে হবে। ফিরে গিয়ে ধড়াচুড়া পরে সারাদিন দুপায়ে দাঁড়িয়ে আবার সওয়াল করতে হবে।

জজসাহেবদের মুখের দিকে তাকিয়ে আইনের পোকা বাছতে হবে।

বুঝতে হবে, কোন্‌দিন কোন জজসাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে সকালে।

এসব অকথ্য ও অলিখিত কথা মুখে দেখে বুঝে নিয়ে তাঁদের মেজাজ বুঝে সওয়াল করতে হবে।

আসলে এটাই স্বাভাবিক।

জজসাহেব হলেও তাঁরাও আমাদেরই মত মানুষ। জজীয়তির কোট চাপালেই সেই মানুষটা কিছু বদলে যান না—তাঁরা সেই কালো গাউনের নীচে সাদামাটা মানুষই থেকে যান। সেটাই একমাত্র ভরসার কারণ।

যেদিন জজসাহেবের মেজাজ খারাপ থাকবে, সেদিন জজসাহেব কিছু শুনতে চাইবেন না, কিছুক্ষণ শুনেই বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বলবেন, লিসন্ মিস্টার বোস, আই হ্যাড বীন থ্রু দা বেঞ্চ এণ্ড দা বার ফর আ কনসিডারেবল্ টাইম। টেল আস, ইফ ড্যু হ্যাভ এনীথিং নিউ টু টেল।

সেদিনও হাসতে হাসতে এমন মুখ করে পুরোনো কথাগুলোই এমনভাবে বলতে হবে, যেন একেবারেই নতুন শোনায়।

আসলে নতুন কথা কিছু নেই বলার মত, নতুন করে হয়ত বলার আছে। নতুন কথা বলা, মক্কেলরা কৌঁসুলিরা এবং জজসাহেবরাও বোধহয় কেউই পছন্দ করেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছিলেন, 'আইন? সে ত তামাশামাত্র। বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' অথচ তিনি নিজে হাকিম ছিলেন। কথাটা আজকেও পুরোপুরি সত্যি।

ঘোঘো ঘোষ এখন জজসাহেব।

দুঃখের কথা এই যে এখন থেকে রোজ ঘোঘোকে 'ইওর লর্ডশিপ' বলে সম্বোধন করে ওর সমস্ত লম্ফঝম্প ওর সমস্ত স্থূল পাণ্ডিতম্মন্যতাকে নীরবে হাসিমুখে সহ্য করতে হবে। বলতে হবে, 'মাই লর্ড', আই কোয়াইট সী ইওর পয়েণ্ট, মোস্ট প্রোবাবলি, আই হ্যাভন্‌ট্ বীন এবল্ টু মেক মাইসেলফ্ ক্লিয়ার টু ইউ'। তা করতে হবে, কারণ নইলে মক্কেল হেরে গেলে আমিও হেরে যাব। তাই, মক্কেলকে জেতাতে, ঘোঘোর কাছে আমার মাথানীচু করে দাঁড়াতেই হবে।

পয়সা রোজগার করতে হলে মাথানীচু করতেই হয়। সত্যি সত্যিই হোক কি অভিনয় করেই হোক, যে যত বেশী রোজগার করে তার মাথা তত বেশী নোয়াতে হয়—যা বাইরে থেকে দেখা যায় না।

আমাদের মাথা কারো পায়ে শারীরিকভাবে নোয়াতে হয় না, নিজের আদর্শ ও আত্মাভিমানকে ছোট করে নিজেকে নীচু করতে হয়। সেটা একটা দারুণ কষ্টকর অভিজ্ঞতা। যার আত্মাভিমান যত বেশী, তাকে এই কষ্টটা তত বেশী করে বাজে। অভিনয়ের ছলে মাথা নোয়াতেও বাজে। অথচ মাথা না নুইয়ে এ দুনিয়ায় বাঁচাই মুস্কিল।

কোলকাতায় ফেরার কথা আমি ভাবতে চাই না। ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

অথচ এখানের ঘন নীল আকাশ, রোদ্দুরে স্নিগ্ধ-শান্তিতে শুয়ে-থাকা পাহাড়—বন, চরে-বেড়ানো গরু মোষের গলার ঘণ্টার ঢুংগুর ঢুংগুর মন্থর আওয়াজ, কোনো ছোট পাখির চিকন্ গলার ডাক, সব আমাকে মনে পাড়িয়ে দেয় যে কোলকাতাটাই নির্মম সত্যি, এই জগৎটাই মিথ্যা।

একজন পাকা এস্কেপিস্টের মত বারে বারেই দায়িত্ব ছেড়ে, টেনসান্ ছেড়ে, গলার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে আমি জঙ্গলে পালিয়ে আসি। কিন্তু কে যেন আমাকে ধরে আবার খোঁয়াড়ে পুরে দেয়, গলায় দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার জোয়ালে জুড়ে দেয়।

যে তা করে, সে কে?

সে ত আমার বুকের মধ্যেই বাস করে, সে ত আমারই মনের একটা হিসাবী স্থূল অংশ। যার কাছ থেকে আমার এ জন্মে নিস্তার নেই।

সেদিন শেষ দুপুরবেলা জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরের ঝকমকে রোদে বনপাহাড় হাসছিল।

দুপুরের শীতের বনের গায়ের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বিয়ের পর রমার গায়ে যেরকম গন্ধ পেতাম। মনে হত একটা অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পৃথিবী শুধু আমার—শুধু আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

এই দুপুরের নিস্তব্ধ, গুনগুন, কাঁচ-পোকা-ওড়া জঙ্গলে এলে সেইসব পুরোনো, শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণ সবকিছু মনে পড়ে যায়। কেন জানি না, লতায় পাতায়, ঝরা-ফুলে, উড়ে-যাওয়া পাখির ডানায় চুমু খেতে ইচ্ছা করে—সমস্ত দুপুরের বনকে ছুটির কবোষ্ণ বুকের মত আমার মুঠোর মধ্যে ধরে থাকতে ইচ্ছা করে—একান্ত মালিকানায়। এই আশ্চর্য সবুজ শালীন সৌন্দর্যের ভাগ আমার অন্য কাউকেই দিতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ স্বার্থপরের মত আমার একারই করে রাখতে ইচ্ছা করে। সারাজীবন, সারাজীবন।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে অনবধানে লাবুর সেই ডেরায় পেঁৗছে গেছিলাম জানি না।

ওখানে পেঁৗছতেই লাবুর কথা মনে পড়ল। লাবু এখনও মান্দারে। আমি মাঝে একদিন গিয়ে দেখে এসেছিলাম ওকে! এখন ভাল আছে। আরও দিন চারেক লাগবে ভাল হয়ে উঠতে।

লাবুর অসুখে আমি যে কিছু করতে পেরেছি তার জন্যে আমার খুব আনন্দ হয়। কষ্ট করে, রাত দুটো অবধি লাইব্রেরীতে বসে পরদিন সারাবেলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে মেহনতের রোজগার—সেই মেহনতের টাকা কোনো যোগ্য কাজে লাগলে মন ভরে ওঠে।

মিস্টার বয়েলস্কে আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাসোহারা দিচ্ছি প্যাটের মাধ্যমে। এতে আমার যে কী আনন্দ হয় তা কি বলব। আমি জানি, উনি বেশীদিন বাঁচবেন না—তাই একজন মৃত্যুপথ-যাত্রীকে হাসিমুখে রওয়ানা করানোর মধ্যে একটা দারুণ গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আনন্দ পাই।

এ যুগে জন্মেও আমি খুবই সেকেলে রয়ে গেছি। আমি ভগবানে গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তাঁর উপর কোনোরকম ভরসা রাখি না বা তাঁর কাছে কিছু চাই না, কিন্তু আমাদের উপরে যে একজন অবিসংবাদী কেউ আছেনই তা নিশ্চয় করে বুঝতে পারি। তাঁর কাছে হাততালি পাবার জন্যে কিছুই করি না, পরজন্মের সুখের ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামের জন্যেও নয়। কারো জন্যে স্বার্থ ছাড়া কিছু করতে বড় ভাল লাগে, তাই করি।

আমার বন্ধুরা বলে, তুই বড় সেকেলে রয়ে গেছিস, আজকাল কেউ ভগবানে বিশ্বাস করে?

আমার বক্তব্য কিন্তু ওদের কখনও বুঝিয়ে বলিনি। ওরা কি করে জানবে, তারা-ভরা আকাশের নীচে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাচায় বসে হঠাৎ কোনো তারা-খসে যাওয়া দেখলে কেমন মনে হয়। সেই সব অন্ধকার রাতের স্তব্ধতার মধ্যে বসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করে চারপাশের এই পণ্ডিতপ্রবর মানুষদের পোকার চেয়ে একটুও বড় বলে মনে হয় না, মনে হয় না যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর সত্যতার সঙ্গে ভগবানের অস্তিত্বর চিরসত্যের কোনো সংঘাত নেই।

একসময় হাঁটতে হাঁটতে এসে লাবুর গুহার উপরে উঠে এলাম।

পাথরটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, যেমন করে ঢুকেছিলাম লাবুর সঙ্গে, প্রথম দিনে।

ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

উপরের পাথরটা সরাতেই আলোয় ভরে গেল গুহাটা।

দেখি সাদা পাথরের উপর কাঠ কয়লা দিয়ে লাবু লিখেছে—এক, মা। দুই, সুকুদা।

তারপরই আমার নামটা কেটে দিয়ে তার পাশে লিখেছে, নুড়ানি। তারপর তিন নম্বর দিয়ে আমার নাম লিখেছে।

গুহাটার মধ্যে এক কোনায় একটা মেয়েদের লালরঙা চুল-বাঁধা ফিতে, একটা ভাঙ্গা ছোট আয়না এবং হলুদ-রঙা কাঁচা কাঠের একটা মেয়েদের চুল আঁচড়াবার কাঁকই পড়ে আছে।

ফিতেটা তুলে ধরে দেখলাম, ফিতেটা নতুন নয়, ব্যবহার করে করে নোংরা এবং দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। কাঁকইতে কতগুলো সোনালি রঙা লম্বা চুল লেগে আছে।

লাবুর চুল বাদামী, সোনালী নয়; এত লম্বাও নয়। এ নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের চুল।

ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দূরে থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল। শম্বর বা বড় হরিণ দ্রুত দৌড়ে এলে যেমন আওয়াজটা হয় খুরের, তেমন আওয়াজ।

উপরের ফুটো দিয়ে জঙ্গলের যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজটা একেবারে কাছে এসে গেল, এসে থেমে গেল।

অবাক হয়ে দেখলাম, বড় বড় লোমওয়ালা একটা সাদা টাট্টু ঘোড়ার উপর একটি রুক্ষ বেদেনী মেয়ে বসে আছে।

তার বয়স বেশী নয়—বড় জোর চোদ্দ পনেরো। গায়ের রঙ ঘন তামাটে—দু'দিকে দুই বিনুনী—সোনালি চুলে ভরা, একটা হলুদ রঙের জামা এবং ক্ষয়েরী ঘাঘরা পরা। ঘোড়াটার পিঠে মেয়েটি একইদিকে দু'পা দিয়ে বসেছিল।

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ে কান নাড়ছিল।

দুপুরের রোদ তার বড় বড় লোমওয়ালা সাদা শরীরে পিছলে যাচ্ছিল।

ঘোড়াটা নাক দিয়ে একবার ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে শব্দ করল। ঐ শব্দে ভয় পেয়ে আশেপাশের শালের চারায় বসে-থাকা একদল টুঁই পাখি একসঙ্গে পিটী-টুঁই পিটী-টুঁই করে উড়ে গিয়েই কতগুলি সবুজ পুঁটকির মত সবুজতর জঙ্গলের পটভূমিতে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ মেয়েটি ডাকল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়, লাব্বু; লাব্বু।

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা তড়াক করে লাফিয়ে নেমে, ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুহার দিকে দৌড়ে এল। দৌড়াবার সময় ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

ঘাঘরাটা ফুলে উঠে দুলতে লাগল। আর ওর সোনালি বেণী দুটো ওর পেছনে সমান্তরাল-ভাবে উড়তে লাগল।

খালি পায়ে মেয়েটা পাথর টপকে টপকে পাহাড়ি ছাগলের মত এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসতেই দেখলাম, মেয়েটার হাতে কাঁচা শালপাতায় মোড়া কি যেন আছে। হয়ত কোনো খাবার-টাবার হবে।

যখন খুব কাছে এসেছে ও, তখন আমি হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে এলাম—কারণ তা না হলে গুহার মধ্যে ও চলে এসে লাবুকে না দেখে আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই ভয় পেত।

আমি বেরিয়ে গুহার উপরে উঠতেই মেয়েটা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

পরক্ষণেই ভয়ে বিস্ময়ে হাতের জিনিসটাকে ফেলে দিয়ে ও আবার ঘাঘরা উড়িয়ে তার বাদামী সুন্দর পায়ের আভাস দিয়ে বেণী দুলিয়ে দ্রুত দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠল।

তারপর দু'পা একদিকে দিয়ে বসে ও সেই অবাক জঙ্গলে এত জোরে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সেই ঝকঝকে রোদ্দুরের মধ্যে তার সাদা ঘোড়ায় চড়ে চলে যাওয়াটা একটা রুপালি চমকের মত আমার চোখে লেগে রইল।

ও চলে গেলে বুঝলাম যে, এইই নুড়ানী—যে লাবুর ভালোবাসার লিস্টে আমাকে পরাভূত করে আমার নামের উপরে বর্তমানে অবস্থান করছে।

টিটিটিকাবুীর জঙ্গল কোন্ দিকে, কতদূরে: তা আমি জানি না। এই বেদেরা কি ভাষা বলে তাও আমি জানি না। মেয়েটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে ডাকছিল লাব্বু, লাব্বু করে লাবুকে। বেদেদের ভাষা নিশ্চয়ই হিন্দীও নয়, বাংলাও নয়। তবে লাবু এবং মেয়েটি যে ভাষায় দু'জনে দু'জনের মনে পেঁছেছে, সেটা কোনো ভাষাবিদের এক্তিয়ারে নয়: সেটা চোখের ভাষা। অথবা হৃদয়ের।

লাবু ভালো হয়ে উঠলে লাবুর সঙ্গেই একদিন এই বেদেদের আস্তানায় যাওয়া যাবে।

কাঁচ শালপাতায় মুড়িয়ে মেয়েটি লাবুর জন্যে কি এনেছিল দূর থেকে তা বোঝা গেল না।

আমি নেমে গিয়ে শালপাতার আবরণ ভেদ করে আবিষ্কার করলাম।

দেখি খুব মোটা একটা রুটি। এরকম রুটি আমরা খাই না। দেখতে অনেকটা পাটনাই বাখরখানী রুটির মত। আর সঙ্গে একটা ঝলসানো তিতির।

এই ঠান্ডায়, কোনো খাবারই নষ্ট হয় না। তাই আমি লাবুর রাজপ্রাসাদ ভাল করে বন্ধ করে ফেরার সময় লাবুদের বাড়ি গিয়ে লাবুর ভাই ডাবুকে ওগুলো দিলাম, বললাম তুমি খেও। আর লাবু এলেই লাবুকে বলো যে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে আসব। ওর সঙ্গে কথা আছে আমার।

আর কিছু বলা গেল না। লাবু যখন আমার নাম এখনও ওর ভালোবাসার লিস্টে রেখেছে, তখন ওর প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার উচিত হবে না ভাবলাম।

ফেরবার সময়, কেবলি মেয়েটির নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। নুড়ানী; নুড়ানী।

লাবুর জন্যেও যে এই বনে পাহাড়ে নুড়ানীর মত একজন বেদেনী সমব্যথী থাকতে পারে তা আজ ঐ গুহায় না গেলে তা বিশ্বাস করতাম না, বিশ্বাস করতে চাইতামও না।

লাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর আসার পর হুঁশ হল যে পথ হারিয়ে ফেলেছি জঙ্গলে।

একটা বড় সেগুন গাছের নীচে এসে আমার ডানদিকে মোড় নেবার কথা ছিল, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে তা নিতে ভুলে যাওয়ায় এখন একেবারে অচেনা এক বনে এসে পড়েছি।

সূর্যের দিকে চেয়ে কোন দিকে গেলে চামার বড় রাস্তায় গিয়ে উঠব তার একটা আন্দাজ করে নিয়ে এগোতে লাগলাম আস্তে আস্তে। এখনও বেলা আছে অনেক। ঘাবড়াবার মত কিছু হয়নি।

বেশ অনেকক্ষণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার পর হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা বাড়ি। রঙ-চটা শ্যাওলাধরা জরাজীর্ণ একটা বাড়ি।

বাড়িটা ডালপালার আড়ালে ছিল বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না। বাড়িটার পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল।

আরো একটু এগোতেই হঠাৎ চিনতে পারলাম বাড়িটাকে। মিস্টার বয়েলসের বাড়ি। আমি পিছন দিক থেকে আসার জন্যে প্রথমে বুঝতে পারি নি। বাড়িটার কাছে এসেও তাতে কোনো প্রাণের আভাস দেখতে পেলাম না, গতবারেরই মতন।

কিন্তু কিচেনটা পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ কানে গেল কে যেন তীক্ষ্ণ অথচ ঘুম ঘুম গলায় কার সঙ্গে কথা বলছে।

বাড়িটার দৈর্ঘ্য পেরিয়ে সামনের বারান্দার পাশে এসেই চমকে গেলাম।

আমি রাবার-সোলের জুতো পরে হাঁটছিলাম—বাড়ির আশেপাশে শুকনো পাতাও ছিলো না—তাই আমার পায়ের শব্দ বোধহয় কারুরই কানে যায়নি।

চমকে গেলাম এই জন্যে যে, বৃদ্ধ অনর্গল একা একা বৃদ্ধা লুসির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন।

লুসি মিস্টার বয়েলসের সেই ক্ষয়ে-যাওয়া ইজিচেয়ারের পাশে তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে। মিস্টার বয়েলস্ ও লুসি, দু'জনের চোখই বিকেলের ম্লান জঙ্গলের দিকে। ওঁদের কাছে শুধু আমার অস্তিত্ব কেন, ওঁদের পিঠের পিছনে যে প্রাণবন্ত সজীব সশব্দ সুন্দর সবুজ পৃথিবীটা আছে সে সম্বন্ধে ওঁরা কেউই যেন সচেতন নন। অথবা সচেতনভাবে অচেতন। দু'জনের চোখই দিনশেষের ক্ষয়িষ্ণু গোধূলির পূবের আকাশে। যেদিকে সূর্য নেই।

বৃদ্ধর কোলের উপর ছোট একটা বই, বৃদ্ধ পড়ছিলেন, যেন লুসিকে শোনাবার জন্যেই—

"We brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. The Lord gave and the Lord hath taken away , blessed be the name of the Lord"

বৃদ্ধ এই অবধি পড়ে থেমে গেলেন, তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

আমার পা সরছিল না। ঐ কথাগুলোর তীক্ষ্ণ গভীরতা, ঐ পরিবেশে মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধ মানুষ এবং বৃদ্ধা বোবা কুকুরীর করুণ অসহায় অস্তিত্বর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা আমাকে যেন কি এক ব্যথাতুর তীব্র বোধে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃদ্ধ আবার পড়তে লাগলেন,

Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of Misery. He cometh up and is cut down like a flower ; he fleeth

as it were a shadow, and never continueth in one stay.

In the midst of life we are in death......"

এই অবধি পড়া হতেই লুসি হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাল, তাকিয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে ক্ষীণ ভুক্ ভুক্ স্বরে ডেকে উঠল।

মিস্টার বয়েলস্ মুখটা ঘোরালেন। মনে হল, মুখটা ঘোরাতে যেন তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল। উনি বললেন, 'ও, ইটস য়্যু। কাম, কাম-ইন মাই গুড ইয়াং ফ্রেন্ড।'

আমি বারান্দায় উঠে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, এটা কি বই? কি পড়ছিলেন আপনি?

মিস্টার বয়েলস্ বললেন, এটা বাইবেল।

কি পড়ছিলেন আপনি?

পড়ছিলাম, 'দা অর্ডার ফর দা ব্যেরিয়াল অফ দা ডেড।'

কেন জানি না, হঠাৎ আমার গা শিউরে উঠল।

কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই মিস্টার বয়েলস্ বললেন, তোমার জন্যে একটু চা করি।

আমি না, না করে ওঠার সঙ্গে উনি বললেন, আমিও খাব, তোমার একার জন্যে কষ্ট ত করছি না। এই সময়ই ত চিরদিন চা খাই।

বাইবেলটাকে চেয়ারের উপরে রেখে উনি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ভিতরে গেলেন। লুসিও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বইটা তুলে নিয়ে দেখলাম, পেজ-মার্ক দেওয়া আছে জায়গাটাতে। সত্যিই একটা আলাদা চ্যাপটার—'দা অর্ডার ফর দা ব্যেরিয়াল অফ দা ডেড'।

বইটির পাতা উল্টে পড়তে পড়তে দেখলাম, কতগুলো জায়গায় আন্ডারলাইন করা আছে।

আমি ভিতরে গিয়ে মিস্টার বয়েলস্‌কে সাহায্য করলাম। চায়ের সেই ক্যানেস্তারা-কাটা ট্রেটাকে নিয়ে বারান্দায় এলাম।

তারপর ভিতর থেকে একটা চেয়ারও নিয়ে এলাম।

চা বানালাম। মিস্টার বয়েলস্‌কে দিয়ে, নিজে নিলাম।

চা খেতে খেতে বললাম, আপনি এসব পড়ছেন কেন? তাড়া কিসের? তাছাড়া যে মারা যায় তার জন্যে ত এসব নয়। যাঁরা তাঁকে কবর দেবেন, তাঁদেরই বলবার ও গাইবার জন্যে।

মিস্টার বয়েলস্ হাসলেন।

সেই বিকেলে তাঁর হাসি অদ্ভুত দেখাল।

উনি বললেন, কাল রাতে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, যমদূত একটা কালো আলখাল্লা পরে হাতে একটা দাবার ছক নিয়ে এসে বলছে, আমার সঙ্গে দাবা খেলতে হবে তোমায়।

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, খেলে কি হবে?

সে বলল, খেলে কিছু হবে না। কিসেই বা কি হয়? সমস্ত জীবনটাই যেমন মিছিমিছি খেলা খেললে, তেমনই খেলবে।

এত খেলা ত খেললে সারা জীবন, দারুণ সীরিয়াস্‌লি খেললে। খেলে কি হল? কিছুতেই কিছু হয় না, তবু ত সকলে খেলে এবং এমনভাবে খেলে যেন খেলাটাই জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ—খেলার সার্থকতা বা বিফলতার মধ্যেই মানুষের অমরত্ব। সব বাজে, সব খেলা মিছিমিছি; এবার এসো শুরু করি।

আমি অবাক গলায় বললাম, আশ্চর্য! ঠিক এরকম একটা ঘটনা বার্গম্যানের একটা ফিলমে দেখেছিলাম—সমুদ্রের পাড়ে একটা পাথরের উপর বসে ফিলমের নায়ক মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলছে।

কোথায় দেখেছিলেন? মিস্টার বয়েলস্ শুধোলেন।

আমি বললাম, অনেকদিন আগে কোলকাতায় দেখেছিলাম, বার্গম্যানের ছবি, একটা ফিলম ফেস্টিভ্যালে।

তারপর বললাম, যাই হোক আপনি কি করলেন? খেললেন?

হ্যাঁ। খেললাম। বললেন, মিস্টার বয়েলস্।

তারপরই বললেন, এবং হেরে গেলাম।

হেরে যেতেই, যমদূত ছক গুটিয়ে উঠে পড়ে বলল আমার এবার যেতে হবে, অনেক খেলা

খেলতে হবে—মিছিমিছি। তৈরী থেকো; ফিরে আসছি। হাতে সময় বেশী নেই আমার।

আমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। কথা বললাম না কোনো। তারপর বললাম, আপনি তাহলে ভাবছেন আপনার এখ্খুনি যেতে হবে।

এক্ষুনি অথবা যখনি ডাক আসে। মিস্টার বয়েলস্ বললেন।

আমি বললাম, সত্যি করে বলুন ত, আপনার এই নির্লিপ্তি কি সত্যি? সত্যিই কি আপনি মরলে সুখী হন? মৃত্যু সম্বন্ধে আপনি সত্যিই কি এমন উদাসীন?

উনি বললেন, সুখী নিশ্চয়ই হই, কিন্তু আমাকে যতখানি নির্লিপ্ত দেখছ ততখানি আমি নই।

আমার এখ্খুনি রওয়ানা হতে হবে বলেই বোধ হয় গন্তব্যের কথা মনে হচ্ছে। গন্তব্য কি সত্যিই আছে কোনো?—না, শুধুই মিথ্যে সান্ত্বনা—'আর্থ টু আর্থ, এ্যাশেস টু অ্যাশেস, ডাস্ট টু ডাস্ট; উইথ শিওর এণ্ড সার্টেন হোপ অফ দা রেসারেকসান টু এটার্নাল লাইফ'।

কেন জানি না, মিস্টার বোস, এই শেষ প্রহরে আমার মন কেবলই বলছে—বারে বারেই বলছে; সব মিথ্যা কথা। রেসারেকসান বলে কিছুই নেই, আমাদের প্রত্যেকের, আমার তোমার, আমাদের একটাই এবং একইমাত্র জীবন।

আমার মোম গলে গেছে। তোমার মোম এখনও নতুন। তাই তুমিই ফুরিয়ে যাবার আগে একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি—। এই জীবনে কখনও ভুলেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু কোরো না। যা মন থেকে, হৃদয় থেকে করতে না চাও তা কখনও কোরো না। কারো কথাই শুনো না, বিবেকের না, সমাজের না, এমনকি বাইবেলেরও না।

আর একটা কথা; জীবনে যা নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বোধ দ্বারা বিবেচনা করে করেছ, করে ফেলেছ; কখনও তা নিয়ে আপশোস কোরো না। যাই করো না কেন, যা করেছ, তার জন্যে কারো কাছে ক্ষমা চেও না; নিজেকে অভিশাপ দিও না। যা করেছ, তা ঠিকই করেছ বলে মনে কোরো। সব সময় মনে কোরো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

তারপর বললাম, আপনি আপনার এই ফুরিয়ে-যাওয়ার বাবদে এতই নিশ্চিত জেনে একটা কথা জিগগেস করতে খুব ইচ্ছা করছে আপনাকে। জবাব দেবেন?

বল, বল; বলে ফেল নির্দ্বিধায়। মিস্টার বয়েলস্ বললেন।

আমি শুধোলাম, জীবনের শেষ সীমায় এসে আমাদের এই জীবনটাকে আপনার কেমন মনে হচ্ছে? এই অভিজ্ঞতাকে জীবনেরই আর অন্য কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যায় কি? সেরকম কোনো তুলনা কি মনে আসে জীবনের শেষে এসে?

মিস্টার বয়েলস্ আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একথা আমিও অনেকবার ভেবেছি। মনে মনে এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক নাড়া-চাড়াও করেছি, কিন্তু কখনও কেউ এমন করে জিগগেস করেনি বলে জবাব দেওয়া হয়নি। ভাবনাটাও বোধহয় দানা বাঁধেনি।

জানো, বোধহয় ঠিক ভাবে বলতে পারব না। তবে আমার যা মনে হয়েছে, বলছি। আমার সঙ্গে কি অন্য কারো সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতার মিল নাও থাকতে পারে। তবে আমার কথা সেদিনই মিলিয়ে দেখতে পারবে যেদিন তুমি আমার আজকের অবস্থায় পেঁছবে। তার আগে আমার কথা যাচাই করার সুযোগ পাবে না কোনো।

এই অবধি বলে উনি থেমে গেলেন।

চায়ের কাপটা কাঁপা-কাঁপা হাতে নামিয়ে রেখে বললেন, আমার মনে হয় কি জানো যে, জীবনে একটা সমুদ্রের মত—বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত—আবর্তময়। এ এক মত্ততায় ভরা ঢেউয়ের সমুদ্র, ঢেউ, তারপর ঢেউ তারপর আরো ঢেউ। এখানে অনেক ফেনা, ডুবে-যাওয়া; পাথরে আছড়ে-পড়া আবার আশ্চর্য-নীল—শান্তও কখনও কখনও। সত্যিই জীবন একটা দারুণ গোলমেলে নোনা-স্বাদে ভরা দুরন্ত অভিজ্ঞতা। আর আমরা, আমরা এই টুকরো টুকরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ সেই সমুদ্রের বুকে-ওড়া ছোট নরম সাদা সী-গালেদের মত। আমরা সমুদ্রকে ভয় পাই; আবার ভয় পাইও না। আমরা ছোট অথচ তবু বারে বারে সমুদ্রে ছোঁ মারি। কখনও মাছ পাই; কখনও বা পাই না, কখনও বা সমুদ্রপারের গুহার নীড়ে ফিরতে পারি; কখনও বা ঝড়ে-পড়ে জলে পড়ি ডানা-ভেঙে।

অথচ তবুও, আমরা সী-গালেদের মতই। তাই উষ্ণ হোক, শীতল হোক, মাতাল হোক, শান্ত

হোক, সমুদ্রই আমাদের জীবন—এই জীবনের জন্যেই আমাদের আকুতি, কান্না; আমাদের সমস্ত প্রার্থনা। এই জীবনকেই আমাদের ঘৃণা, আমাদের ভালবাসা, এর মধ্যেই বার বার ছোঁ-মেরে নামা, বারবার কাছে এসেই আবার দূরে উড়ে যাওয়া।

আমার মনে হয় না যে, এক-জীবনে জীবনের এই অতল সুনীল তলে কি আছে তা কেউ বুঝে যেতে পারে। বোঝা শেষ না বলেই বোধহয়, সমুদ্রের নোনা-স্বাদ, হু-হু হাওয়া ছেড়ে অন্য অজানা গন্তব্যে যেতে, যাবার সময় ভারী ভয় করে। মনে ভয় হয় যাবার দিনে, যে এই বুঝি শেষ—আর বুঝি কখনও ফেরা হবে না।

তখন কেবল সেই শেষের দিনেই বার বার মনে হয়, তবে কেন এ সমুদ্রে মনের সুখে অবগাহন চান করলাম না, কেন যা চেয়েছিলাম তাকে তেমন করে চাইলাম না, যা চাইনি তাকে তেমন করে লাথি মারলাম না। কেন মিথ্যে রেসারেকশানের মোহে পড়ে এই জীবন, এই একটাই রহস্যময় সুন্দর ও বীভৎস জীবনকে ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে উপভোগ করতে করতে পাড়ি দিলাম না। সারা জীবন কিসের ভয়, কিসের সংকোচ, কিসের দ্বিধা নিয়ে, কোন্ মিথ্যা পুণ্যের লোভে নিজেকে এমন করে ঠকালাম?

এই অবধি বলে, মিস্টার বয়েলস্ আমার দিকে তাকালেন।

উনি হাঁপাচ্ছিলেন।

একটু পর উনি বললেন, কি জানি ঠিক বললাম কিনা। ভয় হচ্ছে, বানিয়ে বললাম না ত? বানিয়ে বললাম?

আরো অনেকক্ষণ আমি ওখানে বসে রইলাম।

একটা ভয়াবহ বিষণ্ণতা আমাকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল, এই বুঝি কালো-আলখাল্লা-পরা যমদূত ফিরে এসে আমাকেও দাবা খেলতে বলে।

মৃত্যুর শমন যার উপর জারী হয়ে গেছে, তেমন কারো মুখোমুখি বসে থাকা, বড় অস্বস্তিকর। আমার জীবনের পরম, শেষ ও অমোঘ সত্যকে সামনাসামনি দেখতে আমার ভীষণ ভয় করছিল।

আমি কেন ভুল করে এখানে এসে পড়লাম এই বিকেলে কেবল তাই-ই ভাবছিলাম।

মিস্টার বয়েলস্, বারান্দার এক কোনায় রাখা কানা-উঁচু থালায় লুসিকে গরম চা ঢেলে দিলেন। লুসি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে চক্‌চকিয়ে সেই চা খেতে লাগল তার কুৎসিত জিভটা বের করে।

আমি বললাম, আমি এবার উঠব।

মিস্টার বয়েলস্ বললেন, এসো। থ্যাংক ট্যু ফর কামিং। প্যাটকে বোলো আমার জন্যে যেন কোলকাতার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এ তদ্বির না করে। মনে হয়, আরো কারো চ্যারিটিরই আমার দরকার হবে না।

আমি যখন উঠে আসছি, তখন উনি তাঁর শীর্ণ রগ-উঁচু, হাড় বের-করা ঠাণ্ডা হাতে আমার হাত ধরে বললেন, থ্যাংক ট্যু মাই বয়, থ্যাংক উ ফর এভরীথিং ট্যু হ্যাড ডান্ ফর মী। আই ওনলি উইশ, আই ওয়্যার ডেড আ লং এগো। থ্যাংক ট্যু ফর দা লিটল ওয়ার্মথ এট দা কোল্ডেস্ট আওয়ার।

আমি হেঁটে আসছিলাম মিস্টার বয়েলস্-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে।

সূর্য ডুবে গেছে।

পশ্চিমাকাশে একটা ম্লান আলোর আভা ঝুলে রয়েছে শুধু।

পাখিরা ডাক দিতে দিতে যে যার নীড়ে ফিরেছে, গরু মোষেরা গলার ঘণ্টা দুলিয়ে পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে ফিরে গেছে ওঁরাও রাখাল ছেলেদের সঙ্গে যে যার গ্রামে—। এখন উষ্ণতা শেষ হয়ে গেছে—! এখন শীত।

শীতের বেলা এখন থেকে।

দূর থেকে চামার লাল মাটির পথটা দেখা যাচ্ছিল। মধ্যে একফালি টাঁড়। পার্টাকলে টাঁড়ের শেষে ফ্যাকাশে লাল পথটা একটা অতিকায় সরীসৃপের মত শুয়ে আছে নির্জীব।

হঠাৎ ঐখানে এক মুহূর্তের জন্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম! কে যেন আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। একটি দিনের মৃত্যু ও একটি রাতের জন্মের ক্ষণিক পরিসরে আমি মস্তিষ্কের মধ্যে এক সুপ্ত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস শুনতে পেলাম।

এখন সব পাখি থেমে গেছে। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে প্রকৃতির সমস্ত শরীর। এই মুহূর্তটুকু পেরিয়ে গেলেই ঝিঁঝিরা ডেকে উঠবে, রাত-চরা পাখিরা বুকের মধ্যে চমকে চমকে চাবুকের মত ডেকে বেড়াবে পাহারতলিতে। শুধু এই আশ্চর্য ক্ষণটিতে; সমস্ত জীবন স্তব্ধ, অনিশ্চিত।

হঠাৎ এই উষ্ণতা ও শীতার্ততার মধ্যবর্তী শূন্য মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি ককিয়ে কেঁদে উঠে আমাকে বলল, একটা দিন মরে গেল, একটা ফুল ঝরে গেল। বলে উঠল,—সুকুমার বোস, যতদিন বাঁচো, দারুণভাবে বাঁচো, বাঁচার মত বাঁচো, বেঁচে থাকো, প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচো: হাঁটার জন্যেই শ্লথপায়ে হেঁটো না—কোনো এক বা একাধিক গন্তব্য খুঁজে নিয়ে সে-দিকে প্রাণপণ দৌড়োও। বেলা ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যে হয়ে আসছে: তাড়াতাড়ি দৌড়োও।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, পরমুহূর্তেই আমি দৌড়চ্ছি—অন্য দিকে, বিপরীত দিকে—যে দিকে মৃত্যু নেই, মিস্টার বয়েলস্-এর মত কোটরগত-চক্ষু—ভয়াবহ যমদূতের দাবা-খেলার সঙ্গীরা কেউ নেই—যেদিকে অন্ধকার নেই।

দৌড়তে দৌড়তে দেখতে পেলাম। দূ—রে আলো দেখা যাচ্ছে।

কোনো সাহেববাড়ির আলো। দেখলাম একটা আলোকিত বাড়ি—বুকের মধ্যে অনুভব করলাম, সেখানে ঘরের মধ্যে উষ্ণতা, ঘরের মধ্যে ভালোবাসা; একজন প্রেমিক পুরুষ, একজন প্রেমিকা নারী; সেখানে জীবন।

বাইরে শীত। বাইরে অন্ধকার।

আমি জোরে সেদিকে, উষ্ণতার দিকে দৌড়ে চললাম।

॥ উনিশ ॥

ছুটি একটা চিঠি লিখেছিল কোলকাতা থেকে।

ও কবে কোলকাতা গেছিল জানি না, তবে চিঠিটা পড়ে মনে হল, ও কোলকাতা যাবার আগে আমার এখান থেকে লেখা শেষ চিঠিটা পায় নি।

ছুটি লিখেছিল, আগামী শুক্রবার আমি কোলকাতা থেকে সোজা আপনার ওখানে যাব। বৃহস্পতিবার রাতে ডুন-এক্সপ্রেসে রওয়ানা হব—গোমো-বাড়কাকানা হয়ে আপনার ওখানে পৌঁছব। আমাকে নিতে স্টেশনে আসবেন। ট্রেন যতই লেট থাকুক, আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। দুজনে বাড়ি ফিরে একসঙ্গে খাব।

আপনাকে অনেক দিন দেখি না। খুব ইচ্ছা করে আপনার মুখোমুখি বসে গল্প করতে অনেক অনেকক্ষণ।

আপনি কেমন আছেন? আমি চমৎকার আছি। আপনি ত জানেন যে, আমি সব সময়ই চমৎকার থাকি। জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই—আমি জীবনে যা-যা চেয়েছি তেমন করে, সবই পেয়েছি। না-পাওয়ার জ্বালা বা ব্যর্থতা কি তা আমি কখনও জানিনি; জানতে চাইও না।

দেখা হলে কথা হবে। আপনাকে বলার জন্যে অনেক গল্প জমা করে রেখেছি। আমার প্রণাম জানবেন।—ইতি আপনার ছুটি।

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই শৈলেন এসেছিল।

এ শৈলেনের সঙ্গে আগের শৈলেনের কোনো মিল ছিল না।

শৈলেন যা বলল তাতে আমার মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাটা নতুন করে বিবেচনা করার ইচ্ছা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, প্যাটই বোধ হয় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। যেহেতু প্যাট মেয়েদের ঘৃণা করে।

নয়নতারা এখানে এসেছে আবার। ওর নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে একজন পোস্টমাস্টারের সঙ্গে। সেই পোস্টমাস্টারের নতুন চাকরী হয়েছে বাড়কাকানা এবং ডালটনগঞ্জের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে। চাকরী হয়েছে তবে এখনও পোস্টিং পায় নি।

নয়নতারা এখানে আবার এসেছে শুধু শৈলেনের অবস্থাটা কি তা রসিয়ে দেখবার জন্যে।

নয়নতারা যেসব চিঠি শৈলেনকে লিখেছিল, সেগুলো নাকি নয়নতারার নিজের লেখা নয়। অন্য কাউকে দিয়ে নেহাৎ শৈলেনের সঙ্গে মজা করবার জন্যেই ও চিঠিগুলো লিখিয়েছিল। এখানে এসে ওর আত্মীয়স্বজন এবং বিশেষ করে ওর সমবয়সী একজন আত্মীয়ার সঙ্গে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছে।

শৈলেনের ব্যাপারটা এখন এখানের সকলেরই জানা হয়ে গেছে। সকলেই শৈলেনকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করছে।

শৈলেনকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল।

যে কাউকে জীবনে তেমন করে ভালোবেসেছে এবং ভালোবেসে ভালবাসার জনকে পায় নি, একমাত্র সেই-ই জানে সেই ব্যর্থতার গ্লানি ও কষ্ট কি এবং কতখানি। শৈলেনকে কেউ বোঝে নি বরং না বুঝে অত্যন্ত স্থূলতার সঙ্গে তার পরম ব্যথার জায়গায় সকলেই নির্দয়ের মত হাত ছুঁইয়েছে এবং ওকে ব্যথা দিয়ে এক মোটা প্রাকৃত আনন্দ পেয়েছে।

শৈলেন বলল, দাদা, আমি ত ওর কোনো ক্ষতি করিনি, তবু কেন ও এমন করল আমার সঙ্গে? কারুর কাউকে ভালোলাগা কি অন্যায়? ভালোলাগা কি দোষের? ওর যদি আমাকে এমন অপছন্দই ছিল, ও ত প্রথমেই বলতে পারত আমাকে। যে কোনো মেয়েই ত বিয়ের আগে অথবা পরে এমন অনেকের স্তুতি কুড়োয়, কুড়োতে পারে—এই স্তুতি পাওয়া এবং গ্রহণ করা ত মেয়েদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু ও আমার সঙ্গে এই খেলা কেন খেলল, আমাকে ওর কাছে এবং সকলের কাছে এমন হেয় করল কেন বলতে পারেন? আমার মধ্যে কি ভালোবাসা পাবার মত কিছুই নেই?

আমি ওকে চা-টা খাইয়ে বুঝিয়ে বলেছিলাম, পাগলামি কোরো না। এরকম একজন বাজে মেয়েকে তুমি সত্যিকারের ভালোবাসনি এবং বিয়ে করে ফেল নি, এ তোমার সৌভাগ্য।

এসব মেয়ে সাংঘাতিক। এদের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখাই তোমার উচিত নয়। বুঝলে শৈলেন, এরকম নয়নতারা তোমার জীবনে অনেক আসবে। তোমাব উচিত, নয়নতারাকে দেখিয়ে তার সামনে তার চেয়ে অনেক ভালো মেয়েকে বিয়ে করা। কোনো দিক দিয়েই যে তুমি তাব অযোগ্য নও, ও তোমাকে পরিহাস করে যে ওর নিজের সমস্ত জীবন একটা শূন্য প্রচণ্ড পরিহাসে নিজেকেই ডুবিয়ে দিয়েছে ও তা জানুক। এমনি করেই এ-সব সস্তা মেয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে হয়। ও বাজে বলে তুমি নিজেকে বাজে ভাববে কেন?

শৈলেন বলেছিল, না, দাদা। আমি অনেক ভেবেছি, আমি তা পরব না। আমি যে ওকে ভালোবেসে ফেলেছি দাদা, আমি ত ওর সঙ্গে খেলা করিনি।—আমার মনে যতটুকু ভালোত্ব ও ভালোবাসা ছিল তার সবই যে আমি ওকেই, একমাত্র ওকেই দিয়ে দিয়েছি। দাদা, কি মনে হয় জানেন, ভালোবাসা হচ্ছে তীরের মত। তূণ থেকে বেরিয়ে চলে গেলে সে চলেই যায়, তার লক্ষ্যকে বিঁধতে পারে কি না পারে তা সেই তীরন্দাজের কপাল। কিন্তু ভালোবাসা ত পোষা কুকুর নয়, যে তাকে তুতু করে ডাকলেই আবার সে ফিরে আসবে।

আমি একেবারে গরীব হয়ে গেছি দাদা, আমার মনের মধ্যে দামী যা কিছু ছিল সব যে আমি ওকে দিয়ে ফেলেছি।

আমি বললাম, তোমার উচিত ওর সঙ্গে দেখা করা, দেখা করে সব খুলে বলা, ওকে বলা যে, তুমি মনে মনে কতখানি এগিয়ে গেছ ওর দিকে। বলে দেখ, ও কি বলে।

শৈলেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর মুখ নীচু করে বলল, দেখা করেছিলাম।

ও ত প্রথমে দেখাই করতে চাইল না। তারপর অনেকক্ষণ পর বাইরে এল। ও দারুণ সেজেছিল। চুলে ফুল গুঁজেছিল। ওকে দারুণ দেখাচ্ছিল। ও এসে বলল, বলুন আপনার বলার কি আছে।

ওকে দেখে কি মনে হল জানেন? মনে হল আমি ওদের বাড়িতে পাড়ার বকা-ছোকরাদের হয়ে সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেছি। আর ও হাত নেড়ে হবে না হবে না বলছে।

আমি বললাম, আমি কিছু বলতে আসিনি। আমার যা বলার আপনি ত তা জানেন, আপনার কিছু বলার আছে কিনা তাই শুনতে এসেছি।

নয়ন বলল, আমার কিছু বলার নেই। তবে এইটুকুই বলব যে, আপনার লজ্জা বা মান-সম্মান থাকলে আপনি আমাকে বাড়ি অবধি ধাওয়া করতেন না।

বলেই, ও উঠে চলে গেছিল।

আমি কিছু বলিনি জবাবে।

ওর আত্মীয়—যাঁর বাড়িতে ও এসেছে, তিনি নীচু গলায় বললেন, শৈলেন, কিছু মনে কোরো না। আমি ব্যাপারটার জন্যে খুব লজ্জিত এবং দুঃখিতও। তোমাকে আমি জানি, চিনি। তোমা সঙ্গে এই নোংরা খেলা খেলবার ওর কোনো দরকার ছিলো না। যার সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছে তাে আমি চিনি—সে বিয়েও পারিরতের বিয়ে—তবে ছেলেটি একটি বাঁদর। নয়নতারা তাকে কি দে ভালবাসল জানি না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর ত বলব, তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে ও অনে বেশী সুখী হত এবং আমি নিজেও খুব খুশী হতাম। কিন্তু অল্পবয়সী মেয়েরা, বিশেষ কা তারা যদি সুন্দরী হয়, তারা মনে করে তারা যা বুঝছে তা আর কেউই বোঝে না। তুমি কিছ মনে কোরো না। আমার এখানে নয়নতারা না এলে ত এ ব্যাপারটা ঘটত না, তাই আমার নিজে খুব অপরাধী লাগছে। তোমার কাছে নয়নতারার হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমি চলে এসেছিলাম। এরপর আর ত কোনো কথা বলার নেই দাদা, আর কিছু বল কোনো মানে নেই।

আমি শৈলেনকে বললাম, তাহলে আর কি করবে? মানিয়ে নাও। নিজেকে বোঝাও। এ নি মন খারাপ কোরো না।

শৈলেন অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর চকিতে বলল, আপনার কা অন্য কিছু শুনব বলে আশা করে এসেছিলাম।

আমিও অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে বললাম, আমার যে এ ছাড়া অন্য কিছু বলার নেই শৈলে

ও বলল, তাহলে আপনি আমাকে এখন কি করতে বলেন?

আমি বললাম, যা তোমাকে এক্ষুনি বললাম।

শৈলেন হঠাৎ দু' হাত মুখের সামনে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি ওর ঐ কান্নায় কোনো বাধা দিলাম না। কোনো কথা বললাম না। চুপ করে থেকে ও কাঁদতে দিলাম।

শৈলেন অনেকক্ষণ বাচ্চা ছেলের মত কাঁদল। তারপর লজ্জা পেয়ে জামার আস্তিন দি চোখ মুছল, জল-ভেজা চোখে বলল, আপনি আমাকে দেখে হাসছেন, না?

বললাম, হাসব কেন শৈলেন? হয়ত সঙ্গে আমিও কাঁদছি—তবে সে কান্না তুমি দেখতে পা না, এই যা। কথাটা কি জান শৈলেন, জীবনে অনেককেই এমন কতগুলো সংকটের সম্মুখীন হ হয় যে-সব সংকটে অন্য কেউই তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না। তোমার দেখতে পারে, মনে মনে তোমার প্রতি সমবেদনা জানাতে পারে, কিন্তু সাহায্য করতে পারে এই সংকট থেকে পেরুতে যা করবার তা তোমাকেই করতে হবে। একা একা তোমাকে। আ কেউই কোনো কাজে লাগব না।

শৈলেন মুখ তুলে বলল, আমাকেই করতে হবে? একা একা?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একা একা।

হঠাৎ শৈলেন উঠে পড়ল, বলল, ঠিক আছে। তাই করব। আপনি দেখবেন আমি যা ক করব।

বলেই শৈলেন সোজা খোলা-দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের ঝিঁঝি-ডাকা অন্ধকারে হারিয়ে গে

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কে কোথায় হারিয়ে যায় তা বোঝা যায় না।

আমি অনেকক্ষণ যেমন বসেছিলাম, তেমনই বসে রইলাম।

মনে মনে অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বললাম, শৈলেন, তোমার এই কান্নায় কোনো লজ্জা কাউকে ভালোবেসেছ তাতে লজ্জার কি আছে? ভালোবাসার সরল অপাপবিদ্ধ কান্নায় পরিহাসের রসদ খোঁজে তারা মানুষ নয়। এ কান্নায় তোমারই আত্মশুদ্ধি হল। তুমি জানো শৈলেন, মনে মনে তোমাকে এই মুহূর্তে আমি কতখানি ঈর্ষা করি, ঈর্ষা করি তোমার সরলত তোমার সুস্থ সাবলীল সহজ ভালোবাসার প্রকাশকে। যদি আমি তোমার মত কখনও ডাক- কাঁদতে পারতাম ত নিজের বুকের মধ্যে একটা মস্ত ভার হাল্কা হয়ে যেত।

মনে মনে বললাম, তুমি জানো না শৈলেন, আমাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যেই তোমার চে বড় কান্না আছে, থাকে; কিন্তু তা চাপা থাকে। সে কান্না নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিমু গুমরে মরে, কারণ আমরা তা প্রকাশ করার মত সুস্থ ও সহজ নই। তাই তুমি সে বাবদে আম

চেয়ে অনেক বড়।

নয়নতারারা আছে; তারা বরাবরই ছিল এবং হয়ত থাকবেও। কিন্তু নয়নতারাকে তোমার চোখের জলে আজ তুমি যে নৈবেদ্য দিলে সে নৈবেদ্য জীবনে আর কারো কাছ থেকে কখনও সে এমন করে পাবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রতিটি মেয়েই জীবনে ভালোবাসার নামে বহুবার যে সহজ পাওয়া পায়, তা ভালবাসা নয়; সেই জ্বলন্ত ক্ষণিক সস্তা পাওয়ার নাম নিছক কাম। তেমন ভালোবাসা নয়নতারাও এ-জীবনে অনেক পুরুষের কাছে পাবে—কিন্তু নয়নতারা যেখানেই থাকুক, যার ঘরেই থাকুক, যার বুকেই থাকুক, সে যদি মানুষী হয়, তবে সে তার হৃদয়ে নিশ্চয় করে একদিন জানবেই যে, শৈলেন তাকে যা দিয়েছিল, দিতে পেরেছিল, অন্য কেউই তাকে তা দিতে পারে নি, দিতে চায় নি। এমন পাওয়া সকলের কাছ থেকে পাওয়া যায় না—জীবনে একবার কি দুবার এমন পাওয়া কারো কপালে জোটে।

যেমন নয়নতারার বয়স বাড়বে, তার অল্প বয়সের ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবনাগুলো মিলিয়ে গিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার পরশ লেগে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে, সে তেমনই এবং তখনই নিশ্চয়ই বুঝবে যে, তার জীবনে শৈলেন ঘোষ একজনই এবং একমাত্র শৈলেন ঘোষই ছিল। অন্য যারা আসবে যাবে সে সব রাম, শ্যাম, যদু, মধুদের ও কখনও তেমন করে মনে রাখবে না। মনে রাখবে একমাত্র শৈলেনকে। যারা ভালোবেসে ভালোবাসার জনকে পায় না, তাদের সবচেয়ে বড় জিত বুঝি এইখানে। এই না-পাওয়াও একটা দারুণ পাওয়া।

ব্যর্থ প্রেম বা ব্যর্থ প্রেমিক বলে কোনো কথা কখনও আছে বা ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রেম, সে যার প্রেমই হোক, সে যদি সত্যিকারের প্রেম হয় তা কখনই ব্যর্থ হয় না। প্রেমের সমস্ত সার্থকতা প্রেমাস্পদকে পাওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়। তাকে পাওয়া যেতে পারে; নাও যেতে পারে। প্রেমের সবচেয়ে বড় গৌরব প্রেমই। মানুষের জীবনে আর কোনো অনুভূতিই তাকে এমন এক আত্মিক উন্নতির চৌকাঠে এনে দাঁড় করায় না। যে ভালোবাসে সে নিজের অজানিতে কখন যে নিজের মনের আঁটসাঁট গরীব কাঠামোর চেয়ে অনেক বড় হয়ে যায়, সে নিজেও তা বুঝতে পারে না। অন্য কোনো অনুভূতিই তাকে এমন করে মহৎ, উদার ও উন্নত করে না। ভালো যে বাসে, সে ভালোবেসেই কৃতার্থ হয়; যাকে ভালোবাসে তার কৃপণতা বা উদারতার উপর তার ভালোবাসার সার্থকতা কখনও নির্ভরশীল হয় না।

এত কথা বলার মত অবকাশ আমার ছিল না, শোনার মত মনের অবস্থাও ছিল না শৈলেনের। তাছাড়া মনের মধ্যে যা আনাগোনা করে, বুড়বুড়ি তোলে অনুক্ষণ, সে সমস্ত কথা কাউকে মুখে বলাও যায় না। কারণ তা বললে যাত্রার ডায়ালগের মত শোনায়। যদিও মনে মনে আমরা সকলেই এক অশেষ-যাত্রার এক-একটি রং-মাখা চরিত্র কিন্তু যাত্রার পোশাকে মনের বাইরে আসতে আমরা কেউই চাই না।

তাই শৈলেনকে যা বলব ভেবেছিলাম, যা বলা উচিত ছিল, তার কোনো কিছুই সেদিন বলা হল না।

শৈলেন চলে যাবার পরও আমি অনেকক্ষণ একা একা বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম, খেয়াল ছিল না, হঠাৎ দেখি লাবুর ভাই ডাবু এসে উপস্থিত।

বললাম, কি খবর?

ডাবু বলল, লাবু আজ ফিরেছে। আপনাকে কাল যেতে বলেছে।

কেমন আছে ও?

ভালো আছে। কাল-পরশু থেকে বাইরে যেতে পারবে বলেছেন ডাক্তার। তবে কিছু দিন ত দুর্বল থাকবেই।

আমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছিল। ডাবুকেও বললাম খেয়ে যেতে। গল্প-সল্প করে খাওয়া-দাওয়ার পর ডাবু চলে গেল।

পরদিন ভোরেই উঠে লাবুদের বাড়িতে গেলাম।

মাসীমা মুড়ি মেখে চা দিয়ে খেতে দিলেন।

লাবু হাসপাতালে এ ক'দিন নিয়মে থেকে ও ভাল খেয়ে-দেয়ে চেহারাটা বেশ ভাল করে ফিরেছে। লাবু যেন এ ক'দিনে অনেক বড়ও হয়ে গেছে। ও যেন আর সেই ছোট ছেলেটি নেই। কৈশোর শেষের সেই টিয়া-রঙা দিনগুলো তাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে আছে।

ও শীগ্‌গিরই যেন অসময়ে যৌবনের রুক্ষ সুন্দর পুরুষালি উপত্যকায় পা দেবে বলে ছটফ করছে।

ঘর ফাঁকা হলেই লাবু এবং আমি স্বচ্ছন্দ হয়ে কথা বলতে পারলাম।

লাবু বলল, ফিসফিস করে, ঐ রুটি ও তিতির আপনি কোথায় পেলেন?

বললাম, তোমার গুহায় বসেছিলাম, নুড়ানী তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিল। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল সাদা ঘোড়ায় চেপে। তোমার জিনিস, তাই তোমার বাড়িতে পৌঁছে দি গেছিলাম।

লাবু বলল, সুকুদা, আপনি একটা কাজ করবেন?

বললাম, কি?

আপনি একবার ইটিটিকারীর জঙ্গলে যাবেন? নুড়ানীর জন্যে আমি সেই পাখিটাকে রো দিয়েছিলাম।

কোন্ পাখিটা?

সেই ঝড়ে-পড়া পাখিটা। সেই হলুদ-বসন্ত পাখিটা।

তুমি না বলেছিলে—ওটাকে সারিয়ে তুলে, বাঁচিয়ে তুলে, বনে উড়িয়ে দেবে।

বলেছিলাম, কিন্তু নুড়ানী যে পাখিটাকে চাইল; বলল ও পুষবে।

তুমি না বলেছিলে, উড়িয়ে না দিলে পাখিকে বাঁচিয়ে লাভ কি?

বলেছিলাম, কিন্তু নুড়ানী যে চাইল। ঐ পাখিটাকে ছাড়া ওকে দেবার মত ত আমার কিছ নেই। ও যে আমাকে অনেক জিনিস দেয়।

আমি বললাম, নুড়ানীর কাছে আমি হেরে গেছি—নুড়ানীর উপর আমার খুব রাগ আ তুমি আমার নাম কেটে ওর নাম লিখেছ কেন?

লাবু ভাঙ্গা দাঁত বের করে দেবশিশুর মত হাসল। বলল, আপনি ভীষণ হিংসুটে। আপ ভাল, নুড়ানীও ভাল। নুড়ানী আপনার চাইতে ভাল। কেন ভাল তা আমি বলতে পারব ন মানে, বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আমি একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, দেখলাম ওর চোখ দুটো কি এক দারুণ চি উজ্জ্বলতায় জ্বলছে। কোনো স্ট্রেপটোমাইসীন বা কোনো দিগ্বিজয়ী ডাক্তারের ধন্বন্তরী দাও এমন উজ্জ্বলতা আনতে পারে না কারো চোখে। এ উজ্জ্বলতা বন্ধুত্বের দান, সখ্যতার দান।

ওকে শুধোলাম, ইটিটিকারী কোন্ দিকে আমাকে বলে দাও, আর পাখিটাও দাও। এখ না রওয়ানা হলে রোদ চড়া হয়ে যাবে।

ও আমাকে ইটিটিকারী যাবার রাস্তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল।

আমি বললাম, আমাকে দেখে যদি নুড়ানী পালিয়ে যায়?

লাবু বলল, পাখিটা দেখলেই ও আপনার কাছে আসবে। পালাবে না, দেখবেন।

এমন সময় মাসীমা ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকতেই লাবু বলল, মা, সুকুদাকে পাখিটা দাও না। সুকুদা পুষবে বলেছে।

লাবু খুব সপ্রতিভভাবে মিথ্যা কথাটা বলল।

মাসীমা ছোট্ট একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে বানানো লাবুর তৈরী খাঁচায় করে পাখিটাকে আমার হাতে দিলেন, বললেন, বাঁচালে বাবা। আকাশ সুদ্ধু পাখি থাকতে খাঁচার মধ্যে তোমরা কেন পুষতে চাও জানি না। তবে তুমি নিয়ে যাও। আমার চোখের সামনে ও ডানা ঝাপ না যে খাঁচার দেওয়ালে, এইটুকুই সান্ত্বনা।

আমি পাখিটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দরজা অবধি যেতেই লাবু বলল, সুকুদা কিছুক্ষণ পরে আসবেন ঘুরে।

লাবুর দিকে তাকিয়ে ওর কথার মানে বুঝলাম। বললাম, আসব।

মাসীমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, এসো আবার।

এখান থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে প্রায় মাইল দুয়েক রাস্তা। আঁকাবাঁকা লাল ম পথ পাহাড়, উপত্যকা, খোয়াই ও ঝর্ণা পেরিয়ে চলে গেছে। আলোছায়া কাটাকুটি খেলছে পথ নানান পাখি ডাকছে চতুর্দিকে। একটা সাদা আর কালো প্রজাপতি আমার সামনে সামনে চলেছে—যেন পাইলটিং করছে আমাকে।

কিছুদূর যেতেই বাঁয়ে একটা ন্যাড়া টিলা চোখে পড়ল। টিলাটার নীচে একটা দোলা মত। তাতে পাঁচটা বুনো শুয়োর ঘোঁত-ঘোঁত, ফোঁৎ-ফোঁৎ আওয়াজ করে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কি যেন খাচ্ছে।

আর একটু এগোতেই একটা বিরাট বেজী পথের ডানদিক থেকে বাঁদিকে দৌড়ে গেল। দূরে ডানদিকে একটা ন্যাড়া শিমুল গাছের ডালে অতিকায় কালো ফলের মত অনেকগুলো শকুন ঝুলে আছে। গাছটার কিছু দূরে একটা লাল-রঙা গরু মাটিতে পড়ে আছে। বোধহয় সাপের কামড়ে মারা গেছে।

বেশ অনেকক্ষণ হাঁটার পর দূরে থেকে একটা চওড়া নদীর ফিকে-গেরুয়া আঁচল দেখা গেল। নদীটার কোল থেকে ধুঁয়োর কুণ্ডলী উঠছিল।

আরো একটু এগোতেই কোলাহল কানে এল নারী ও পুরুষ কণ্ঠের মিশ্র ভাষায়। সে ভাষা আমি বুঝি না। ছাগলের ব্যাঁ ব্যাঁ রব, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, সব মিলিয়ে নদীর দিকটা গমগম করছে।

দূরে থেকে পুরো ছবিটা আমার চোখে ফুটে উঠল।

ছেলেরা ধুতি ও কামিজ পরা। মেয়েদের পরনে রঙীন ঘাঘরা চোলি। তারা সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। কতগুলো সাদা ধবধবে ছাগল—তাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা—তারা মাথা নাড়লেই টুং-টাং করে ঘণ্টা বাজছে। দুটো বেশ বড় ভালুক গাছের সঙ্গে বাঁধা। একটা অন্যটার পেটে ঢুঁ মারছে। কতগুলো ঘোড়া। ক্যারাভানের মত অথচ খুব সরু ও হালকা তিনটে পর্দা-দেওয়া গাড়ি। এতে বোধ হয় মেয়েরা ও বাচ্চারা রাতে শোয় এবং দূরের পথে পাড়ি দেয়।

একজন বেদেনী সেগুন গাছতলায় বসে আত্মবিস্মৃত হয়ে তার সুন্দর সুডৌল বাদামী বুক বের করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। একজন বুড়ো বয়স্ক বেদে একটা বড় কালো পাথরে বসে লম্বা বাঁশের তৈরী পাইপ খাচ্ছে। কতগুলো বাচ্চা এদিক-ওদিকে মায়েদের পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছে। একজন তার মায়ের পায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ায় অসাবধানী মা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। মাটি থেকে উঠেই সে ধাঁই-ধাঁই লাগাল বাচ্চাটার পিঠে।

আমি আস্তে আস্তে বুড়োটার কাছে গিয়ে পৌঁছতেই—ওদের প্রত্যেকে হঠাৎ যেন স্ট্যাচু হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত যে যেমন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে বা বসেছিল ঠিক সেই সেই ভঙ্গিমায় ফ্রিজ করে গেল। তার পরই আবার তারা নড়ে-চড়ে উঠল।

আমি বুড়োকে গিয়ে বললাম, নুড়ানী, নুড়ানী হ্যায়?

আমি পাখিটাকে তুলে ধরলাম। পাখিটাই আমার এই সাম্রাজ্যে আসার ছাড়পত্র। বললাম, লাবুনে ভেজা।

কওন?

আমি আবার বললাম, লাব।

বুড়ো মুখ থেকে পাইপ বের করে উঠে দাঁড়াল। বুড়োর মুখে হাসি ফুটল; বলল, ওঃ লাব্বু বাবু? ক্যা হো গীয়া লাব্বু বাবুকো? আতে নেহি হ্যায় বিলকুল।

আমি বললাম, বিমার থা। অব আয়েগা।

বুড়ো আমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না করে ডাকল, নুড়ানী, নুড়ানী। কাছেই জঙ্গলের আড়ালে ছিল নুড়ানী। সেখানে কি করছিল জানি না, হয়ত কোন মূল খুঁড়ছিল বা ফল পাড়ছিল। নুড়ানী একটা আওয়াজ দিল। আওয়াজটা আমার কানে মনে হল 'হাতুম' বলে।

একটু পরে নুড়ানী এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

এবারে সেই চকিত ঝলক নয়। আমার লাবুবাবুর সমস্ত নুড়ানী তার সমস্ত বাদামী আর্যা-বর্তের শরীর ও সোনালী চুল নিয়ে আমার সামনে রোদের মধ্যে মুখ নীচু করে এসে দাঁড়াল।

মনে মনে ভাবলাম, লাবুর রুচি আছে; কপালও আছে।

বললাম, লাব্বুনে ভেজা, বলে পাখিটা উঁচু করে ধরলাম। খাঁচাসুদ্ধ।

মুহূর্তের মধ্যে নুড়ানীর চোখমুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাঁচ বছরের মেয়ের মত ও আগল-খোলা সংস্কারহীন হাসি হেসে উঠল ঝক-ঝক করে—হেসে উঠেই পাখিটাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওকে দেখে আমার তখন মনে হল যে, ও হয়ত লাবুর সমবয়সীই হবে। ওর গড়নটা হয়ত বাড়ন্ত; সে জন্য বড় দেখায়। নইলে নিছক একটা পাখি দেখে, সে হলুদ-বসন্ত পাখিই হোক

আর যে পাখিই হোক, একটা নিছক পাখি দেখে বা পেয়ে এমন উল্লসিত হওয়া যায় না যৌবনে পা দিয়ে।

কোন বেদেনী মেয়ের পক্ষে ত নয়ই।

ওকে হাসির ঝরনা ঝরিয়ে বেণী দুলিয়ে ঘাঘরা উড়িয়ে অন্য এক ঝরনার মত চলে যেতে দেখতে আমার দারুণ লাগল।

সেই সকালটা এক শান্ত স্বার্থহীন সুন্দর সুস্থ ভালো লাগায় ভরে গেল।

ওরা আমাকে বসতে বলল না, আপ্যায়ন করল না, এক আশ্চর্য রাজ্যের রাজকুমারীর কাছে জঙ্গলের রাজা লাবুর দূত হয়ে আমি এসেছিলাম, আবার সেই রাজকুমারীর নীরব বাণী বয়ে রাজা লাবুর রাজত্বের দিকে ফিরে যাব।

যাবার জন্যে পিছন ফিরেছি এমন সময় চৌকিদারের সঙ্গে দুজন লাল-পাগড়ি খাকি-পোশাকের ছড়ি-হাতে পুলিশকে আসতে দেখলাম।

পুলিশ আসতে দেখে বেদেদের দলে একটা চমক লাগল। হাঙ্গরে তাড়া-করা মাছের ঝাঁকের মত ওরা দল ভেঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল।

শুধু বুড়ো সর্দার যেমন বসেছিল, তেমনই বসে বসে পাইপ খেতে লাগল। তার পাইপ থেকে হুঁকোর মত একটা গুড়গুড় আওয়াজ বেরোতে লাগল।

সর্দার আমার দিকে একবার ঘৃণার চোখে তাকাল। বুঝলাম, সর্দার ভেবেছে, আমিই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি।

চৌকিদারকে কি ব্যাপার শুধোতেই ও বলল, এরা আসার পর অনেকের অনেক কিছু চুরি গেছে। গরু, ছাগল, ক্ষেতের ফসল। দূরের থানায় রিপোর্ট করেছেন ম্যাকলাস্কির সাহেবরা। আমাদের উপর অর্ডার হয়েছে এদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষুনি।

বুড়ো সর্দার সব শুনল। তার মুখ দেখে মনে হল চুরি করেছে এবং করছে বলে কোনো অনুশোচনা তার নেই। তারা জন্মে অবধি চুরি করতে শিখেছে, তবে চুরি করে ধরা পড়ে গেছে শুধু এই জন্যে যা একটু অস্বস্তি।

সর্দার বলল, খুঁজে দেখো, যা চুরি গেছে তা আমাদের এখানে আছে কিনা।

চৌকিদার বলল, তাহলে তোমাদের পেট চিরে দেখতে হয়—সব ত পেটে ঢুকেছে এতক্ষণে—তা কি আর বাইরে আছে?

সর্দার বলল, ঠিক আছে। আমাদের চার পাঁচ ঘণ্টা সময় দাও। মেয়েরা অনেকে জঙ্গলে গেছে—তারা ফিরে আসুক, আমরা খেয়ে-দেয়েই অন্যত্র পাড়ি দিচ্ছি।

পুলিশরা বলল, আমরা সার্চ করব।

সর্দার বলল, করো।

তারপর পুলিশরা তাদের সেই ক্যারাভানের মত গাড়িগুলোতে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ে সবকিছু তছনছ করে সার্চ করতে লাগল।

ওরা যখন চলে যাবেই বলেছিল, তখন এর কোনো দরকার ছিল বলে আমার মনে হলো না। তবু ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, পুলিশরা তেমনই সার্চ করতে আরম্ভ করল। কোনো-রকম হেনস্থা বা উত্যক্ত না করে চলে গেলে পুলিশের পুলিশত্ব থাকে না এদেশে। বিশেষ করে এই বেদেরা যখন চাঁদির জুতো মেরে এদের জুলুম বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে না।

একজন পুলিশ একটি অল্পবয়সী সুন্দরী বেদেনীর হাত ধরে ফেলল। হাত ধরে তার বুকের মধ্যে গুঁজে-রাখা একটা লাল সিল্কের স্কার্ফ টেনে বের করল। বের করেই বলল, কাঁহাসে মিলা? মেয়েটা জবাব দেওয়ার আগেই পুলিশটা আবার তার জামার মধ্যে দিয়ে বুকে হাত দিল।

কোথা থেকে কি করে ব্যাপারটা ঘটল জানি না, মুহূর্তের মধ্যে সর্দার তার পায়ের কাছ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সাঁ করে ছুঁড়ে মারল। অদ্ভুত নিশানা সর্দারের। মেয়েটা এবং পুলিশটা একই রেখায় দাঁড়িয়ে ছিল—কিন্তু পাথরটা গিয়ে সজোরে পুলিশের মাথার পেছনে লাগতেই সে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা একটা খণ্ডযুদ্ধের রূপ নিল। বেদে এবং বেদেনীরা দেখতে দেখতে চৌকিদার এবং পুলিশ দুজনকে ধরে গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। কোথা থেকে এল জানি না, মুহূর্তের মধ্যে নুড়ানী তার সাদা টাট্টুতে চড়ে ফিরে এল—এসে একটা হালকা বেত নিয়ে সপাং সপাং করে ওদের মুখে ও ভুঁড়িতে চাবুক মারতে

লাগল—ঘোড়ায় চেপে ঘুরে ঘুরে।

অন্যরা তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগল।

সর্দার আমাকে নীচু গলায় বলল, তুম ভাগো বাবু। তুম লাম্বুকা আদমী হ্যায়, উসীসে আজ বাঁচ গ্যয়া।

আমি যত জোরে পারি ফিরে এলাম। মেয়েটাকে অসম্মান করার যোগ্য শাস্তি ওরা দিয়েছে বলে মনে মনে ওদের উপর আমি খুশীই হলাম।

লাবুদের বাড়ি পৌঁছে দেখি লাবু খেতে বসেছে। লাবুকে একলা পেতেই ঘটনাটা লাবুকে বললাম। বললাম, নুড়ানীরা এক্ষুনি চলে যাচ্ছে।

লাবু খাওয়া থামিয়ে রেখে বলল, কোথায়?

তা জানি না। কোথাও জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে যাবে।

লাবু শুধু বলল, 'অ'।

ও আর কোনো কথা বলল না।

আমি বাড়ি ফিরে মালুকে দিয়ে থানায় একটা খবর পাঠালাম।

আমার সাক্ষাতেই পুলিশদের দুর্গতি হয়েছিল। তা জানার পরও থানায় একটা খবর না দিলে পরে বেদেদের সঙ্গে আমার সাঁট ছিল এমন দুর্নাম রটা অস্বাভাবিক নয়।

তবে মালু খাওয়াদাওয়া করে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে যেতে অনেকক্ষণের ব্যাপার। চার মাইল পথ। সেখানে খবর পেয়ে অন্য পুলিশরা সেখান থেকে ছ মাইল ইটাটিকারী পৌঁছতেও অনেকক্ষণ। ততক্ষণে লাবুর নুড়ানী এবং তার দলবল গভীর জঙ্গলে উধাও হয়ে যাবে!

সেখান থেকে তাদের খুঁজে বের করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা লাঠিহাতে ভুঁড়িওয়ালা পুলিশদের হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। মনে মনে আমি নুড়ানীদের মঙ্গল কামনা করছিলাম। ওরা যেন সভ্যতার সমাজের নোংরা সৃষ্টি পুলিশদের নাগালের অনেক বাইরে চলে যায়, সেখানে ওদের কেউ খুঁজে পাবে না। জঙ্গলের মধ্যেই জংলী বেদেদের মানায়, সেখানেই তাদের সত্যিকারের জায়গা, ওরা যে কেন লোকালয়ের কাছে আসে জানি না। মনে মনে কামনা করছিলাম যে ওরা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছাক যেখান থেকে কেউ যেন ওদের খুঁজে না বের করতে পারে।

আগামীকাল শুক্রবার। কিন্তু হাট বিকেলে। তাই যখন রহমান সবজিওয়ালা এল তখন কিছু আনাজ রাখলাম। মুরগীর ডিম আনতে পাঠালাম সুরজ শর্মার দোকান থেকে এক ডজন। কাল দুপুরে ছুটির জন্যে রান্না করিয়ে রাখতে হবে।

মালুকে বলে দিয়েছিলাম যেন ফেরার সময় হাসানকে খবর দিয়ে রাখে—যাতে হাসান কাল সকালেই চলে আসে।

ছুটির চিঠি পড়ার পর থেকে যখনি কথাটা মনে হয়েছে, তখনি নিজেকে অপরাধী লাগছে। ছুটি জানে না এখনও যে আমার মনে এক দারুণ সন্দেহের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। তা ও আমার চিঠি পড়ার পরই জানতে পাবে। অথচ ও তা না-জেনে কেমন সরল খুশী মনে আমার কাছে আসছে।

যে চিঠি লেখা হয়ে গেছে তাকে ফেরানো যায় না—উপায় থাকলে সে চিঠি ফিরিয়ে আনতাম—কিন্তু এখন সে চিঠি রাঁচী পৌঁছে ছুটির লেটার বক্সে একটা বিষের বিছের মত কুঁকড়ে পড়ে আছে। লেটার-বক্স খুলে তাতে হাত ছোঁওয়াতেই ছুটি হয়ত কেঁদে উঠবে যন্ত্রণায়।

এখন আমার অন্য কিছু করণীয় নেই।

গতকাল রমা একটা চিঠি লিখেছিল। লাইব্রেরী পরিষ্কার করিয়ে রাখছে—যাতে আমি এলে অসুবিধা না হয়। লিখেছে কবে ফিরছি জানাতে, যাতে আমার স্টেনোগ্রাফারদের ও জুনিয়ারদের জানিয়ে রাখতে পারে। লিখেছে, স্টেশানে গাড়ি পাঠাবে এবং পারলে ও নিজেও আসবে।

আরও লিখেছে যে, 'আশা করি এতদিনে তোমার মাথা থেকে ছুটির পেত্নী নেমেছে। আমি ভাবতে পারি না, তুমি কি করে এমন জাত-বংশ-এ্যারিস্টোক্র্যাসীহীন অতি সাধারণ একজন মেয়ের খপ্পরে পড়লে। কেন পড়লে?'

সন্ধ্যে হয়ে গেছে একঘণ্টা, এমন সময় ডাবু এল। ডাবু বলল, লাবু কি এখানে আছে?

কেন? লাবু বাড়িতে নেই? আমি শুধোলাম।

না। আপনি চলে আসার পরই ও মাকে বলে বেরিয়েছিল, বলেছিল, মা একটু রোদ পুইয়ে আসি। ঘরে বড় ঠান্ডা লাগছে। তারপর এখনও ফেরেনি।

হঠাৎ আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বললাম, ওর একটা লুকিয়ে-থাকার জায়গা আছে, তুমি চেন সে জায়গা?

না ত। ডাবু বলল।

আমি বললাম, চল ত আমার সঙ্গে একবার সেখানে দেখে আসি। শরীর ভালো না, হয়ত ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়েছে।

টর্চ নিয়ে ডাবুর সঙ্গে যখন লাবুর সেই গুহায় পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় আটটা বাজে।

গুহার পাথর সরাতে গিয়ে দেখি পাথরটা সরানোই আছে। ভিতরে ঢুকে টর্চ জ্বালিয়ে দেখলাম লাবুর চিহ্ন নেই। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার গুহার মধ্যে যা যা ছিল সবই আছে—শুধু নুড়ানীর সেই চুল বাঁধা ফিতে এবং কাঁকইটা নেই—আর নেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সেই মলাট-ছেঁড়া 'চাঁদের পাহাড়' বইটা।

আমি বললাম, না। এখানে নেই!

ডাবু উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, তবে কোথায় গেল?

আমি বললাম, কি করে জানব বল? সাপে-টাপে কামড়ায়নি ত?

ডাবু বলল, শীতকালে সাপের ভয় ত তেমন নেই।

তবে?

ডাবু বলল, নিশ্চয়ই বেদেরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। বললাম, তোমার তাই মনে হয়?

নিশ্চয়ই তাই। ডাবু বলল, ওর শরীর এখনও যথেষ্ট খারাপ। ও নিজে ভাল করে হাঁটতেও পারে না। ও কোথাও যেতে পারবে না এই অবস্থায় একা একা। এখন কি হবে সুকুদা!

আমি বললাম, পুলিশে খবর দাও এক্ষুনি!

পুলিশে গরীব লোকের অভিযোগ শুনবে না সুকুদা। তাছাড়া পুলিশই বা ওদের ধরবে কি করে? ওদের ত কোনো ঠিকানা নেই; বাড়ি নেই। ঠিকানাওয়ালা লোকদেরই পুলিশ ধরতে পারে না, তার ঠিকানা-ছাড়া বেদেদের ধরবে কি করে?

আমি বললাম, তবুও পুলিশে খবর দাও এক্ষুনি। চারদিক সকলের বাড়ি আবার খুঁজে দেখো।

গুহা থেকে বেরোবার সময় আমার টর্চের আলো পড়ল দেওয়ালে। হঠাৎ চোখ পড়ল, লাবু কাঠকয়লার টুকরোটা দিয়ে আবার সেই লিস্টে কাটাকুটি করছে।

এতদিন মা একনম্বর ছিল। এখন মার নামও কাটা গেছে। সবচেয়ে উপরে লেখা আছে—১। নুড়ানী।

তারপর মার নাম, নুড়ানীর আগের নামের পাশে লিখেছে দু' নম্বর দিয়ে। আমার নাম এখন তিন নম্বর হয়ে গেছে।

পুলিশে খবর দিতে যেতে হয়নি।

চৌকিদার ও সেই দুজন পুলিশকে উদ্ধার করে অন্যরা সোরগোল করতে করতে ফিরছিল বড় রাস্তা দিয়ে।

ডাবু গিয়ে দৌড়ে ওদের মধ্যে পড়ে লাবু যে হারিয়ে গেছে সে খবর ওদের দিল। হাত জোড় করে বলল, আপলোগ কুছ কিজিয়ে মেহেরবানী করকে।

কনস্টেবল সব কথা শুনে এবং লাবুর চেহারার বর্ণনা শুনে হঠাৎ রেগে উঠে বলল, উ লোগ উসকো লে গায়া থোরী, উ ডাকু লেড়কা আপসে উলোগ কা সাথ মে গ্যায়া।

পরক্ষণেই সেই কনস্টেবল গোঁফ নাচিয়ে হাতের পাতা উল্টিয়ে বলল, এক ডাকুকা লেড়কীসে মহব্বৎ হ্যায়। মহব্বৎ। সমঝা, জী?

ডাবু বলল, এ্যাঁ? আপলোগ দেখা সাহী? ঠিক দেখা?

ডাবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা।

ডাবু সেই কনস্টেবলকেই বলল, অব কা হোগা?

সে বলল, কা হোগা? আগড় পাকড় যানেসে সব ডাকু লোগোঁকা সাথ পিটা যায়গা। ঔর কা?

পুলিশরা চলে গেল।

ডাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল লাবুকে সাপে কামড়ালে বা শুয়োরে চিড়লে বা লাবু মেনেনজাইটীসে মরে গেলেও ও এর চেয়ে অনেক সুখী হত।

ডাবু বলল, সুকুদা, আপনি একবার আমাদের বাড়ি চলুন। মাকে বোঝানো যাবে না। আমি যে কি করব বুঝতে পাচ্ছি না।

আমি বললাম, পুলিশদের সব কথা বিশ্বাস কোরো না। ওদের কথার কোনো দাম নেই। ওরা যা বলছে তা ভুলও হতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, লাবু স্বেচ্ছায় যাক, অনিচ্ছায় যাক, লাবু ওদের সঙ্গেই গেছে। গেছে ত কি? আবার ফিরে আসবে। গেছে বলে কি চিরদিন বেদেদের দলেই থেকে যাবে তোমাদের ফেলে? দেখো, দিন কয় পরে নিজেই একদিন ফিরে আসবে। এতে এত চিন্তার কি আছে? এখানে জঙ্গল ওর অচেনা?

তারপর বললাম, আমি এখন আর যাব না ডাবু। মাসীমাকে বুঝিয়ে বোলো—বোলো যে লাবু ভাল আছে, বেঁচে আছে, ও যে-কোনো দিন হঠাৎ ফিরে আসবে। ও অসুখে কি সাপের কামড়ে মারা গেলে কি মাসীমা সুখী হতেন? তবে?

ডাবু যেন বুঝল কথাটা। এমনিভাবে বলল, আচ্ছা। আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি আসি তাহলে, কেমন?

বললাম, এসো।

॥ কুড়ি ॥

কোলকাতা থেকে গোমো জংশন, বাড়কাকানা হয়ে যে ট্রেনটা আসে সেটার সময় এগারোটা। কিন্তু বারোটার মধ্যে এলেই এখানের সকলে নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করে।

রান্না-বান্না করার ফরমাস দিয়ে আমি সাড়ে দশটা নাগাদ স্টেশানের দিকে রওয়ানা হলাম। ছুটির জন্য একটা ছাতা নিলাম সঙ্গে। মালুকেও সঙ্গে নিলাম, মাল বয়ে আনবার জন্যে।

স্টেশনে পেঁছে মিসেস কার্ণির দোকানের সামনে বসে চা ও সিঙ্গাড়া খাচ্ছিলাম। প্লাটফর্মে আতা বিক্রী হচ্ছিল বড় বড়। পেয়ারাও বিক্রী হচ্ছিল। চীনাবাদাম ও কুড়মুড় ভাজাও। পানিপাঁড়ে জল নিয়ে বসেছিল।

একটা উদাস হাওয়া বইছিল প্লাটফর্মের উপর শুকনো পাতা উড়িয়ে।

লাবুর পালিয়ে-যাওয়াটা অথবা হারিয়ে যাওয়াটা এখানের সকালে সকলের মুখে মুখে ফিরছিল।

শৈলেন বলল, লাবুর কথা শুনেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বেদেরা যে কী খারাপ চরিত্রের লোক সে সম্বন্ধে কারোই কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিলো না। স্টেশনঘরের সামনের বারান্দায় বেঞ্চ পেতে বসে নিজের নিজের জীবনে বেদেদের সম্বন্ধে যার যা ঘটনা জানা ছিল ও কল্পনা করা ছিল সকলেই তা চায়ের কাপ হাতে করে বসে বসে বলছিলেন। যাঁদের এ বিষয়ে কিছুই জানা ছিলো না এবং যাঁদের কল্পনাশক্তিও অপেক্ষাকৃত কম তাঁরা সবিস্ময়ে ও সভয়ে চোখ গোল-গোল করে অন্যদের অভিজ্ঞতা শুনছিলেন।

একটা জিনিস মনে হয় আমার ভাল লাগল যে, এই ছোট জায়গায় লাবুর অন্তর্ধানের ঘটনাটা শৈলেনের প্রেমের ব্যর্থতাকে আপাততঃ চাপা দিয়েছিল। শৈলেন বোধ হয় অন্ততঃ এ জন্যেই লাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল মনে মনে।

শৈলেনের সেদিন স্টেশনে ডিউটি ছিল। ও ধড়াচূড়া পরে একা একা এদিকে ওদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।

দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে শৈলেন বলল, কেউ আসবে বুঝি?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমার একজন আত্মীয়া আসবেন কোলকাতা থেকে। তারপরই বললাম, চা খাবে শৈলেন?

ও উদাসীনতার সঙ্গে বলল, না। পরক্ষণেই বলল, আচ্ছা খাই।

মিসেস কার্ণি চা এবং আলুর চপ্ এগিয়ে দিলেন। ততক্ষণে সিঙ্গাড়া শেষ হয়ে গেছিল। ওরা ভিতরে নতুন করে গড়ছিল সিঙ্গাড়া।

শৈলেন যখন চা খাচ্ছিল, তখন আমি হেসে বললাম, কি? মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ছেলের?

শৈলেন অভিব্যক্তিহীন গলায় বলল, মাথা ত গরম হয়নি কখনও দাদা।

আমি বলেছিলাম, যা বললাম মনে আছে?

ও হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, মনে আছে। যা করবার একা-একা করতে হবে।

ও এমন বিষাদ-ঝরানো গলায় কথাটা বলল যে, আমার খারাপ লাগল।

তাছাড়া, মনে হলো কথাটার মধ্যে আমার প্রতি একটি চাপা বিদ্রূপও ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, লাবুর অন্তর্ধানে আমি খুব দুঃখিত হইনি।

লাবু যে-জীবনে অভ্যস্ত হয়েছিল—সকালে উঠে গরু চরাতে যাওয়া এবং বাড়ি ফিরে গেরস্থালী কাজ করা, তাতে কোনো ভবিষ্যৎ ছিলো না লাবুর। মার প্রতি কর্তব্যবোধ তার থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ওর যা বয়স তাতে কারো প্রতি কর্তব্যবোধ জাগবার কথা নয়।

আমি বুঝতে পারলাম, জঙ্গল পাহাড়ের আশ্চর্য যাদু ওকে পাগল করেছিল। 'চাঁদের পাহাড়' পড়ে ওর মধ্যেও একটা দারুণ অ্যাডভ্যাঞ্চারের সখ দানা বেঁধেছিল। ঠিক সেই সময়ে ওর সঙ্গে নুড়ানীর দেখা।

উদাস আকাশের নীচে সেই বাদামী বেদেনী তাকে কিসের লোভ দেখিয়েছিল তা আমার জানা নেই, তবে শরীরের লোভ নিশ্চয়ই নয়। কারণ, লাবুর বয়সে মেয়েদের শরীর সম্বন্ধে একটু মোহময় ধারণা থাকে এই পর্যন্ত—সে শরীর ওর বয়সী কোনো ছেলেকেই আকর্ষণ করে না।

আমার মনে হয়, ও আর নুড়ানী দুজনে কোনো অদেখা চাঁদের পাহাড়ে অভিযান করার স্বপ্ন দেখেছিল। নুড়ানীদের বাধা-বন্ধনহীন উন্মুক্ত অবারিত জীবন লাবুকে নিশ্চয়ই ভীষণ-ভাবে আকর্ষণ করেছিল—সে আকর্ষণ লাবু প্রতিরোধ করতে পারেনি।

লাবু যদি কখনও আর নাও ফেরে, তবুও জানব, লাবু একটা কিছু করল। মার বাধ্য হয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে অসহায় যুদ্ধ করার থেকে ও অবাধ্য হয়ে এক অনিশ্চিত চ্যালেঞ্জ-করা জীবনের দিকে যে আকর্ষিত হয়েছিল, এটাই আশ্চর্যের কথা।

বাঙালীর ঘরে এমন বড় একটা ঘটে না।

শৈলেন চা-খাওয়া শেষ করে পয়সা দিতে গেল।

আমি বললাম, ও কি? আমিই ত তোমাকে ডাকলাম।

ও পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর বলল, কারো কাছে কোনো ঋণ রাখতে ইচ্ছে করে না।

আমি বললাম, ও আবার কি কথা। এদিকে দাদা বলো মুখে, আর এক কাপ চা খেলে ঋণ হয়ে গেল!

ও ম্লান মুখে হাসল একবার।

তারপর বলল, না, কারো কাছেই ঋণ রাখা উচিত নয়।

আমি ওর কথার মানে বুঝলাম না।

শৈলেন প্লাটফর্মের অন্যপ্রান্তে চলে গেল। প্যান্টের দু' পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা একা।

বসে থাকতে বিরক্তি লাগছিল। তাই লাইন পেরিয়ে ওদিকের প্লাটফর্মে গিয়ে আমিও রোদে পাইচারী করতে লাগলাম।

এখানে লাইন পেরুনোতে কোনো অসুবিধা নেই—কারণ প্লাটফর্ম উঁচু নয়। মাটি থেকে বড় জোর ছ'ইঞ্চি কি এক ফুট উঁচু। সমান বললেই চলে। লাল কাঁকরের প্লাটফর্ম। বাঁধানো নয়। হাঁটলে পায়ের নীচের কাঁকর কচরমচর করে—বেশ লাগে আস্তে আস্তে, ভাবতে ভাবতে, হাঁটতে।

কিছুক্ষণ পর আবার লাইন পেরিয়ে এদিকে আসব, হঠাৎ আমার চোখ পড়ল মিসেস কার্ণির দোকানের সামনে দুটি মেয়ের দিকে। ওদের মধ্যে একজনকে আমার দারুণ চেনা মনে হল। বাঙালী মেয়ে।

লাইনটা পেরুবার সময় হঠাৎ চিনতে পারলাম নয়নতারাকে।

ওর ছবি আমি শৈলেনের কাছে দেখেছিলাম। শৈলেন যেমন বলেছিল, আজও ও তেমনি খুব সেজেছে। মেয়েটি সাজতে জানে। খোঁপায় একটি লাল গোলাপ। সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে আলুর চপ খাচ্ছিল। আর খুব হেসে হেসে গল্প করছিল।

চকিতে আমি প্লাটফর্মের অন্য প্রান্তে যেদিকে শৈলেন গেছিল সেদিকে তাকালাম।

দেখি, শৈলেন অপলকে নয়নতারার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি মিসেস কার্ণির দোকানের সামনে পেঁছিতেই শুনলাম, অন্য মেয়েটি নয়নতারাকে বলছে, ঐ দ্যাখ্ তোর প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছে।

নয়নতারা আড়চোখে একবার দেখেই বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে চুলের ফুলটা ঠিক করে নিল. বলল, এমন নির্লজ্জ লোক আমি দেখিনি। ইডিয়েট্, একটা ইডিয়েট। ভালোবাসা যেন সস্তা. দ্যাখ না।

ওদের কথা চাপা পড়ে গেল। একটা ডিজেল-টানা কয়লা বোঝাই মালগাড়ি আসছিল।

ডিজেল ইঞ্জিনটা একটানা গম্ভীর গোঙানি তুলে ধীরে ধীরে আমাদের পেরিয়ে গেল—তারপর ওয়াগনগুলো ঘটা-ঘট, ঘটাং ঘটাং একটানা আওয়াজ তুলে আমাদের পেরোতে লাগল।

ওয়াগনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নয়নতারা আর তার সঙ্গিনী আলুর চপ খেতে খেতে অনর্গল কথা বলছিল দেখছিলাম, ওরা হাসছিল—ট্রেনের শব্দে সে কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল না, শুধু হাসি দেখা যাচ্ছিল।

আমার কানে শুধু ওর শেষ কথাটা বাজছিল, 'ভালোবাসা যেন সস্তা, দ্যাখ না'।

ওয়াগনগুলোর শেষে গার্ডসাহেবের গাড়ি ছিল। রেলিং-এ গার্ডসাহেবের আন্ডারওয়ার বাঁধা ছিল রোদে শুকোবার জন্যে।

আমাদের পেরিয়ে গিয়েই হঠাৎ ট্রেনটা জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাজামা আর নীল শার্ট গায়ে-দেওয়া, হাতে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন ধরা গার্ডসাহেব দৌড়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে ঝুঁকে পড়েই বললেন, ইয়া—আল্লা!

আমি গার্ডসাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে, যেদিকে ট্রেনের এঞ্জিন, সেদিকে তাকালাম।

তাকিয়েই আমার বুক হিম হয়ে গেল।

কে যেন প্লাটফর্মের ওদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কাট্ গ্যয়া. কাট্ গ্যয়া, ঘোষবাবু কাট্ গ্যয়া।

সমস্ত প্লাটফর্মময় একটা দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল—মাস্টারমশায় এবং অন্যান্য সকলে দৌড়ে গেলেন সেদিকে।

ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে আমি শুধু দেখলাম, শৈলেন তার সাদা পাটভাঙ্গা উনিফর্ম পরে চাকার কাছে মাটিতে শুয়ে আছে।

আমি বসেই রইলাম। উঠবার মত কোনো উৎসাহ বা জোর আমার অবশিষ্ট আছে বলে মনে হল না। ইতিমধ্যে কোলকাতার গাড়ি আসার ঘন্টা পড়ল। এক্ষুনি এসে যাবে গাড়ি। আগের স্টেশন থেকে এ স্টেশনের দূরত্ব সামান্যই।

আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, আমার পা দুটো মাটিতে আটকে ছিল, তবুও উঠতে হল।

ওখানে গিয়ে দেখলাম, শৈলেনের দুটো পা-ই ধবধবে প্যাণ্ট আর একপাটি জুতো-সুদ্ধ কোমর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। একপাটি জুতো আলাদা পড়ে আছে। আর শৈলেনের শরীরের ঊর্ধ্বাংশ লাইনের অন্যদিকে।

স্টেশন স্টাফের মধ্যে কে যেন শৈলেনের মাথাটা কোলের উপর নিয়ে ঐখানে বসে আছে, অন্যজন ঘটি থেকে জল ঢালছে মুখে।

ততক্ষণে শৈলেন তার সমস্ত তৃষ্ণার ওপারে চলে গেছে।

আমার কানের মধ্যে নয়নতারার কথাগুলো ঝম্‌ঝম্ করতে লাগল—'দ্যাখ না, ভালোবাসা যেন সস্তা।'

জানি না, সে কথা শৈলেন শুনতে পেয়েছিল কিনা, নইলে ভালোবাসা যে সস্তা নয়, তা তার নিজের জীবনের মূল্যে কেন ও প্রমাণ করতে যাবে?

পাশ থেকে একজন অল্পবয়সী গাট্টা-গোট্টা ছেলে. তাকে আমি চিনি না, বলল, হারামজাদীর রকম দ্যাখো, এখনও প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছেনালি করছে, শালীকে আমি আজ সকলের সামনে বেইজ্জত করব। আমার জেল হয় ত হবে। এমন মাগীর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

অন্যরা সকলেই নয়নতারাকে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ঢং করতে দেখে অবাক ও দুঃখিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা সকলেই ছেলেটিকে ধরে রাখলেন, বললেন, পাগলামি করিস না।

মাস্টারমশাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি যেন কোমরে আর জোর পাচ্ছিলেন না। মাস্টারমশাই বললেন, 'শৈলেনটা বোকা জানতাম, ও যে এতবড় বোকা তা ত কখনও ভাবি নাই।'

ইতিমধ্যে বাড়কাকানা থেকে কোলকাতার ট্রেনটা এসে গেল।

ফার্স্টক্লাস-বগিটা যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটা শৈলেন যেখানে পড়েছিল, তার একেবারে সামনে।

কিমার মত হাড় ও মাংস লাইনের গায়ে লেগেছিল। এ যে মানুষেরই হাড় এবং মাংস, এবং তা শৈলেনের, তা মনে হতেই গা-বমি-বমি করতে লাগল।

ছুটি একটা কমলা-রঙা সিল্কের শাড়ির উপরে ফুলস্লীভস কমলারঙা সোয়েটার পরে দরজার হাতল ধরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়েই আঁতকে উঠল।

আমি দৌড়ে গিয়ে ওর দিকে হাত বাড়ালাম, বললাম, হাত ধরো, ওদিকে তাকিও না।

ছুটি অভিভূতের মতো সিঁড়ি বেয়ে নেমে প্লাটফর্মে লাফিয়ে নামল।

আমি বললাম, তুমি ঐ দিকে যাও। ঐ চায়ের দোকানের দিকে, আমি আসছি।

ওখানে গিয়ে সকলকে বললাম, আমার কাছে একজন অতিথি এসেছেন। ওঁকে বাড়ি পেঁছে দিয়েই আমি ফিরে আসছি।

ওঁরা বললেন, এখান থেকে বডি সরাতে সময় লাগবে। পুলিশ আসবে, পোস্টমর্টেম হবে। তাড়া নেই। আপনি খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে আসুন।

আমি জবাব দিলাম না কোনো, বললাম, আমি আসছি।

নয়নতারা ও তার আত্মীয়রা তখন স্টেশনের গেট পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিছু যে ঘটেছে তা নয়নতারাকে দেখে বোঝার উপায় ছিলো না। বরং ওকে যেন এই ঘটনার জন্যে গর্বিতাই দেখাচ্ছিল।

মাঠের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ছুটিকে সংক্ষেপে সব বললাম। সব শুনেই ছুটি নয়নতারা যেখানে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেছে, সেদিকে তাকালো, বলল, একটু আগে বললেন না, আমি দৌড়ে গিয়ে ঠাস্ করে এক চড় লাগাতাম গালে, তারপর আরো চড়।

আমি বললাম, তুমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গেছ। ব্যাপারটা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

দীপচাঁদের দোকানের কাছে আসতেই দীপচাঁদের অল্পবয়সী ছেলে, পায়জামা পরে একটা ঘি-রঙা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে হাতে ঘড়ি পরে বেরিয়ে এল, শুধোল, যা শুনলাম সত্যি বাবু?

বললাম, সত্যি!

ছেলেটার বয়স ষোল-সতেরো হবে, মুখে বিজ্ঞভাব এনে বলল, আত্মহত্যা ত মেয়েরা করে, আওরত-এর কাজ। কোনো মরদ কখনও সুইসাইড করে? বেঁচে থাকলে পুরুষমানুষকে রোজ কত মুসীব্বতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তা' বলে কোনো মরদ আত্মহত্যা করে?

আমি জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

ওকে বললাম না যে, তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধিতে রোজ ডিফারেন্স-ইন-ট্রায়াল ব্যালান্স নিয়ে তুমি ব্যালান্স-শীট মেলাচ্ছ—অথবা যত গোঁজামিল সব সাসপেন্স এ্যাকাউন্টে ফেলে। কিন্তু এমন কেউ কেউ থাকে, যারা কোনোরকম ডিফারেন্স নিয়েই জীবনের ব্যালান্স-শীট মেলাতে রাজী নয়।

ছুটি বলল, ছেলেটা ভীষণ পাকা ত। সবই জেনে গেছে।

আমি বললাম, ওর কি দোষ? সকলে যা বলে, ও-ও তাই-ই বলছে। সকলে বলে না যে, পুরুষমানুষ আত্মহত্যা করে না। আত্মহত্যা মেয়েমানুষদেরই মানায়?

ছুটি বলল, সব ব্যাপারে এই মেয়েদের হেনস্থা করা আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না। মেয়েদের কি যে মনে করে পুরুষজাতটা তারাই জানে। এ সব কথা শুনলে রাগে গা রি-রি করে।

মনের ঐ অবস্থাতেও ওর কথা শুনে আমার হাসি পেল।

বললাম, মেয়েদের লিবারেশনের আরো অনেক ভাল ভাল প্লাটফর্ম আছে। প্লাটফর্মে সুই-সাইড নিয়েও তোমরা ঝগড়া না করলেও চলবে।

ছুটি বললে, বিকেলে রাঁচী যাবার বাস নেই? না?

আমি বললাম, নেই।

আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে সত্যি, এতদিন পর আপনার কাছে এলাম—কত আশা করে এসেছিলাম, কত গল্প করব, মজা করব, তা না, স্টেশনেই যা দৃশ্য দেখালেন। উঃ ভাবতে পারছি

না। ঈস, বেচারী—কাউকে ভালোবাসার দাম এমন করেও দিতে হয়? ভাবা যায় না।

বাড়ি পেঁছেই আমি বললাম, ছুটি, তুমি আরাম করে চান করো, তারপর খাও, খেয়ে রেস্ট করো। আমার এক্ষুনি যেতে হবে। কখন ফিরব বলতে পারছি না। সত্যিই তুমি খুব খারাপ দিনে এসেছ।

তারপর বললাম, তোমাকে কি বলব, শৈলেনের মৃত্যুর জন্যে শুধু নয়নতারাই নয়, হয়ত আমিও দায়ী।

কেন? আপনি কেন?

হাতের ব্যাগটা টেবলে নামিয়ে রাখতে রাখতে ছুটি বলল।

আমি বললাম, ও সেদিন রাতে আমার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল আমি বুঝি অসাধারণ কেউ। আমিও যখন ওকে বললাম যা করবার তোমাকে একাই করতে হবে, একা-একা। আমাদের কারোরই এ ব্যাপারে সাহায্য করার নেই, তখন ও হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, বেশ তাই-ই করব—যা করার একা একাই করব।

ছুটি বলল, ঈস্‌স্‌—স্‌। আর শুনতে চাই না। আর বলবেন না।

আমি উঠলাম, বললাম, ভালো করে খেও কিন্তু তুমি।

ও বলল, আপনি কি পাগল? এর পর কেউ খেতে পারে? আমি একটু চা খাব শুধু। তারপর চান করে শুয়ে থাকব। আপনি কখন আসবেন?

জানি না ছুটি। আমার জন্যে জল গরম করে রাখতে বোলো। এসে চান করব।

ছুটি বলল, বলে রাখব। তারপর বলল, তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু। আমার এখনই ভয় করছে। তারপর বলল, সব খাবার তোলা থাকবে। রাতে যদি খাবার ইচ্ছা থাকে তখন খাব, আপনি ফিরে এলে।

আমি হাসান ও লালিকে সব বুঝিয়ে বলে, ছুটিকে ভাল করে দেখাশোনা করতে বলে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

স্টেশনে পেঁছে আমার কিছু করার ছিলো না। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয়ও না। আমি ঐ শৈলেনের কাছে বসতেও পারছিলাম না। কে যেন ওর মাথার ও ঊর্ধ্বাংশের উপর একটা কম্বল চাপা দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওর পা দুটো হাত দুয়েক দূরে পড়ে ছিল। রক্তে রক্তে তখন সমস্ত জায়গাটা ভরে গেছিল।

একজন বয়স্ক গোলগাল টাক-মাথা ভদ্রলোক শৈলেনের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া শরীরের পাশে বসে খুব কাঁদছিলেন। শুনলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে শৈলেনের ঝগড়া ছিল, কথাবার্তাও নাকি বন্ধ ছিল গত দু'বছর। কিন্তু তার আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে শৈলেনের খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

মৃত্যু বোধহয় আমাদের একে অন্যের কাছে টেনে আনে। সমস্ত জীবন নিজেদের আত্মম্ভরিতা, নিজেদের ঠুনকো মান, সম্মান, অভিমান নিয়ে আমরা সহজে অন্যের থেকে দূরে থাকতে পারি, কিন্তু মৃত্যু এসে এই সমস্ত মন-গড়া ব্যবধান সরিয়ে দেয়—তখন প্রত্যেকেই মনে করি, কি হত কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করলে? কি হত নিজেকে অন্যের কাছে একটু ছোট করলে?

দুঃখের কথা এই যে, অন্যজন তার বা তাদের জীবদ্দশায় আমাদের এই সহজ কান্না দেখে যেতে পারে না। মরবার সময়ও বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে মরতে হয়।

দেখতে দেখতে খিলাড়ি থেকে পুলিশ, পত্রাতু থেকে রেলের বড়সাহেব সব এসে গেলেন। তদন্ত-টদন্তর পর ময়না-তদন্ত থেকে ওকে মাপ করা হল।

নতুন ধুতি চাদরে মুড়ে নতুন খাটিয়ায় শৈলেনকে শুইয়ে আমরা হেসালঙের দিকে দেওনাথ নদীর পথে নিয়ে চললাম।

আমাদের পথ গেছে নয়নতারার বাড়ির পাশ দিয়ে। নয়নতারার বাড়ির সকলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। নয়নতারার সেই আত্মীয় প্রথম থেকেই অন্যদের সঙ্গে স্টেশনে ছিলেন।

ভীড়ের মধ্যে নয়নতারাকে দেখব বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু নয়নতারাকে দেখা গেল না।

কেউ বলছিল বল হরি, হরি—বোল্‌।

স্টেশনের লাইন্সম্যান গ্যাংম্যানেরা সকলেই বিহারী—তারা মাঝে মাঝে বলছিল, রাম নাম সত্‌ হ্যায়, রাম নাম সত্‌ হ্যায়। যারা খাটিয়া কাঁধে করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই শৈলেনের

সহকর্মী, থিয়েটারে শৈলেনের সহ-অভিনেতা।

শৈলেনের চেহারা খুব সুন্দর বলতে যা বোঝায় তা ছিলো না বলে, ও কখনও নায়ক হতে পারত না. বরাবরই ওকে হয় সহ-নায়ক কি ভিলেইন সাজতে হত।

আজকের বিকেলের এই শেষ দৃশ্যে শৈলেনই একমাত্র নায়ক—অন্য সকলেই দর্শক।

জবা, বোগেনভেলিয়া, গোলাপ, যে যা ফুল পেয়েছিল এনেছিল। সেই বিচিত্র রঙা ফুলের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে শৈলেন দুলতে দুলতে সকলের মাথায় চড়ে চলেছিল।

মরবার দিনে আমরা এমন করে মৃতকে মাথায় চড়াই যে জীবনে তার সামান্যতম অংশ করলেই যথেষ্ট হয়। একটু ন্যায্য প্রশংসা, একটু প্রাপ্য ভালোবাসা; একটু ভাল ব্যবহার।

আজ ওকে নিয়ে আমরা সকলে যা করছি, বেঁচে থাকতে তার কণামাত্র করলে ওকে হয়ত এমন করে আজ মরতে হতো না।

নয়নতারাদের বাড়িটা আমরা প্রায় পেরিয়ে এসেছি এমন সময় এক আশ্চর্য কান্ড ঘটল।

বাড়ির ভিতর থেকে পাগলিনীর মত দৌড়ে এল নয়নতারা। তার চুলের ফুল শুকিয়ে গেছে, শাড়ি খসে পড়েছে, রুক্ষ উপবাসী মুখ, আলুথালু চুল। সে ধাক্কা দিয়ে বাড়ির সকলকে সরিয়ে দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

তার আঁচল উড়ছিল. চুল উড়ছিল হাওয়ায়, সে এসে যারা খাটিয়া কাঁধে করে ছিল তাদের আকুতি করে বলল, আমাকে একটু দেখতে দিন।

কেউ কোনো কথা বলল না।

শৈলেনকে নামানো হল।

শৈলেন একপাশে মুখ ফিরিয়ে ছিল, কপালে চুলগুলো শোয়ান ছিল। ভুরভুর করে অগুরুর গন্ধ বেরোচ্ছিল। নয়নতারা দৌড়ে গিয়ে শৈলেনের উপর পড়ল। নয়নতারার বুক থেকে এমন একটা চিলের কান্নার মত চীৎকার উঠে সেই শেষ বিকেলের আকাশ-বাতাস মথিত করল যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

যে গাট্টাগোট্ট ছেলেটা শৈলেন কাটা-পড়ার পরেই বলেছিল সকলের সামনে নয়নতারাকে বেইজ্জত করবে—সেই ছেলেটির দিকে তাকালাম। সে নরম মুখে দাঁড়িয়েছিল। তার দু' চোখ বেয়ে নীরবে ঝরঝর করে জল বইছিল।

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কারো চোখই শুকনো নেই।

আমি হঠাৎ বুঝে উঠতে পারলাম না যে, এই চোখের জল কার জন্যে? শৈলেনের জন্যে? না নয়নতারার জন্যে? ওরা সকলেই কি তাহলে ইতিমধ্যে নয়নতারাকে ক্ষমা করে দিয়েছে?

নয়নতারাকে জোর করে ছাড়ানো হল। তারপর আবার হরিধ্বনি দিয়ে সকলে এগিয়ে চলল।

ভালোবাসা যে সস্তা নয়, হেয় করার জিনিস নয়, ভালোবাসা যে এক অমূল্য ধন, তা এই মুহূর্তে বেচারী বিবসা নয়নতারার মত আর কেউই জানলো না।

একবার পিছনে ফিরে তাকালাম, দূ—রে শৈলেনের কোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে, যেখানে নয়নতারাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলে ও বোগেনভেলিয়া ও পেঁপেগাছ লাগিয়েছিল।

আরো দূরে নয়নতারাকে দেখা যাচ্ছে।

ধুলোর মধ্যে সে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত গর্ব, সমস্ত ভুল বিসর্জন দিয়ে লজ্জাহীনতায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

দেওনাথের পাশে যখন শৈলেনকে নামানো হল তখন বেলা পড়ে এসেছিল। জঙ্গলের গায়ে শেষ বিকেলের ম্লান লাল লেগেছিল।

শৈলেনের আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠানো হয়েছে, কেউই আসতে পারেননি। কালকের আগে কারো পক্ষেই এখানে এসে পেঁছিনো সম্ভব নয়।

নয়নতারার পিসতুতো দাদা শৈলেনের মুখে আগুন দিলেন।

হু হু করে ধরে উঠল চিতা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একজন যাত্রার নায়ক তার যাত্রা শেষ করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বললাম, শৈলেন, তোমাকে এই দেওনাথ নদীর ধারে. হেসালঙের জঙ্গলে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেলাম। মনে মনে।

একদিন আমি, তোমার নয়নতারা, এবং আমরা সকলে এবং প্রত্যেকেই এমনি নিঃসংশয়

এক অস্তিত্বহীন অসহায়তায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। অথচ কী আশ্চর্য! যতদিন অস্তিত্ব আছে এবং থাকে ততদিন এই অমোঘ অস্তিত্বহীনতার কথা আমাদের কারোই একবারও মনে হবে না।

তুমি তোমার নয়নতারাকে ক্ষমা করে দিও শৈলেন। নয়নতারা যতদিন বাঁচবে, ততদিন তোমার এই শূন্য আসনে আর কাউকেই বসাবে না। এও হয়ত একরকমের প্রাপ্তি। তুমি হয়ত এ প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করোনি, আমিও করি না; তবু অনেকে আছে, যারা করে।

সব শেষ করে আমরা যখন লাপলার দিকে ফিরে চললাম দেওনাথের কোল ছেড়ে ঘন অন্ধকারের মধ্যে এক ভূতুড়ে সারিতে, তখন রাত আটটা বেজে গেছে।

রেলওয়ে ক্রশিং-এর কাছে এসে সকলে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। স্টেশনের দল লাপরার কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। আমিও ওদের সঙ্গে গিয়ে পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়ে মাঠের পথ ধরলাম।

পিছনের গেট দিয়ে যখন বাড়িতে এসে উঠলাম, তখন রাত সাড়ে নটা। বসবার ঘরে আলো জ্বলছিল। অন্য সব আলো নেবানো ছিল। মালু আর লালি বাবুর্চি-খানায় উনুনের পাশে গরমে বসে ছিল। হাসান উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা নাড়াচাড়া করছিল উনুনে-চাপানো হাঁড়িতে। মালুর কালো কুকুরটা গুটিশুটি মেরে বাবুর্চিখানা আর খাওয়ার ঘরের মধ্যের বারান্দায় শুয়েছিল।

আমি ডাকলাম, ছুটি ও ছুটি।

আমার গলা শুনে মালু, লালি এবং হাসান সব দৌড়ে এল। ভিতর থেকে ছুটিও দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে বলল, উঠবেন না, উঠবেন না; ঐখানে দাঁড়ান।

তারপরই লালিকে কি যেন বলল।

বুঝলাম, আমি আসার আগে একাধিকবার মহড়া দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটার।

লালি একটা টাঙ্গি এবং একটা জ্বলন্ত কাঠ উনুন থেকে বের করে আনল।

ছুটি আমাকে আদেশ করল, আগে আগুনটা ছোঁন, ওই লোহাটা ছোঁন। তারপর বলল, ছুঁয়েছেন? এবার পিছনের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকুন। তোয়ালে, আপনার জামা-কাপড় সব দেওয়া আছে।

পরক্ষণেই লালিকে বলল, লালি, জলদি গরম পানি দে দো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। ওর দিকে। ভাবখানা যেন এখানে ওই থাকে, আমিই বেড়াতে এসেছি একরাতের জন্যে।

ওরা জল দিতে যতটুকু দেরী হল সে সময়ে আমি শুধোলাম, তুমি এত সব জানলে কি করে?

ছুটি বলল, এসব জানতে আর বাহাদুরীর কি আছে? নিজের মাকে পোড়াই নি আমি নিজের হাতে? আমার মত মেয়ের সব কিছুই শিখতে হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি এসব জানো? এ সবে বিশ্বাস করো?

ও বলল, কখনও এ নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবিনি। যখন এগুলো মানতে হয়েছিল তখন মনের অবস্থা এমন ছিল না যে যুক্তিতর্ক দিয়ে সবকিছুকে যাচাই করি। আমার মনে হয়, এ সময়ে কেউ তা করতে পারে না। তাইই বোধহয় এই সমস্ত নিয়ম এখনও অটুট আছে।

বাথরুম থেকে চান করে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ছুটিকে বললাম, তুমি খেয়েছিলে?

না।

খাওনি কেন?

ভাল লাগছিল না।

এতক্ষণ কি করছিলে?

সোয়েটার বুনছিলাম।

কার জন্যে?

দারোয়ানের জন্যে।

কোন্ দারোয়ান? যার খাটিয়ায় আমি শুয়েছিলাম?

ছুটি হাসল, বলল হ্যাঁ, বুড়ো বড় ভাল লোক। আমাকে খুব স্নেহ করে।

তোমাকে কে না স্নেহ করে? আমি বললাম।

ছুটি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল খাবেন না? খুব ক্ষিদে পেয়েছে না?

বললাম, তা পেয়েছে।

ছুটিই খাবার লাগাতে বলে এল। ফিরে এসে বলল, কি হল? বলুন না।

আমি বললাম, তোমরা এক একটি আশ্চর্য চরিত্র. সাধে কি লোকে বলে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা?

কেন? আমরা আবার নতুন করে কি করলাম?

আমি বললাম, তুমি না; নয়নতারা।

চোখ বড় বড় করে ছুটি নয়নতারার কথা শুনল।

সব শুনে বলল, কত ঢংই জানে এসব মেয়ে। আপনারা পাঁজাকোলা করে দিলেন না কেন মালগাড়ীর চাকার নীচে ফেলে?

ছুটি আমার সামনে বসেছিল। বিকেলে ও চান করেছিল। বোধ হয় চুলে শ্যাম্পু করেছিল। বড় করে টিপ পরেছিল। ও জানে বড় করে টিপ পরলে আমি ওকে ভাল দেখি। একটা হাল্কা নীলরঙা ব্লাউজের সঙ্গে একটা অফ-হোয়াইট খোলের নীল পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরেছিল। চোখে কাজল পরেছিল, ঠোঁটে ভেজলীন।

খাওয়া বন্ধ করে আমি ছুটির দিকে তাকিয়েছিলাম।

ছুটি বলল, কি দেখছেন?

আমি বললাম, তোমাকে। তোমাকে দেখে আমার আশ মেটে না কেন বল ত?

ও হাসল। বলল, ভাগ্যিস মেটে না। আমাকে দিয়ে যেদিন আপনার আশ মিটবে সেদিন আমার বড়ই দুর্দিন। আপনি দেখবেন, চিরদিন আপনার কাছে আমি নতুনই থাকব, ঠিক আপনি যখন যেমন চান। আমি জানি, কি করে নিজেকে নতুন রাখতে হয়।

খাওয়াদাওয়ার পর ছুটি বলল, কত সাধ করে আপনার কাছে এসেছিলাম—কত গল্প করব ভাবলাম—তা না, এমন দৃশ্য দেখালেন যে আমার রাতে ঘুম হবে না।

আমি বললাম, শুয়ে পড়লেই ঘুম আসবে। তোমার ভোরে উঠে বাস ধরতে হবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।

ও বলল, হুঁ।

ছুটি আমার পাশের ঘরেই শুল। দরজা খোলা রেখে।

কঙ্কা বস্তীতে ওঁরাওরা মাদল বাজিয়ে একটা দোলানী সুরের গান গাইছিল। ঝিঁঝি

কঙ্কা বস্তীতে ওঁরাওরা মাদল বাজিয়ে একটা দোলানী সুরের গান গাইছিল। ঝিঁঝি ডাকছিল একটানা বাইরে। পেয়ারা গাছের পাতা থেকে ফিসফিস করে শিশির পড়ার শব্দ হচ্ছিল।

বাথরুমের আলো জ্বালিয়ে রাখার কথা বলেছিলাম আমি। বোধ হয় শোবার সময় ও জ্বালাতে ভুলে গেছে। অন্ধকার ঘরে একটা জোনাকি আলো জ্বেলে জ্বেলে কি জানি খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

বোধ হয় ও নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

আজ সারাদিনে আমার অনেক হাঁটা হয়েছে। মনটাও বড় অবসন্ন ছিল। কখন ঘুম এসেছিল মনে নেই।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বেড়ালছানার মত নরম কিছু গায়ের সঙ্গে লাগাতে—তার সঙ্গে একটা মিষ্টি সুগন্ধ।

ছুটি ফিসফিস করে বলল, আমার ভয় করছে ভীষণ; ঘুম আসছে না। তারপর অনুমতি চাইবার গলায় বলল, আপনার কাছে শোব?

আমি কথা না বলে এক পাশে সরে গিয়ে বললাম, আমার হাতে মাথা দিয়ে শোও, এসো আমার পাশে চলে এসো।

বুকের কাছের গুঁড়িসুঁড়ি মারা ছুটির সুস্নাতা সুগন্ধি শরীরকে জড়িয়ে ধরে দারুণ ভাল লাগছিল আমার।

ছুটি বলল, আমাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরুন। আমার শীত করছে।

তারপর ও হঠাৎ বলল, আমাকে চিরদিন এমন করে জড়িয়ে রাখবেন? কখনও ছেড়ে দেবেন না ত? ছেড়ে দিলে আমি কিন্তু কাঁচের বাসনের মত পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। আমার যা-কিছু জোর সব আপনারই জন্যে। আপনি অবহেলা করলে কিন্তু আমার সব জোর ফুরিয়ে

যাবে। আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে হয়ে যাব, বাজে মেয়ে; নয়নতারাদের মত।

আমি জবাব দিলাম না। ছুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে ওর গালে গাল ছুঁইয়ে শুয়ে থাকলাম।

ছুটি বলল, ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে আপনাকে আমি পুরোপুরি করে পাই। বিশ্বাস করুন, আজ আমি আপনাকে আমার যা-কিছু আছে সব দেব বলে এসেছিলাম, আমার যা কিছু গোপন এবং দামী, যা-কিছু এত বছর এত সযতনে আমি আমার নিজের বলে লালন করেছি। আপনাকে দিয়ে যে ভারমুক্ত হব, এ বোধ হয় কারোই ইচ্ছা নয়।

আমি চুপ করে রইলাম। এক দারুণ সুগন্ধি ভালোলাগা আমাকে এক আনন্দময় আশ্লেষে ছুটির শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দিল।

ছুটি বলল, কি, জবাব দিচ্ছেন না যে?

আমি বললাম, তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, পেয়েছিলে?

হঠাৎ ছুটি আমার হাতের মধ্যে ছটফট করে উঠল। বলল, কবে?

কিছুদিন আগে।

কই? না ত? কোলকাতা যাবার আগে ত কোনো চিঠি আমি পাইনি। কেন? চিঠিতে কি লিখেছিলেন?

আমি চুপ করে রইলাম।

ও বলল, বলবেন না?

আমি বললাম, চিঠিতে ত বলেইছি—গিয়েই পাবে—এখন মুখে আবার বলে লাভ কি? তাছাড়া চিঠিতে যা বলা যায়, মুখে কি তাই বলা যায়?

ছুটি বলল, ও। বলা যায় না বুঝি?

আমি জবাব দিলাম না।

ছুটি বলল, আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাকে কি আমি খুব বিরক্ত করি? বিরক্ত করি আপনাকে? আমার সম্বন্ধে আপনার এত দ্বিধা কেন?

আমি বললাম, কথা বোলো না।

এখন না বললে, কখন বলব? কেন জানি না আমার মন ভাল লাগে না। আপনি এমন অস্পষ্ট কেন? আপনাকে এখনও যদি স্পষ্টভাবে না বুঝি, ত কবে বুঝব?

আমি চুপ করে রইলাম। পরক্ষণেই ছুটি বলল, আমি যাই, এতটুকু খাটে দুজনে শুলে আপনার কষ্ট হবে।

আমি ওকে বাধা দিলাম না। আমার হঠাৎ মনে হল, ছুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে শোবার অধিকারটুকুও আমি নিজের হাতে নষ্ট করেছি। ঐ চিঠি পড়ে ছুটি মনস্থির না করা পর্যন্ত ওর কাছে কিছু পেলে আমার মনে হবে ওকে আমি ঠকাচ্ছি।

ছুটি বলল, ঘুমোন, কেমন? আমার ভোরবেলা উঠতে হবে।

এই বলে ছুটি উঠে, কম্বলটা আমার গায়ে ভাল করে টেনে দিয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে লঘুপায়ে ও ঘরে চলে গেল।

আমি বললাম, কোনো দরকার হলে আমাকে ডেকো ছুটি, সংকোচ করো না।

ও বলল, ডাকব। সংকোচ কিসের? সংকোচ ত দেখছি সব আপনার?

॥ একুশ ॥

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল।

ছুটি তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

আমি হাত মুখ ধোবার পর বাইরে এসে রোদে পায়চারি করছি, এমন সময় দেখি সেই ভোরে লাবুর মা গেট খুলে শিশির মাড়িয়ে খালি পায়ে বাড়ির দিকে আসছেন।

খালি পা, পরনে একটা দেহাতী তাঁতের শাড়ি; গায়ে সেই র‍্যাপার।

এখানে থাকতে থাকতে এবং নানারকম লোক ও সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে ওঁর বোধহয় শীত ও গ্রীষ্মের বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। যেমন ভোঁতা হয়ে গেছে অন্য অনেক বোধ।

মাসীমা কাছে আসতেই ওঁকে শুধালাম, কি ব্যাপার মাসীমা? এই ভোরে?

দেখলাম মাসীমার দুচোখে জল টলটল করছে।

আমি রোদে চেয়ার দিলাম বসতে। উনি বসে পড়ে, আমার দিকে চেয়ে রইলেন—প্রথমে কোনো কথা বললেন না।

তারপর হঠাৎ বললেন, শেষে তুমি আমার এই উপকার করলে?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কি উপকার?

আমার ছেলেটাকে তুমিই ঐ বেদেগুলোর হাতে তুলে দিলে? আমি শুনলাম তুমি নাকি ওদের আস্তানায় রোজ যেতে; যেদিন লাবু পালিয়ে গেল, সেদিনও গেছিলে।

আমি বললাম, হ্যাঁ গেছিলাম, শুধু সেদিনই গেছিলাম, আগে কখনও যাইনি। কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়।

কেন জানি না, আমার বিস্তারিত সাফাই গাইতে ইচ্ছা করল না। মনে হল তার কোনো দরকার নেই। আর তাছাড়া, যদি উনি অন্যায় করে কিছু ভাবেন তাহলে বলার কি থাকতে পারে?

এমন সময় ছুটি মুখ ধুয়ে বাইরে এল নাইটির উপর শাল জড়িয়ে।

আমি আলাপ করিয়ে দিলাম, বললাম, লাবুর মা, আমাদের মাসীমা।

লাবুর মা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ছুটির দিকে।

ছুটি ওঁকে নমস্কার করল, হাত তুলে।

উনি এমন ভাবে ছুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন যে আমার লজ্জা করতে লাগল। উনি কোনো কথা বললেন না ছুটির সঙ্গে। চোখ দিয়ে গিলতে লাগলেন ছুটিকে।

ছুটি লজ্জা পেল। বলল, আপনি বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।

এতেও লাবুর মা কিছু বললেন না।

ছুটি চলে যেতেই আমার দিকে ফিরে বসে বললেন, বৌমা কবে এল বাবা? বাঃ, বেশ শ্রী আছে ত আমার বৌমার। মুখে একটা আলগা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু বাবা, সিঁদুর লাগায় না কেন বৌমা?

বললাম, উনি আপনার বৌমা নন।

মাসীমা নড়ে-চড়ে বসলেন, ওঁর চোখে-মুখে দারুণ একটা উৎসাহ উদ্দীপনা ফুটে উঠল। মনে হল লাবু-হারানোর শোক উনি বেমালুম ভুলে গেছেন।

উনি বললেন, বৌমা নয় ত কে বাবা?

উনি আমার একজন বান্ধবী। মানে আমার একজন পাঠিকা।

পাঠিকা মানে?

মানে আমি যে-সব বই লিখি, সে সব বই উনি পড়তে ভালবাসেন।

তুমি আবার বই লেখ নাকি বাবা? কিসের বই?

আমি বললাম, এমনিই বই; গল্প-টল্প। উপন্যাস।

ও-ও-ও।—মাসীমা বললেন। কই? আমাকে কেউ বলেনি ত? তা কি করে লেখ? বানিয়ে বানিয়ে? না সত্যি ঘটনা? না কি কিছু সত্যি, কিছু বানিয়ে? তোমার এমন ক'জন পাঠিকা আছে বাবা?

আমি বুঝলাম, লাবুর মা গত অনেক বছর যেভাবে দিন কাটিয়েছেন তাতে বেঁচে থাকা ছাড়া, বেঁচে থাকার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছু জানা বা জানার অবকাশ তাঁর হয়নি। এটাই স্বাভাবিক। উনি যে এখন বই পড়বেন—তা আমার বই কেন? অন্য কারো বইই পড়বেন তা আমি আশা করিনি। অথচ যখন ওঁর স্বামী বেঁচে ছিলেন উনি নিশ্চয়ই অন্য দশজন মহিলার মতই পড়াশুনা করতেন--দুপুরে ঘুমুবার আগে ত বটেই। নভেল, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, সিনেমা-পত্রিকা। উনি নিজেও তখন একজন 'পাঠিকা' ছিলেন। আমার নয়। কারণ তখন আমি হয়ত লেখা আরম্ভই করিনি।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

মাসীমা বললেন, তা মেয়েটি কি আইবুড়ো? বিয়ে-থা হয়নি?

আমি বললাম, না। বিয়ে হয়নি।

উনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বললেন, তোমাকে ত বাবা ভাল ছেলে বলেই জানতাম। তোমার যে স্বভাব-চরিত্রের দোষ আছে কখনও কারো কাছে শুনিনি ত। যে-মেয়ে, যে-কুমারী সোমত্থ মেয়ে অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ি এই জঙ্গলে একা-একা নির্ভাবনায় রাত কাটায়, সে মেয়েও কম নয়। তোমাদের দুজনের মধ্যে কার বেশী দোষ তা বুঝতে পারছি না বাবা। তবে ব্যাপারটা মোটেই হেলা-ফেলার নয়।

আমি বললাম, মোটেই নয়। তবে দোষটা আমার। ওর নয়। কাজেই মাসীমা, আপনি ফিরে গিয়েই যা সকলের সঙ্গে আলোচনা করবেন তাতে দোষটা আমার ঘাড়েই দেবেন। ওর ঘাড়ে নয়।

লাবুর মা বললেন, পীরিত ত খুব দেখছি। তা বৌমা কি এসব জানে?

আমি বললাম, মাসীমা, এ সব কথা এখন থাক। লাবুর কথা বলুন।

ইতিমধ্যে ছুটি লালির হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে টোস্ট করিয়ে, সাতসকালে ফল কাটিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম, ছুটি নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরে এসেছে।

ছুটি সকালের ফুলের মত নিষ্পাপ হাসি হেসে বলল, মাসীমা, খান।

বলে, টেবলে ডিশগুলো নামিয়ে রাখতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, মাসীমা, ক' চামচ চিনি দেব আপনাকে?

মাসীমা অনেকক্ষণ অপলকে চেয়ে রইলেন ছুটির দিকে।

ওর মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা অবধি আঁতিপাঁতি করে দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ খুঁজতে লাগলেন।

ওঁর চোখে যেন এক্স-রের মেসিন লাগানো আছে। এ কথা আগে একবারও মনে হয় নি।

কিন্তু ওঁর মুখ দেখে মনে হল উনি হতাশ হলেন।

ছুটি তাকিয়ে ছিল ওঁর মুখের দিকে চিনির পাত্রে চামচ ডুবিয়ে—।

লাবুর মা বললেন, আমি চা খেয়ে এসেছি মা। আমি কিছু খাব না।

ছুটি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকাল, তারপর চকিতে একবার আমার মুখে তাকিয়ে আমার ও ওর কাপে চিনি ঢেলে তাড়াতাড়ি চা বানাতে লাগল।

ছুটি মুখ নামিয়ে ছিল। দেখলাম ও নীচের ঠোঁট কামড়ে আছে।

কথা ঘুরোবার জন্যে আমি বললাম, মাসীমা, লাবুর জন্যে চিন্তা করবেন না। ওর বেড়ানোর শখ মিটে গেলে ও আপনিই ফিরে আসবে। ওকে ত বেদেরা ধরে নিয়ে যায়নি। ও ত নিজের ইচ্ছাতেই গেছে। ছোটবেলা থেকে নিজের ইচ্ছা বা খুশীমত ও ত বেশী কিছু করতে পারেনি। এই একটা জিনিস না হয় করলই।

তুমি কি ধরনের লোক সে সম্বন্ধে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না সুকুমার। এখন আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে তোমার প্ররোচনাতেই লাবু অসুস্থ শরীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

ছুটি হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বলল, সে প্ররোচনা দিয়ে ওঁর কি লাভ হত?

আমি ছুটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, মাসীমা না-জেনে সাপের মাথায় পা ফেলেছেন— কামড় তাঁকে খেতেই হবে। এ সাপ আমার মত নির্জীব জল-ঢোঁড়া সাপ নয়, এ বিষ-কেউটে।

মাসীমা বললেন, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি না মা, তোমার ফোড়ন কাটার দরকার কি?

দেখলাম, আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই হঠাৎ বললাম, মাসীমা, ছুটি এক্ষুনি রাঁচী যাবে—ওর তৈরী হতে হবে এক্ষুনি—আমাকেও যেতে হবে ওকে তুলে দিতে— আমরা তাই উঠব।

ট্যাক্সিতে যাবে বুঝি? মাসীমা তবুও অম্লানবদনে বললেন।

আমি একটু শক্ত গলায় বললাম, না; বাসে যাব।

আজ ত বাস যাবে না বাবা, কাল বাস চামার কাছে এ্যাক্সিডেণ্ট করেছিল। কয়েকদিন বাস বন্ধ থাকবে।

ছুটি ও আমি দুজনেই আশ্চর্য হলাম কথাটা শুনে। এ খবরটা আমাদের কারোরই জানা ছিলো না।

আমি বললাম, তাহলে কারো গাড়ি ঠিক করব। কর্ণেল সাহেবের গাড়ি কি অন্য কারো গাড়ি।

মাসীমা বললেন, অ।

ছুটি আমার চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মাসীমার দিকে তাকিয়ে বলল,

না, আজ আমি যাব না ভাবছি। সুকুদার কাছে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। ভাবছি ক'দিন থেকে যাব।

ভাবছ? মাসীমা উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন।

তারপর বললেন, আমি তাহলে উঠি বাবা সুকুমার। আসি মা।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা মাসীমা, আসুন।

মাসীমা গেট দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ছুটি বলল, আপনার এখানে এরকম কতজন মাসীমা-পিসীমা আছেন?

আমি হাসলাম, বললাম, চটছ কেন? বেশীর দরকার কি? একজনই যথেষ্ট।

বহু বছরের মধ্যে আজই লাবুর মা প্রথম তাঁর প্রাত্যহিক কাজ থেকে ছুটি নেবেন। আজই এখানে যত বাড়ি আছে, বিশেষ করে বাঙালিদের বাড়ি, সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে উনি আমাকে এবং তোমাকে নিয়ে অনেক রসালো গল্প করবেন। আজ যদি বিকেলে স্টেশানে যাই, ত দেখবে স্টেশানের সকলে আমার দিকে এক নতুন চোখে তাকাচ্ছে। আমি লোকটা যে এতবড় বজ্জাত দুশ্চরিত্র তা তাঁরা জানতে পেরে আমার সংগে যে সকলে এতখানি ঘনিষ্ঠতা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন এবং আমার সংগে ভাল ব্যবহার করে ফেলেছেন তার জন্যে অনুশোচনা করবেন।

ছুটি বলল, যা বলেছেন।

তারপরই একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি আপনার জীবনে শনির মত আবির্ভূত হয়েছি। আমার জন্যে আপনার কত অপমান সইতে হয়, আমাকে ঘিরে আপনার কত দ্বিধা, কত সংকোচ। কত হীনমন্যতা।

বললাম, এ কথা যদি তুমি বল ত আমার কিছু বলার নেই। তুমিও কি মাসীমার মত ঝগড়া করতে চাও আমার সংগে!

ছুটি অভিমানী গলায় বলল, আমি ত ঝগড়াটিই। সকলের সংগে ঝগড়া করাই ত আমার কাজ।

চা খেতে খেতে বললাম, সত্যিই তুমি থাকছ, না মাসীমাকে শোনানোর জন্যেই বললে!

হয়ত আপনাকে শোনানোর জন্যেও। না। কেন থাকব? আমি যখন মাসীমার বৌমা নই তখন এখানে থাকলে ত আপনার নামে কলঙ্ক রটবে চারদিকে।

আমি ছুটির হাতে হাত ছুঁইয়ে বললাম, এমন করে বলা তোমার অন্যায় ছুটি। খুবই অন্যায়। তুমি মিছিমিছি আমার সংগে খারাপ ব্যবহার করছ।

তারপর বললাম, চল বেড়িয়ে আসি, আর দুপুরে কি খাবে বল। হাসানকে ডেকে বলে দাও।

ছুটি বলল, আপনি যা খাবেন, তাইই খাব। আপনি বসুন, আমি তৈরী হয়ে আসছি। আপনি তৈরী হবেন না?

তুমি যাও, আমার তৈরী হতে পাঁচ মিনিট লাগবে।

ছুটি চলে গেলে, বসে বসে ভাবছিলাম, সত্যিই পৃথিবীটা কেমন একটা নির্দয় জায়গা যেন। কোথাও কারো একটু সুখ দেখলে, কেউ একটু আনন্দে আছে জানলে সকলে যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

সমাজটা যেন একটা চাইনীজ চেকারের ছক। যার যার স্থান, যার যার রঙ সব ঠিক করে দেওয়া আছে। ছকে ছকে পা ফেলে ফেলে এক ছক থেকে আর এক ছকে যে রঙে সমাজ রাঙিয়ে দিয়েছে আমাদের সেই রঙের একটা বল হয়ে গিয়ে এগোতে হবে। তাও এগনো বা পিছোনোতেও আমাদের নিজেদের কোনোই হাত নেই। সামাজিক পণ্ডিতরা আমাদের এক ছক থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য ছকে বসাবে তবেই আমরা এগোতে পারব।

এতদিন ভাবতাম যে, ছুটি সমাজকে ভয় করে না। করে না যে, তার প্রমাণ ও বারে বারে দিয়েছে। এ জন্যে ওকে আমি সম্মান করি। যা অনেকে করতে চায়, সবসময় করার জন্যে আকুল হয়ে থাকে; কিন্তু বিদ্রোহী হবার সাহস রাখে না, সেই বিদ্রোহ অন্য কেউ সত্যি সত্যি করতে পারলে তাকে দেখে সম্মান নিশ্চয়ই করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু মানুষের মন সজনেপাতার মত হালকা, ভারশূন্য। হাওয়া উঠলেই তাতে দোল লাগে। আর লাগে যে, তা ছুটিকে দেখেই বুঝতে পারছি। ও সমাজকে কখনও মানেনি, লোকভয়, লোকনিন্দা কখনও ভ্রূক্ষেপ করেনি, তবুও ওর মনও যে অশান্ত হয় ও যে মনে ব্যথা পায়, কেউ ওর এই স্বাধীনতাবোধ ও বিদ্রোহকে ছোট চোখে দেখলে, তা নিয়ে বিদ্রূপ করলে, তা

পরিষ্কার বুঝতে পারি।

ওর জন্যে খারাপ লাগতে লাগল।

সমাজের মত ন্যক্কারজনক ঘৃণিত পরাধীনতার প্রতীক অন্য কিছু বোধহয় আমাদের জীবনে নেই, অথচ তবু সরল সত্য এইই যে, এখনও সমাজের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেককে এমন কি ছুটিকেও বাস করতে হয়। রাস্তার লোকও অপমান করে যায় বিনা-এক্তিয়ারে। এই পরের ব্যাপারে নাক-গলানো নোংরা স্বভাব বোধহয় বাঙালীর মত আর কারো নেই। এই সামাজিক বাজপাখি-গুলো দিনরাত আকাশে উড়ে উড়ে তাদের নিজেদের বুকের শূন্যতায় ভরা চি'-ই-চি'-ই-ই-ই চীৎকারে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে—আর তাদের শ্যেন-দৃষ্টিতে উপর থেকে সবসময় নজর করে, ওদের চোখ এড়িয়ে কেউ সুখী হলো কিনা।

যেই-না কাউকে তেমন দেখে, অমনি হিংসায় জ্বলেপুড়ে ছোঁ মারে তাদের উপর—তাদের বিষাক্ত প্রাগৈতিহাসিক ডানার ঝাপটায় আর অন্ধ ঈর্ষাকাতর সংস্কারের নখে তাকে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত করে দেয়।

পুরোনো দিনের শাশুড়িদের মত, তারা নিজেরা যেহেতু অল্পবয়সী জীবনে অনেকানেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের বউদের সেই বয়সে সেইসব বঞ্চনার শিকার হতে না দেখলেই তারা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়, হিংসায় জ্বলে-পুড়ে ওঠে, বলে, কি? এত সাহস! আমরা হাহাকার করে মরলাম, প্রতি মুহূর্তে বুক-ভরা হাহাকার' নিয়ে এই সমাজের জয়ের শ্লোগান দিলাম উচ্চগ্রামে আর তোমরা কিনা এই সমাজের মধ্যে বাস করেও সুখী হবে? জোর করে সুখ ছিনিয়ে নেবে ছকের বাইরে গিয়ে? বলে, না। সেটি হবে না।

ছুটি রাতের দু'বিনুনী খোলেনি। একটা হলুদের উপর সাদা ফুলফুল ম্যাকসি পরেছে। পায়ে ব্যালেরীনা শু। হাতে নিয়েছে আমার একটা খড়ের-টুপী।

ছুটি দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, চলুন, আমি রেডি।

আমি উঠে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম।

তারপর আমরা দুজনে চামার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে সব বাড়ি ঘর পেরিয়ে এলাম। মিস্টার অ্যালেনের বাড়ি ছাড়িয়ে যেতেই চড়াইটা উঠতে হল। চড়াইটা পেরিয়ে অনেকখানি সোজা পথ। দূরে আবার একটা চড়াই।

শীতের সকালে চারদিকের মাটি, ঘাস, পাতা তখনো ভিজে ছিল। পথের ধুলোতেও একটা ভিজে ভিজে ভাব। চতুর্দিক থেকে একটা ঠান্ডা সোঁদা শীতের ভৈরবী গন্ধ বেরুচ্ছে। রোদের আঙুল এখানে ওখানে বনের গায়ে এসে পড়েছে। ধীরে ধীরে পাহাড়-ছাড়ানো সূর্যটা সমস্ত বনকে আলোয় ভরে দিচ্ছে। উষ্ণতার আনন্দে ভরে দিচ্ছে।

একটা পাপিয়া ডাকছে থেকে থেকে। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে ক্রমাগত—কাঁহা, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা? প্যাট এই পিউ-পাখিকে বলে ব্রেইন-ফিভার। এটাই বোধহয় পিউ-কাঁহার ইংরিজি নাম।

ছুটি টুপীটা হাতে নিয়ে আমার সামনে সামনে হেঁটে চলেছে।

দু' বিনুনী করায় ওর গ্রীবাটা চুলে ঢাকা পড়েনি। কতগুলো ছোট ছোট অলক ওর সুন্দর মরালী গ্রীবায় কুঁকড়ে আছে।

ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে ছুটিকে।

ছুটি বলল, কোথায় যাবেন?

বললাম, চলোই না। যেতে যেতে তারপর ঠিক করা যাবে। যাওয়াটাই হচ্ছে আসল। বেরিয়ে পড়লে কি গন্তব্যের অভাব হয়।

ছুটি বলল, তা নয়। তবুও আমার এই গন্তব্যহীন হাঁটাহাঁটি ভাল লাগে না। কোনো গন্তব্য না থাকলে আমি কোথাওই যাই না। বনেও না, মনেও না।

বললাম, চল, তোমাকে একটা পোড়ো বাড়ি দেখিয়ে আনি।

ছুটি হাসল। যেন অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি বলে আমাকে একটা কনসোলেশান প্রাইজ দিল।

ছুটিকে হাসলে ভারী ভাল লাগে। দুষ্টু দুষ্টু, মিষ্টি মিষ্টি, ওর হাসিটা প্রথমে চোখের মণিতে মৌটুসী পাখির শরীরের চঞ্চলতার মত দুলে ওঠে, তারপর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ে—ওর গালের টোলে গড়িয়ে যায়।

ছুটি হেসে বলল, এবারে আপনার কি হয়েছে বলুন ত? কাল স্টেশানে নামতেই যা দৃশ্য দেখালেন তা যেন জীবনে আর কখনও দেখতে না হয়। সারা রাত আমার কী যে ভয় করেছে কি বলব। ঠিক ভয় নয়, কেমন এক দারুন মন-খারাপ; আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

তারপর একটু থেমে বলল, সকালে যদি বা রোদ উঠল, মন ভাল লাগতে লাগল, হাজির করলেন মাসীমাকে। মাসীমা যদি বা দয়া করে চলে গেলেন, এখন চলেছেন পোড়ো-বাড়ি দেখাতে। কিন্তু কেন?

আমি বললাম, পোড়ো বাড়ি দেখতে তোমার ভাল লাগে না! ভাল না লাগলে যাব না। চল এমনিই জঙ্গলের পথে হাঁটব।

আমার কিন্তু জানো, যে-কোনো পোড়া বাড়ি দেখলেই দারুণ লাগে। এই বাড়িগুলোর যে একটা অতীত ছিল, সে কথা মনে পড়ে যায়। হাওয়ার শিসের মধ্যে, পাখির ডাকের মধ্যে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া বাস্তু সাপের চলার মন্থরতার সঙ্গে আমার কেন জানি অনেক কিছু কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়।

তারপর কি মনে হয় জানো?

—কি? মুখ ফিরিয়ে ছুটি বলল।

—মনে হয় আমরা প্রত্যেকেই এক একটা পোড়ো-বাড়ি। এ জীবনে এই আমাদের প্রত্যেকের শেষ পরিণতি। আর এইই যদি শেষ পরিণতি হয় তাহলে শৈলেনকে বোকা ভাবি কি করে? একটা একটা করে ইঁট খসে যাওয়ার চেয়ে, বুকের মধ্যে পরতে পরতে ধুলোর আস্তরণ জমার চেয়ে, চোর-ডাকাতে মনের দরজা-জানালা এক এক করে খুলে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে, প্রচন্ড জীবন্ত অবস্থায় নিজেকে নিবিয়ে দেওয়াই ত ভাল।

ছুটি কথা না বলে, হাঁটতে হাঁটতে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, সেদিন মিস্টার বয়েলস-এর বাড়ি থেকে ফেরার সময় প্যাট একটা খুব দামী কথা বলেছিল।

—কি কথা? ছুটি শুধোল।

—প্যাট বলছিল "আই ওয়াণ্ট টু ডাই উইথ আ ব্যাঙ্গ, এন্ড নট উইথ আ হুইমপার।"

ছুটি অসহিষ্ণু গলায় বলল, আপনার কি ধারণা আত্মহত্যা করলেই লোকে সশব্দে মরে, অন্যভাবে সেই মৃত্যুবরণ করা যায় না? আপনি কি মনে করেন যে-সব লোক প্রতিমুহূর্তে মরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে, তিলতিল করে, কেউ হয়ত দারিদ্র্যে মরছে—আর্থিক দারিদ্র্যে, কেউ চরম মানসিক দারিদ্র্যে, তাদের প্রত্যেকেরই আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া উচিত?

—তা বলিনি। হয়ত স্বাভাবিক নিয়মে কামরাজের কথাটাই মানা উচিত। তামিলনাড়ুর কামরাজের কথা।

—কামরাজের কথা আবার কি? ছুটি বলল।

আমি বললাম, পারকালম্, অর্থাৎ ওয়েট এন্ড সী। মানে, দেখোই না কি হয়।

গরীব যে তা, মনে মনে বিশ্বাস করা উচিত যে, একদিন সে হরিয়ানা লটারী জিততেও পারে, একদিন দেশে সত্যি সত্যিই সমাজতন্ত্র আসতেও পারে, যা নিছক গরিবী হঠানোর ফাঁকা বুলি নয়। যে মনে গরীব, তারও ভাবা উচিত একদিন তার মন ফুলে ফলে ভরে যেতে পারে।

—সেটা ভাবা কি ভুল? ছুটি বলল।

—ভুল অথবা ঠিক তা আমি জানি না। এই পার্‌কালম্-এ বিশ্বাস আমার নেই, সে কথাই বলছি।

—তাহলে আপনি বলতে চান যে আত্মহত্যা করাই জীবনে একমাত্র পথ?

—সে কথাও আমি বলিনি। তোমাকে কি করে বোঝাব জানি না।

তারপর হঠাৎ বললাম, তুমি জানো আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কেন আত্মহত্যা করেছিলেন?

—আমি কেন? কোন্ লোক কেন আত্মহত্যা করে সে নিজে ছাড়া আর কেউই তা জানতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবু শুনি, আপনি যখন জানেন বলছেন।

—আমি যতটুকু জানি, তাতে এইই মনে হয় যে, উনি মনে করতেন যে একজন মানুষ মরে যায়, কিন্তু কখনও সে হারে না। মানুষকে মেরে ফেলা যায়, ধ্বংস করে ফেলা যায়, কিন্তু তাকে হারিয়ে দেওয়া যায় না। আমি জানি না, যা বলতে চাইছি তা তুমি বুঝলে কিনা। ধরো, শৈলেনকে

নয়নতারা মেরে ফেলল, কিন্তু শৈলেনকে হারাতে তো পারল না। বরং নিজেই চিরজীবনের মত হেরে রইল শৈলেনের কাছে। তারপর ধরো, আমি আরেকজন বিখ্যাত জীবিত লোকের কথাও জানি—তিনিও দারুণভাবে বিশ্বাস করেন আত্মহত্যায়।

—কি তিনি?

—তোমার প্রিয় ইটালিয়ান ফিল্মডিরেকটর, মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি।

ছুটি একটু অবাক গলায় বলল, ওঁর কিসের দুঃখ? ওঁর মত সাকসেসফুল মানুষ কেন এমন নেগেটিভ ভাবনা ভাবেন?

—বাইরে থেকে কোন্ মানুষকে আমরা বুঝতে পারি বল? এমন কোনো মানুষ আছে কি যার হাসির আড়ালে দুঃখ লুকোনো নেই?

ছুটি আমার কাছে সরে এল। আমার হাতের পাতা ওর হাতে নিল। তারপর আমার হাতটাকে দোলাতে দোলাতে বলল, বলুন না, আন্তোনিওনির কথা কি বলছিলেন?

—আন্তোনিওনিকে একজন ফিল্ম জার্নালিস্ট প্রশ্ন করেছিলেন, ওঁর ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের প্রায়ই আত্মহত্যা করতে দেখা যায় কেন? আত্মহত্যা কি আন্তোনিওনির প্রি-অকুপেশান?

আন্তোনিওনি জবাব দিয়েছিলেন যে, আত্মহত্যা তাঁর প্রি-অকুপেশান নয়। কিন্তু মানুষের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের অবসানের অনেকানেক পথের মধ্যে ওটাও একটা পথ মাত্র। খুব বীভৎস পথ, সন্দেহ নেই; কিন্তু অন্য দশটা পথের মতই একটা ন্যায্য পথ।

জীবন যদি ভগবানের দান হয়, তাহলে সেই জীবন থেকে আমাদের স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করার অধিকারটুকুও ভগবানের দান বলেই স্বীকৃত হওয়া উচিত।

ছুটি আপনমনে বলে উঠল, আশ্চর্য! কেন মানুষ এত সহজে হেরে যেতে চায়? হেরেই যদি যাব ত আমরা মানুষ হয়ে জন্মলাম কেন?

ছুটির গলার স্বরে এক শান্ত অসাহয়তা ঝরে পড়ল। আমার মনে হল এই স্বগতোক্তির মধ্যে ও যেন ওর নিজের জীবনের হার-জিতের কথাও বলছে।

আমরা তখন একটা আমলকী বনের তলা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ততক্ষণে চারিদিকে ঝকঝকে রোদ উঠে গেছে। বনের পথে আলোছায়ার নানারকম সাদা কালো ছবি হয়েছে।

আমি ছুটিকে আমার কাছে টেনে নিলাম।

ছুটি অবাক হয়ে তাকালো আমার মুখের দিকে।

আমি ছুটির গ্রীবায় চুমু খেলাম, তারপর ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম।

ভালোলাগায় ছুটি চোখ বুঁজে ফেলল।

ছুটির বন্ধ চোখে, প্রথমে বাঁ চোখে, তারপর ডান চোখে আমি চুমু খেলাম, তারপর ছুটির শান্ত শ্বেতা কপালে।

ছুটিকে ছেড়ে দিতেই ছুটি চোখ মেলল। চোখ মেলেই আমার বুকে ঝাঁপিয়ে এসে আমার বুকে মুখে চোখে তার অজস্র ছেলেমানুষী সরল ভালোবাসায় চুমু খেতে লাগল। আমার কোমর দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল, মনে হল কখনও বুঝি ও আমাকে ছাড়বে না।

ছুটির নরম ছিপছিপে শরীরকে আমার বুকের মধ্যে ধরে থাকলাম। ওর নরম অথচ ঋজু বুক হাওয়া লাগা আমলকীপাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল।

ও আমার বুকের মধ্যে মুখ রেখে গরম নিঃশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলে উঠল, আমার সংগে কখনও আর এ নিয়ে আলোচনা করবেন না সুকুদা, আমার ভীষণ ভয় করে, আমার ভীষণ ভয় করে।

আমি বললাম, ভয় করে কেন ছুটি, কিসের জন্যে ভয় করে?

ছুটি বিড়বিড় করে বলল, আপনার জন্যে ভয় করে সুকুদা, আপনার জন্যে বড় ভয় করে।

আমি বললাম, পাগলী।

বললাম, দেখি আমার ছুটির সুন্দর মুখটা একবার দেখি?

ছুটি মুখ তুললো না আমার বুক থেকে।

আমি দু'হাতের পাতার মধ্যে করে ওর মুখকে আমার বুক থেকে তুললাম।

দেখলাম, ওর দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

ওর মুখকে আবার আমার বুকের মধ্যে নিয়ে আমি বিড়বিড় করে বললাম, ছুটি, ও আমার ছুটি, তুমি কখনও আমার সামনে কেঁদো না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, বিশ্বাস

করো, ভীষণ কষ্ট হয়।

ছুটি হঠাৎ মুখ তুলে আমার চোখের দিকে তাকাল।

দেখলাম, তখনও ওর গাল বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে, কিন্তু মুখে একটা দারুণ হাসি। আমার ছুটিই বুঝি শুধু এমন করে কাঁদতে কাঁদতে হাসতে জানে।

বাড়িটার নাম নাইটিঙ্গেল। বড় রাস্তা থেকে একটা পথ সোজা চলে গেছে গভীর জঙ্গলে মধ্যে দিয়ে। পথের দু'পাশে মোরব্বা ক্ষেত। অনেকদিন আগে লাগানো ছড়ানো-ছিটোনে বোগেনভেলিয়া। একটা কালভার্ট পড়ে পথে। নীচ দিয়ে লাল বুক দেখিয়ে গড়িয়ে গেছে একটা পাহাড়ী নালা, কালো পাথরগুলো প্রকৃতির বুকের অসংখ্য বোঁটার মত উঁচিয়ে আছে।

বাড়িটা একসময় দোতলা ছিল। দোতলার ছাদ ধসে গেছে। কিন্তু একতলার ছাদটা আছে ছুটির হাত ধরে ভাঙ্গা ধুলিধূসরিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই চোখ জুড়িয়ে গেল।

প্যাটের কাছে শুনেছিলাম এ বাড়ি এক বৃদ্ধের ছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সে উনি একজন উনিশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণে ঐ অসীম নির্জনতার মধ্যে একমাত্র য পেলে সে খুশী হত, তা সেই মহিলা তাঁর চেয়ে একত্রিশ বছরের বড় স্বামীর কাছ থেকে পেতে না। স্বামীর সবরকম সাধ, চেষ্টা সত্ত্বেও পেতেন না।

কোনো হাততালি-চাওয়া বোকা-বাঙালী মেয়ে হলে উনি হয়ত পতি-পরম-গুরু ভেবে তার বাকি জীবনটা এই পাহাড় বনের হাওয়ার মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুর পুজো করে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সতী-সাধ্বীর মত কাটিয়ে দিতেন।

কিন্তু মেয়েটি স্কচ ছিলেন। ওরা কোনো নেতিবাচক জিনিসে বিশ্বাস করে না; করেনি কোনোদিন। তাই স্বামীকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেওয়ার পর নিজের জীবনকে ভালোবাসতেন বলে তিনি নিজের পথ বেছে নিয়ে চলে গেছিলেন একদিন। নিজের সুখের জন্যে।

জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন বলে তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে থাকবার উপযুক্ত ছিল; কিন্তু শেষ-প্রৌঢ়ত্বের গেঁটে বাত দাঁত-ব্যথা ইত্যাদি নিয়ে একা একা থাকার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত ছিল না। তাই ভদ্রলোক এক সময়ে গঞ্জের ভিতরে আর একটি বাড়ি কিনে চলে যান। বহুদিন আগে ভদ্রলোক মারা গেছেন।

তারপর থেকে এই বাড়ি পোড়ো বাড়ি।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছিল একটা কনকনে। ছুটির ম্যাক্সি দুলে উঠছিল হাওয়ায়। ম্যাক্সির নীচে ওর সুন্দর লেসবসানো শায়ার প্রান্তে ওর সুগৌর গোড়ালি দেখা যাচ্ছিল।

ছুটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল বহুদিন আগের সেই উনিশ বছরের বিদেশিনীকে যেন আমি আমার সামনে প্রত্যক্ষ করছি।

ওরা এ বারান্দায় বসে চা খেত, চাঁদনী রাতের গরমের দিনে মহুয়ার গন্ধভরা হাওয়ায় আর রাতচরা পাখির ডাকের মধ্যে ওরা এই দোতলার খোলামেলা ঘরে অনেক দারুণ খেলা খেলত।

সে-খেলায় ভদ্রলোক রোজই হেরে যেতেন আর চাঁদকে অভিশাপ দিতেন, নিজের কোমরের বাতকে অভিশাপ দিতেন, দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারকে অভিশাপ দিতেন। মনে মনে বলতেন, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু সময়। সময়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যা করার সবকিছু তার সঙ্গে সঙ্গেই থেকে করে নিতে হয়। বুঝতে পারতেন, সময় হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলে তখন কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো পাওয়াই তখন পাওয়া নয়।

ছুটি বলল, দারুণ বাড়িটা, না?

আমি ঠাট্টার গলায় বললাম, তুমি নেবে? বল? নাও যদি ত তোমার জন্যে কিনে দি—তারপর মেরামত করে দেব। তুমি এ বাড়িতে থাকবে আর আমি প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে তোমার কাছে আসব—শুধু পূর্ণিমার রাতে।

মাসের বাদবাকী ঊনত্রিশ দিন তুমি আমার প্রতীক্ষায় থাকবে; আমি তোমার প্রতীক্ষায়। এখানে থাকতে যদি ত' প্রতি পূর্ণিমাতে তোমাতে আমি, আমাতে তুমি পূর্ণ হতাম; আপ্লুত হতাম, পরিপূর্ণভাবে পরিপ্লুত হতাম। কি? বল? নেবে?

ছুটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

বলল, এমন এমন সব কটমট ভাষা বলছেন, মানে বুঝতে পারছি না।

তারপর বলল, আপনি ভীষণ রোম্যান্টিক। আপনার মত রোম্যান্টিক পুরুষমানুষ আমি দেখিনি। তারপর আমার হাতে কাঁধ ছুঁইয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, সত্যিই দেখিনি। এই জন্যেই ত আপনাকে এত ভাল লাগে।

আমি বললাম, আমার মধ্যের রোম্যান্টিক মানুষটা এমনিতে কুম্ভকর্ণর মত ঘুমোয়। যখন তুমি কাছে আস, সামনে দাঁড়াও, শুধু তখনি সে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পাগলামি শুরু করে। দোষই বল আর গুণই বল, সেটা তবে কার?

ছুটি হাসল। বলল, জানি না।

কিছুক্ষণ পর ছুটি বলল, বাড়ি যাবেন না?

—যেতে ইচ্ছে করছে না।

—এখানে থাকবেন?

—না। এখানে থাকব না বেশীক্ষণ। জায়গাটা অপয়া।

—কেন? অপয়া কেন?

—তোমার মত একজন মেয়ে এখানে থাকত, সে যার সঙ্গে থাকত তাকে ছেড়ে সে চলে গেছিল।

—তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কারো কাছে ত পেঁৗছেছিল। তাহলে আর অপয়া বলছেন কেন?

তারপর বলল, মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-কোনো লোকের জীবনেই সমস্ত কিছু পয়মন্ততা আর অপয়মন্ততার যোগফল শূন্য। কি? ঠিক না?

আমি কথা বললাম না, ছুটিকে হাত ধরে নামাতে লাগলাম।

মাঝ-সিঁড়িতে এসে ছুটি বলল, সুকুদা, আমাকে কোলে করে নামান না? পারবেন?

মাঝে মাঝে ওকে কী যে দুষ্টুমিতে পায়, ওই জানে।

আমি ছুটিকে পাঁজাকোলা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

ওকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিতেই ওর সুন্দর ধবধবে হাঁটু অবধি অনাবৃত হয়ে গেল। ওর হারের লকেটটা একদিকে ঝুলে রইল; দুলতে লাগল।

আমি ওকে তুলে নিয়ে ওর হাঁটুতে চুমু খেলাম।

ছুটি বলল, আঁউ—এই সুকুদা ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে।

ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, আমরা কুয়োটার ধারে এসে দাঁড়ালাম। কুয়োটা অনেক গভীর। নীচে পাতা পড়ে আছে, ফুল পড়ে আছে। কতগুলো কটকটে ব্যাঙ পোড়া কাঠের মত ভেসে আছে জলে।

ছুটি মুখ নীচু করে কুয়োর মধ্যে মুখ নামিয়ে ডাকল, সুকুদা-আ-আ।

সুকুদা—সুকুদা—সুকুদা—সুকুদা করে অনেকক্ষণ কুয়োর মধ্যে থেকে প্রতিধ্বনি উঠল।

ছুটি আবার বলল, ভালবাসি। ভালবাসি—ই-ই-ই-ই.. ....।

ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি.........আওয়াজটা কুয়োর মধ্যে, বনের মধ্যে, পাহাড়ের মধ্যে, আমার মাথার মধ্যে গুমগুমিয়ে ফিরতে লাগল।

কুয়োর পাড় ছেড়ে আমরা দুজন আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে, একা একা, আমাদের দুজনের মনের মধ্যেই যে কুয়ো আছে, যা সকলের মনের মধ্যেই থাকে, সেই কুয়োর দিকে তাকাতে তাকাতে, মনের আঙুলে সেই কুয়োর পচা-পাতা, ঝরা-ফুল, কুৎসিত ব্যাঙগুলো সরাতে সরাতে জঙ্গলের ছায়া-ভরা পথে হাঁটতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পর ছুটি বলল, 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি আমার মনই জানে...' —গানটা ভাল না? আপনি জানেন?

—তুমি জান?

—জানি।

—গাইবে?

—এখন না।

—তবে কখন? আমি শুধোলাম।

—যখন সময় হবে। ছুটি বলল।

আমি শুধোলাম, কিসের সময়?

—ও গান গাইবার সময়।

—এখন তবে কোন্ গান গাইবার সময়?

—'ও গান গাসনে, গাসনে। হৃদয়ে যে কথা আছে সে আর জাগাস্ নে........'

ওর ঐ কথা শুনে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। ছুটি হঠাৎ বলল, আপনি রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। না?

বললাম, নিশ্চয়ই।

ছুটি বলল, কিসের জন্যে?

—কারণ রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার বোস অথবা সুনীল গাঙ্গুলীর মত কোনো বিশেষ জেনারেশনের লেখক নন বলে।

—ত' তিনি কোন জেনারেশনের?

—যাঁরা সব জেনারেশনের লেখক, তিনি তাঁদের দলের। কোনো বিশেষ জেনারেশনের সস্তা স্বীকৃতির শীলমোহরে তাঁর প্রয়োজনে নেই।

—তাই? বলে ছুটি আমার মুখের দিকে তাকাল।

—তুমি রবীন্দ্রনাথ ভাল করে পড়েছো? আমি জিগ্যেস করলাম।

—মিথ্যে বলব না। ভাল করে পড়িনি। ছুটি এই প্রথম কবুল করল।

—তাহলে পড়ে ফেলো, শীগগীরই। তারপরই না হয় এ নিয়ে আবার দুজনে আলোচনা করব। ছুটি যেন মজা পেল। বলল, বেশ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে আসতে লাগলাম। আমরা যখন মিস্টার এ্যালেনের বাড়ির কাছে সেই উঁচু জায়গাটায় এসে পেঁৗছেছি, ছুটিকে বললাম, কেন জানি না, আজ তোমাকে দারুণ, দারুণ আদর করতে ইচ্ছে করছে।

ছুটি দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল, অসভ্য।

ছুটির মুখে তাকিয়ে বুঝতে পেলাম আমি কি বলতে চেয়েছি। তা ও বুঝেছে।

আমি বললাম, কি? করব না।

ছুটির মুখ একরাশ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ও মুখ নামিয়ে নিল। বলল, না। আজ না। এখন না।

আমি বললাম, কেন না? না কেন?

কিন্তু মনে মনে আমি খুব আশ্বস্ত হলাম। কারণ আমার মধ্যের যাত্রা দলের বিবেকটা রমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে পর্যন্ত নানারকম গান গেয়ে গেয়ে আমাকে ছুটির কাছ থেকে দূরে আসতে বলছিল। সেই বিবেকটাকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছি জেনে ভাল লাগল।

ছুটি কোনো জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম, না কেন, তা বললে না?

ছুটি বলল, মনে মনে আমি এখনও তার জন্যে পুরোপুরি তৈরী নই সুকুদা। আমাকে একটু সময় দিন।

তুমি কাল ত তৈরী ছিলে। আজ কি হল?

জানি না। মনে হচ্ছে আমার যখন ভীষণ আদর খেতে ইচ্ছে করে, তখন আপনার একেবারেই করে না। তখন মনে মনে আপনি যেন কোথায় চলে যান। আর আপনার যখন আদর করতে ইচ্ছে করে ততক্ষণে আমার মন সেই মুহূর্তের তীব্র ইচ্ছা থেকে সরে আসে। আমার ও আপনার মনের মধ্যে সীনক্রোনাইজেশানের বড় অভাব। এটা কিন্তু ভাল না। এটা অশুভ লক্ষণ।

আমি চুপ করে ছিলাম। চুপ করেই হাঁটছিলাম।

হঠাৎ ছুটি আমার হাতে হাত রেখে বলল, এই সুকুদা, রাগ করলেন?

আমি হাসলাম। বললাম, না ছুটি, রাগ করব কেন?

ছুটি বলল, আশা করি আপনি আমাকে বুঝবেন। আপনার কাছ থেকে ত সব পাওয়াই পেয়েছি, শুধু এই পাওয়া ছাড়া। এ পাওয়াটা তোলা থাক কোনো বিশেষ দিন, কোনো বিশেষ মুহূর্তের জন্যে। যে মুহূর্তে আমি এবং আপনি দুজনেই আমাদের শরীরে এবং মনে একে অন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ না রেখে, দুজনে দুজনকে সম্পূর্ণ ও ধন্য করব। যা চাইবার বা পাবার সবই পেয়ে গেলে মনে হবে আর বুঝি কিছু পাওয়ার নেই আমাদের একে অন্যের কাছ থেকে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, কিছু বাকি থাক; হাতে থাক কিছু।

॥ বাইশ ॥

শীতের প্রকোপ প্রায় কমে এসেছে। তবে শীত এখনও থাকবে বহুদিন।

কাল শেষ রাতে বসন্তের দূতী কোকিল কোথা থেকে খবর পেয়েছিল জানি না যে, শীতের দিন শেষ, সে অসময়ে পুলকভরে ডাক দিয়ে দিয়ে মাথার মধ্যে বসন্তের সব ভাবনাগুলো ফিরিয়ে এনেছে।

বাড়ির বাঁপাশে যে তুঁত গাছটা আছে তাতে তুঁতের ফল দেখা দিয়েছে। পেয়ারা ফ'লে শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। বোগেনভেলিয়াদের ডালে ডালে পাতা দেখা যায় না; এখন শুধু ফুল।

সকাল বিকেল রাত সমস্তক্ষণ কোকিলরা পালা করে ডাকে। কিছুদিন বাদে ওঁরাওদের সারহুল উৎসব। সন্ধ্যে হতে না হতেই মাদলের আওয়াজ শোনা যায় দোলানী সুরের গানের সঙ্গে। আগে-ফোটা কিছু মহুয়ার মিষ্টি'গন্ধ ভাসে হাওয়ায়।

শাল বনে বনে থোকা থোকা হলুদ-মেশানো সাদা ফুল এসেছে। হাওয়া সব সময়ে সে গন্ধে ভারী হয়ে থাকে।

কোকিল-ডাকা শুরু হবার পর থেকেই শীতটা রণপা চড়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে যেন।

পথের পাশে পাশে জারহুলের হালকা বেগুনী আর ফুলদাওয়াইর ঝিমধরা লাল চোখে পড়ে। পুটুসের যে কতরকম রং তা কি বলব। গাঢ় লাল, কমলা, হলুদ, বেগুনী, কালো; সবরকম।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা পথের দুপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাস-পাতা সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। যাতে দাবানল লাগলে এপাশের আগুন ওপাশে না ছড়িয়ে পড়ে।

গরম বেশী পড়লে দাবানল লাগবেই। শুকনো পাতায় পাতায় পাথরে পাথরে ঘষা লেগে প্রকৃতির অদৃশ্য ইঙ্গিতে বনের বুকে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে উঠবে। তারপর সেই আগুন ছড়িয়ে যাবে দিকে দিকে। দূর থেকে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা দুলতে দেখা যাবে। শুয়োর খরগোশ ভালুক সজারুরা তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে নেমে আসবে নীচের ঠাণ্ডা নালার খোলে।

সে-সব দিনের এখনও দেরী আছে। এখনও গরম পড়েনি আদৌ। শীত কমে গেছে এখানে; এ পর্যন্তই।

এ জায়গাটা সেদিক দিয়ে একটা আশ্চর্য জায়গা। গরম বলতে তেমন কখনোই পড়ে না এখানে। মে মাসেও রাতে চাদর গায়ে দিয়ে শুতে হয়—সকাল আটটা পর্যন্ত। এবং সূর্য ডোবার পরই প্রখর গ্রীষ্মেও বেশ একটা শীত শীত ভাব থাকে।

মাঝে একদিন স্টেশনে গেছিলাম। ছুটির ব্যাপারে যতখানি কৌতূহল দেখাবেন ওঁরা ভেবেছিলাম ততখানি কৌতূহল দেখলাম না।

হয়ত আমার উপর দয়াপরবশ হয়েই ওঁরা তা দেখালেন না।

একজন শুধু একথা-সেকথার পর শুধোলেন, আপনার সেই আত্মীয়া চলে গেছেন?

চলে গেছেন শুনে পরক্ষণেই প্রশ্ন করলেন, কবে গেলেন?

আমি বললাম, একদিন পরেই চলে গেছেন।

আত্মীয়ার কথাটার আভিধানিক মানে যা তাতে ছুটি আমার আত্মীয়া নয়। কিন্তু যে আত্মার কাছে থাকে, সবসময় আছে, সে ত আত্মীয়াই। তার চেয়ে বড় আত্মীয়া আর কে হতে পারে?

মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকের জীবনে অনেক অনেক পুরানো শব্দ আর বর্তমানে যথার্থ অর্থবাহী নেই, নতুন কোন অভিধানের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মাস্টারমশাই বললেন, কথাটা শুনেছেন!

বললাম, কি কথা?

শৈলেন তার পোস্ট-অফিস সেভিংস এ্যাকাউণ্টে যত টাকা ছিল, তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের

টাকা, ডিউটি করতে করতে মারা যাওয়ার জন্যে কমপেনসেশান সবই নয়নতারাকে লিখে দিয়ে গেছে।

বললাম, আত্মহত্যা করলেও কি পাওয়া যায় ক্ষতিপূরণ?

না। তা পাওয়া যায় না। তবে, রেলের বড়কর্তারা এবং আমরা সকলেই বলেছি যে, এটা অ্যাকসিডেণ্ট। আত্মহত্যা নয়! সত্যিই হয়ত অ্যাকসিডেণ্ট। কে বলতে পারে? হয়ত শৈলেন অন্যমনস্কভাবে তখন লাইন পেরোতে গেছিল। এমন হঠাৎ অ্যাকসিডেণ্ট কি ভাবে ঘটে তা কি কেউ বলতে পারে?

বললাম, তা ঠিক। তারপর বললাম, আপনারা সকলে মিলে তাহলে নয়নতারাকে অনেকগুলো টাকা পাইয়ে দিলেন?

মাস্টারমশাই উপরে হাত তুলে বললেন, আমরা নিমিত্ত মাত্র, যা করার সব তিনিই করেন। আমরা কে? তারপর বললেন, আমরা কি ছাই জানি যে শৈলেনটা সব কিছু নয়নতারাকে লিখে দিয়ে যাবে?

—নয়নতারা এখন কোথায়?

—এখন এখানেই, তবে শীগগীরি চলে যাবে। এ নয়নতারাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। কোথায় গেছে তার রংঢং। সবসময়ই শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন দুপুরে ত শৈলেনের কোয়ার্টারের চাবি নিয়ে গিয়ে ওর ঘরে একা বসেছিল। শৈলেনের ড্রয়ারে নাকি ওর একটা ছবি ছিল। ছবি দেখে নাকি অনেক কান্নাকাটি করেছিল ও।

তারপর মাস্টারমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কি জানি বাবা, বুঝি না বাপু। এতই যদি ঢং দেখাবি ত আগেও ত একটু দেখালে পারতিস?

আমি চুপ করে থাকলাম।

ভাবছিলাম, হয়ত নয়নতারা তা দেখাতে পারত। কিন্তু আমরা কখন কি করি, কেন করি, তা কি আমরা জানি? জীবনের কোন্ ঘটনা কেমন করে, কখন যে আমাদের মনের গোপন তারে কিভাবে নাড়া দিয়ে যায়, তা সবসময় আমরা নিজেরাই কি জানতে পাই?

এ-কথা সে-কথার পর বেলা হতে আমি স্টেশন থেকে উঠে চলে এসেছিলাম।

আজকে সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে আছে। দুপুরের দিকে বৃষ্টি হতে পারে।

এখানের লোকেরা বলেন যে গরম পড়লেই, অথবা শীত যতখানি থাকার তার চেয়ে কমে গেলেই এখানে বৃষ্টি হয় এবং তাপমাত্রা কমে যায়। বন্দোবস্তটা ভাল। একেবারে প্রাকৃতিক এয়ার-কণ্ডিশানিং প্ল্যাণ্ট বসানো আছে।

গাছ তলায় বসে চিঠি লিখছি, এমন সময় মালু একটা চিঠি নিয়ে এল পোস্ট-অফিস থেকে। চিঠিটা ছুটির। তবে এত ভারী চিঠি এর আগে ও কখনও লেখেনি আমাকে।

আমি মনে মনে রোজই এ চিঠির প্রত্যাশা করছিলাম। ছুটি কি লিখবে আমি জানি না, তবে কিছু যে লিখবে তা জানতামই। এ চিঠিটা পাবার জন্যে মন অত্যন্ত আকুল হয়ে ছিল। ভীত হয়ে যে ছিল না, তাও বলব না।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললাম। খুব বড় চিঠি। চিঠিটা খুলেই পড়তে লাগলাম।

সুকুদা, রাঁচী। ২০/২

সুকুদা, এখানে ফিরেই আপনার চিঠি পেলাম। চিঠি পেয়ে বেশ যে চমকে গেছিলাম তা বলাই বাহুল্য। চমক অনেক কিছুতেই লাগে, তবে এই চিঠির চমক ম্যাকলাস্কিগঞ্জে আপনার সঙ্গে এক রাত ও একদিন কাটিয়ে আসার আনন্দর ঠিক পরই বড় ধাক্কা দিল।

আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন সেদিন সকালে। আমাদের প্রত্যেকেব বুকের মধ্যেই বোধহয় একটি করে পোড়ো বাড়ি থাকে। যখন মনের মধ্যে হাওয়া ওঠে, তখনই আমরা তার শিস শুনতে পাই। তার আগে নয়।

শুধু আপনার চিঠিটা হলেও না হয় হত। আপনার চিঠি পেয়ে সব ভাবনা ভেবে শেষ করার আগেই রমাদির কাছ থেকেও একটা চিঠি পেলাম। দুটো চিঠির বক্তব্য পাশাপাশি রেখে খুব চমকে উঠলাম।

আপনি যে এত ভাল অভিনেতা তা আমার জানা ছিলো না। আমি, এই একজন সামান্য সহায়-সম্বলহীন অথচ সরল মেয়ে জীবনের কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই অভিনয় করিনি কখনও কারো সঙ্গে।

যারা করে বলে বুঝতে পেরেছি তাদের মনে মনে ঘৃণা করে এসেছি। তাই আপনি একজন অভিনেতা জানলে (যত উঁচুদরের অভিনেতাই হন না কেন) আপনার সংগে আমার সম্পর্কটাকে এতদূর গড়াতে দিতাম না।

আমার সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে, আমি যার সংগে মিশি তার সংগে আগল খুলে মিশি। যাকে ভালোবাসি, তাকে কিছুমাত্র বাকি না রেখেই ভালোবাসি। কাউকে স্বীকার করতে আমার অনেক সময় লেগে যায়; কিন্তু কেউ স্বীকৃত হলে তাকে আর পর ভাবি না। তখন মনের মধ্যের ভালো লাগা, ভালোবাসা, বিশ্বাসের সমস্ত ফুলগুলির সমস্ত পাঁপড়ি খুলে তার দিকে ধাবিত হই।

এখন জানছি, সেটা ভুল; সেটা মস্ত ভুল। কখনও যে অন্য কাউকে নিজের মনের ঘর ছেড়ে, তার মনের ঘরে গিয়ে কিছু পেঁাছে দিতে নেই উপযাচকের মত, তা আজ আমার মত করে আর কেউই জানে না।

তেমন করে কিছু দিলে, যে তা পায়, সে বোধহয় সেই দানের মূল্য বোঝে না।

জানি না, উপমাটা ভাল হল কিনা।

আপনি লেখক মানুষ, হয়ত আমার উপমা দেখে হাসবেন। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে, বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই উচিত তার নিজের মনের ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা। বড়জোর, মনের বারান্দা অবধি আসা চলতে পারে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জীবনের মিশ্র অনুভূতিগুলো যাচাই করা চলতে পারে, বড়জোর অন্য কাউকে বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে কিছু দেওয়া বা তার কাছ থেকে নেওয়া চলতে পারে। কিন্তু কখনও বারান্দা থেকে নেমে নিজের মনের আব্রু, নিজের মনের আলপনার পরিধি ছেড়ে কিছু পাওয়ার বা দেওয়ার জন্যে পথে বেরুতে নেই।

মেয়েদের ত নয়ই। পথে-বেরুনো মেয়েদের যত সহজে স্বার্থপর পুরুষমানুষরা ছোট করতে পারে অবলীলায়, যত সহজে অপমান করতে পারে, তেমন অন্যদের পারে না কখনও।

এতদিন পরে, এতকথার পরে এতদিন এতরাত এত উদার উন্মুক্ত সহজীয়া সাহসী ভালোবাসার "চোখ গেল", "চোখ গেল" অভিনয়ের পর আপনার এই দ্বিধা ও সংকোচময় চিঠি আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণাটাকে অনেক বদলে দিয়েছে।

রূঢ় কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনাকে কখনও দূরের বলে জানিনি, জানতে চাইওনি; কিন্তু আজ আপনাকে দূরের-না-ভাবা মূর্খামি হবে।

আমার মনে হয়, আমরা নিজেরা যে কোনো মানুষই ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সম্পূর্ণ হই না। আমাদের নিজেদের, প্রত্যেকের বেলায়ই, আমরা কি, তার প্রমাণ পাই অন্য দশজন পুরুষ ও নারী আমাদের কি চোখে দেখে তার উপরে।

দশজন বলতে সমাজকে বলছি না। দশজন মানে, চেনা-পরিচিত ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর কয়েকজন। তাদের চোখে, তাদের ভাবনায়, তাদের মূল্যায়নে আমরা কি এবং কতখানি তার উপর আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণতা নির্ভর করে।

আমি যদি কখনও আপনার পরিপূরক হয়ে থাকি, যদি কখনও আমাতে আপনি সম্পূর্ণতা বোধ করে থাকেন তাহলে আপনি হয়ত ভুল করেছেন।

এখন থেকে আপনি আমাকে আপনার আয়নার একটি চুর-হওয়া টুকরো ছাড়া আর কিছু মনে করবেন না। আর এও বলছি যে, খালি পায়ে অনবধানে কখনও হাঁটবেন না যেন। পায়ে কাঁচ ফুটতে পারে।

রমাদি লিখেছেন যে আমার 'হ্যাংলামি' দেখে উনি বিস্মিত। আমার হ্যাংলামি ও সস্তা স্বভাবের জন্যেই নাকি আপনার এ অধঃপতন।

রমাদি যে আপনাকে একখানি ভালোবাসেন এ কথাটা আমার জানা ছিলো না। আপনিও যে রমাদিকে এতখানি ভালোবাসেন তাও আমার জানা ছিলো না।

আপনারা দুজনের কেউই বোধহয় একথাটা জানতেন না।

লোকমুখে শুনেছি যে, ভুলেও স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াকে বিশ্বাস করতে নেই। এই মেঘ, এই রোদ্দুর। পরে তারা আবার এক হয়ে যায়; যে মধ্যে থাকে সেই বেচারীই তখন দুজনেরই চোখের বিষ হয়ে দাঁড়ায়।

এখন মনে হচ্ছে যে, কথাটা সত্যি।

রমাদি আরো অনেক কিছু লিখেছেন। সেটা আমার উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ। সেটা আমি গায়ে মাখিনি। অন্য যা কিছু লিখেছেন তাও গায়ে মাখতাম না; যদি না আপনার চিঠির সুরে রমাদির সঙ্গে পুনর্মিলনের আভাস থাকত।

রমাদিকে অনেক কথা লিখতে পারতাম। কিন্তু তাঁর চিঠির জবাব আমি দেব না। আমি অনেক কিছু অবজ্ঞা করতে শিখেছি নিজের মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। তাই এই চিঠিকেও অবজ্ঞাই করব। তবে একটা কথা মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে। যে-মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা দেখে এতখানি ক্রুদ্ধ ও কান্ডজ্ঞানরহিত হন তাঁর নিজের স্বামীকে চোখে-চোখে রাখা তাঁর উচিত ছিল। উচিত ছিল, তাঁর মনকে ধীরে ধীরে নিজের কাছ থেকে দূরে না সরিয়ে দেওয়া।

বিবাহিত পুরুষদের দেখে আমার কেবলি মনে হয় তাঁদের স্ত্রীরা তাঁদের অনেক ব্যাপারেই ঠকান; বিশেষ করে সেক্স-এর ব্যাপারে। যত সেক্স-স্টার্ভড পুরুষ-মানুষ দেখি, অন্য কোনো দেশে বোধহয় এত নেই। সেক্স ছাড়াও অন্য নানা ব্যাপারেও বিয়ের পর প্রতিটি মেয়েই বোধহয় মনে করেন যে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে যাবেন কোথায়? অথচ একবারও তাঁদের মনে হয় না যে, জীবনের কোনো সম্পর্কই চিরদিনের নয়। সব সম্পর্কই বাঁচিয়ে রাখতে হলে, ফুলের গাছের মত তাতে জল দিতে হয়; যত্ন করতে হয়। স্বামীকে প্রতিনিয়ত নিজের মন এবং শরীরের নতুনত্বে অবশ করে রাখতে হয়।

একথাটা হয়ত স্বামীদের বেলাতেও প্রযোজ্য।

শুকিয়ে-যাওয়া আপনাকে এই বোকা পাঠিকা-মেয়েটি যখন নতুন সবুজ কুঁড়িতে ভরে দিয়েছে, ঠিক এমন সময় আপনার স্ত্রীর এই নোংরা আক্রমণ এবং স্বামী-সোহাগিনীর থার্ড-রেট যাত্রা আমার পক্ষে অসহ্য।

দোষটা কার বেশী এখন বুঝতে পারছি না। এই পুরো ব্যাপারটার জন্যে, আমার জীবনের এক বিশেষ ও বিশিষ্ট অংশকে এমনি করে হেলা-ফেলায় নষ্ট হয়ে যাবার জন্যে আপনাকেই দোষী করতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু দোষী আপনাদের কাউকেই করব না। সব দোষ আমার। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা জোড়ে সুখে-শান্তিতে চিরদিন ঘরকন্না করুন।

আপনাকে কিন্তু আমি একজন বুদ্ধিমান ও ধারালো মনের পুরুষমানুষ বলে ভেবেছিলাম। আমরা বোকা-সোকা পাঠিকারা প্রিয় লেখকদের সম্বন্ধে ওরকমই ধারণা করে নিই। এখন বুঝতে পারছি, আপনি রীতিমত ভোঁতা।

একটা কথা বলব আপনাকে, কিছু মনে করবেন না।

প্রেম-টেম আপনার মত লোকের জন্যে নয়। রাতে বেলডাঙার কুমড়োর মত গোলগাল ফর্সা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থেকে, পরদিন সকালে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা আপনাদের মানায় না।

প্রেম মানেই গভীরতা, জ্বালা, যন্ত্রণা! প্রেম মানেই সাহস।

প্রেম ব্যাপারটা, বিশেষ করে আমি প্রেম বলতে যা বুঝি, তা আপনার জন্যে নয়। আপনার প্র্যাকটিসও ছেড়ে দেওয়া উচিত। লেখাও ছেড়ে দিতে পারেন। আপনার বিশেষ-কেউ হবার প্রয়োজন বা যোগ্যতা নেই। দশটা-পাঁচটা অফিস করুন, তারপর সাজ-গোজ করে স্ত্রীকে নিয়ে পার্টিতে বা ক্লাবে বা হোটেলে যান। সবাই যা করে, তাই করুন। কারণ আপনি অন্য সবার থেকে আলাদা নন।

যদি আপনি বিশিষ্ট না হন, আপনার জীবনে যদি ধার না থাকে, সত্যিকারের চাওয়া-পাওয়া বোধ না থাকে, সত্যিকারের বিশ্বাস-অবিশ্বাস না থাকে, এবং সেই চাওয়া বা বিশ্বাসের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস না থাকে, তাহলে আপনার লেখা ঢাউস-ঢাউস উপন্যাসগুলো জোলো দুধের মত স্বাদগন্ধবর্ণহীন হতে বাধ্য। শুধু আমার মত কিছু বোকা পাঠিকা পড়ে বলেই, পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় বলেই. কিছু ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে-ওঠা-প্রকাশক বই চায় বলেই যদি আপনার লিখতে হয়, তাহলে লেখক হিসেবেও আপনার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে হবে।

সুকুদা, এত কথা বলছি, কারণ আমার বলার অধিকার আছে বলে। একদিন আপনাকে আমি ভালবাসতাম—কতখানি যে ভালোবাসতাম তা হয়ত কোনোদিন আপনি বুঝতে পারবেন; যদি আপনি মানুষ হন। ভালোবাসতাম বলেই এত কথা বলছি।

আপনাকে দেখতে পাই কি না-ই পাই, আপনার কাছে থাকি কি না-ই থাকি, আপনার লেখা যেন পড়তে পাই। আর লেখা যদি লেখার মত না-ই হয় সেই পাতা-ভরানো পকেট-ভরানো লেখা কখনও লিখবেন না।

আমাকে কথা দিতে হবে যে, লিখবেন না। লেখার মত কিছু থাকলে তবেই লিখবেন।

যেদিন লেখক হিসেবেও আপনাকে আর ভালো লাগবে না সেদিন জানবেন আপনার ছুটির মনে আপনি চিরদিনের মত মৃত। আমার এই অনুরোধ রাখবেন সুকুদা। আপনাকে ঘিরে আমার অনেক আশা ছিল, অনেক কল্পনা; অনেক সাধ—অন্ততঃ এই সাধটুকু আমার পূর্ণ করবেন আপনি।

ছোটবেলা থেকে আমি অনেকরকম মানসিক কষ্ট পেয়েছি। এ আমার কাছে কিছু নতুন নয়। তবে আপনাকে নিয়ে এত সব স্বপ্ন দেখে ফেলেছিলাম, নিজেকে এমন করে কল্পনার রঙীন আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম যে, এখন নিজেকে গুটিয়ে আনতে মনের বিভিন্ন খাঁজে-খোঁজে বড় ব্যথা লাগছে।

আপনি ত জানেন, আমি আপনার কাছে কিছুই দাবী করিনি শুধুমাত্র আপনার ভালোবাসা ছাড়া। সামাজিক মর্যাদা চাইনি, ঘর চাইনি, ছেলেমেয়ে চাইনি, আর্থিক ব্যাপারে আপনার উপর নির্ভর করতে চাইনি।

আমার এই চাওয়ার ব্যাপারে আমি খুবই আধুনিকা ছিলাম। কিন্তু দেখছি, আপনি সেই সেকেলেই রয়ে গেছেন।

আমি সত্যিই মনে মনে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম যে আমি আর আপনি দুজনে মিলে এই সমাজের মুখে থুথু দেব—সবাইকে দেখিয়ে দেব কি করে বাঁচার মত বাঁচতে হয়—লড়াই করে কি করে বাঁচতে হয়। নিজেদের স্বাধীনতা নিজেদের আনন্দকে নিষ্কণ্টক করতে গিয়ে আমরা কোনো লোক বা মতের সঙ্গে ইচ্ছাবিরুদ্ধ সন্ধি যে করিনি, তা আমরা সকলকে দেখিয়ে দেব ভেবেছিলাম।

সুকুদা, ভালোবাসা কাকে বলে আমি কখনও জানিনি। সম্পর্ক কথাটার মানে কি, তাও বুঝি আমি জানতাম না। আপনার লেখা পড়ে, আমার যৌবনের প্রথম দিনগুলোতে ভালোবাসা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। তারপর দেখা হল আপনার সঙ্গে। আমার প্রিয় লেখককে চোখের সামনে আমার কাছে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। পুরুষমানুষ সম্বন্ধে আমার অল্পবয়সী মনের মধ্যে যে একটা আদর্শ ধারণা ছিল সেই ধারণার সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখলাম; হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আমার ছোটবেলা থেকে মনে হত পুরুষমানুষের সবচেয়ে বড় সার্থকতা তার কাজের ক্ষেত্রে, ঘরের মধ্যে বা বিছানায় নয়। যে পুরুষমানষ দক্ষ, পরিশ্রমী, যে তার কাজের ক্ষেত্রে সম্মান পেয়েছে, সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষায়ই কৃতকার্য হয়েছে।

যে পুরুষমানুষ তার কাজের চেয়ে তার প্রেমিকাকে বা স্ত্রীকে বেশী ভালবাসে, সে যথার্থ পুরুষ কিনা সে বিষয়ে আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল।

কাজের ক্ষেত্রের পরেই তার ব্যক্তিগত জীবন। সে জীবনে প্রেম তার সবচেয়ে বড় উপাদান। যে-পুরুষের জীবনে কোনো মেয়ের সত্যিকারের ভালোবাসা নেই, সে স্ত্রীরই হোক বা প্রেমিকারই হোক, সে যতই দক্ষ হোক না কেন, সে একদিন না একদিন হেরে যেতে বাধ্য।

আমি অনেককে দেখে বুঝতে পারতাম যে আপনারা, পুরুষেরা মোটরগাড়ির ব্যাটারীর মত। আমরা আপনাদের প্রতিদিন পুনরুজ্জীবিত করি—যাতে পরদিন আপনারা আবার নতুন উদ্যমে, উৎসাহে ও উদ্দীপনায় কর্মক্ষেত্রে জয়মাল্য পান।

আপনাকে দেখে আমার কষ্ট হত, কান্না পেত। চোখের সামনে দেখতে পেতাম একটা খুব বেশী ভোল্টের ব্যাটারী একেবারে ফুরিয়ে গেছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে—যাকে পুনরুজ্জীবিত করার কেউই নেই।

আমি জানি না, আপনি আমার একথা মানবেন কিনা।

এতক্ষণ শুধু আপনার কথাই বললাম। এবার আমার কথা বলি।

একথা সত্যি যে আপনার উপর আমি ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলাম, স্বর্ণলতার মত আপনাকে আঁকড়ে ছিলাম মনে মনে আমার সব নরম কল্পনায়। কিন্তু যা হবার তা হয়েছে।

আমার জন্যে ভাববেন না।

কখনও কারো দয়া আমি চাইনি, করুণা চাইনি কারো—যা নিজের অধিকারে অর্জন না করা

যায়, এ জীবনে যা শুধু দয়া বা করুণা বা ভিক্ষার বা ছল বা চাতুরীর ধন, তা কখনও থাকে না। তা পেলেও তাকে ধরে রাখা যায় না। তাই আপনার কাছ থেকে কোনোরকম দয়া বা করুণা আমি চাই না।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনার হেমিংওয়ে বা আন্তোনিওনি বা আপনার অন্যান্য আত্মহত্যার উকিলরা বোধহয় তাঁদের সওয়ালে নির্ভুল। মনে হয় সত্যিই ত! জীবন যদি ভগবানের দান হয় তবে তা নিজের ইচ্ছেমত শেষ করার অধিকারটুকুও কেন ভগবানের দান বলে স্বীকৃত হবে না?

আপনার কাছ থেকে আসার পর লাইব্রেরী থেকে এনে এক এক করে রবীন্দ্রনাথের সব লেখা পড়তে আরম্ভ করেছি।

কালকেই 'হঠাৎ দেখা' বলে একটা কবিতা পড়ছিলাম।

পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হয়ে গেছে রেলগাড়ির কামরায়; হঠাৎ। প্রেমিকা তার শ্বশুর-বাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে উল্টোদিকের বার্থে বসে। কথা হলো না। কোনো কিছু বলা হলো না একে অন্যকে। গাড়ি থেকে নামবার আগে মেয়েটি তার প্রেমিকের কাছে উঠে এসে ফিসফিস করে শুধোলো।

'আমার গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?'

ছেলেটি বলল,

'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।' বলেই ভাবল, কি জানি, বানিয়ে বলল না ত?

সুকুদা, কবিতাটা খুব ভাল। কিন্তু জীবনে কি তা হয়? রাতের কোনো তারাই কি দিনের আলোর গভীরে থাকে? থাকেও যদি, তাহলে আমার লাভ কি যদি নাই-ই দেখতে পেলাম? নাই-ই চিনতে পেলাম? তাহলে থাকল কি না থাকল তাতে আমার কি আসে যায়?

অনেক টুকরো টুকরো কথা, অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। মনে পড়ে, যেদিন আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সেদিনের কথা। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে সেই শেষ রবিবারের কথা—যেদিন আপনার সঙ্গে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে সেই পোড়ো বাড়িটা দেখতে গেছিলাম।

হয়ত এসব কথা, এইসব হাসির টুকরো, আপনার আমার দিকে সেই আশ্চর্য চোখে চেয়ে থাকা এসবই মনে পড়বে। বার বার; যতদিন বাঁচব।

আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন ততই আপনার পক্ষে মঙ্গল।

আশা করব, আপনি সুখী হবেন নতুন করে রমাদিকে নিয়ে। আপনারা দুজনেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, ছুটি আর কখনও আপনাদের সুখ ও শান্তি বিঘ্নিত করবে না।

ইতি—আপনার ছুটি।

ছুটির চিঠি পড়া শেষ করে বসে বসে ভাবছিলাম।

গত কয়েক মাসে আমার মরুভূমির মত জীবন বেশ একটা আশ্চর্য নিটোল ওয়েসিসের মত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মনের মধ্যের অনেক রুক্ষ অশ্বারোহী বেদুইন ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, বুকফাটা তৃষ্ণায় অনেক হেঁটে, অনেক হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে তৃষ্ণার জলের দেখা পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম: এবারে শুধুই খেজুর পাতার ঝিরঝিরে হাওয়া, নীল জলে ছোট-ছোট সুখের ঢেউ আর ঠান্ডা ছায়ায় ভরা শান্তি; সুনিবিড় শান্তি।

অথচ আমার ওয়েসিসের কাছাকাছি পেঁাছেও আবার কোন্ মরীচিকা আমাকে ভুল পথে টেনে নিয়ে গেল?

রমা যখন ভাল হয়, যখন ও হয় ও হতে চায়, তখন ওর মত ভাল কেউই নয়। কিন্তু ও কখন ভাল হবে তা সম্পূর্ণ ওর মর্জির উপরে নির্ভর করে।

বাৎসরিক হিসাব করলে দেখা যাবে বারো মাসের বছরে ও হয়ত সারা বছরের মধ্যে একমাস ওর ভাল মুডে থাকে। বাকি এগারো মাসই অফ-মুডে। তাই যতবারই ওর ক্ষণিক ভালোতে চমৎকৃত হয়ে ওকে আমি মনে মনে অবলম্বন করতে আরম্ভ করি, ও পরক্ষণেই আবার ওর খারাপত্বে ফিরে যায়।

এর আগেও বহুবার আমি ওকে ক্ষমা করেছি, নিজেকে বুঝিয়েছি, বুঝিয়েছি যে ও খেয়ালী, সবাই একরকম হয় না; এবং এভাবে নিজেকে অনেক নীচু করে অনেক হার ও ত্যাগ স্বীকার করে ঘরের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি বহুবার, কিন্তু কখনও সেই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

আমার নিজেকে মারতে ইচ্ছে করছিল। ভাবছিলাম কেন ছুটিকে ঐ চিঠিটা লিখতে গেলাম। বেচারী কি ভাবল আমাকে? ভাবল, আমি বুঝি ওর সঙ্গে নেহাৎ একটু ভালোবাসা ভালোবাসা খেললাম। অন্য অনেক সস্তা পুরুষের মত।

অথচ আমি মনে মনে জানি যে, যে-রমা আমার সঙ্গে সন্ধি করে গেল সেই-রমাই বিনা-প্ররোচনায় কালই হয়ত যুদ্ধের আঁধি ওড়াবে। আমাকে অন্ধ করে দেবে আবার।

ছুটির হাত ধরে জঙ্গলের পথে পথে হেঁটে আমি নতুন করে জীবনের মানে, বেঁচে-থাকার মানে, সুখের মানে আবিষ্কার করার চেষ্টায় ঘুরছিলাম, এমন সময় রমা এসে সব গোলমাল করে দিল।

বারে বারে বুঝতে পারি, আমার মন বড় নরম। এই মন শক্ত করে কোনো কিছু কখনও আঁকড়ে ধরতে শেখেনি। যা-কিছু ধরেছে, আলতো করে দ্বিধাগ্রস্ততায়; তাই অন্যমনস্ক হলেই, অসাবধানী হলেই, হাতের মুঠি বারেবারে আলগা হয়ে গেছে—যা মুঠি ভরে ছিল, তা খোয়া গেছে। তেমন করে ঘৃণাভরে এ মন কিছু ছুঁড়ে ফেলতেও শেখেনি।

দোষ হয়ত রমারও নয়, ছুটিরও নয়; দোষ হয়ত আমার নিজের।

জীবনে সত্যি করে কি চেয়েছি, তাই-ই বোধহয় আমি এখনও বুঝে বা জেনে উঠতে পারিনি।

সুখের ও দুঃখের সমস্ত সংজ্ঞাগুলো কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে আছে এখনও।—ধোঁয়া হয়ে মনের দিগন্তরেখার উপর ভারী হয়ে আছে।

আশ্চর্য!

এত বছরেও কি চেয়েছি আর কি চাইনি তা তেমন করে বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে আর কবে বুঝব? মিস্টার বয়েলস্-এর মত আমরা সবাই-ই কি যমদূতের সঙ্গে দাবা খেলার দিনই হঠাৎ করে জানতে পাব যে এই দারুণ জীবনটা একেবারেই নষ্ট করে গেলাম? যাকে পাবার তাকে তেমন করে পেলাম না—যা চাইবার তা তেমন করে চাইলাম না। যদি তাই-ই হবে, তাহলে এই উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো প্রশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলার মানে কি? কাজ করার মানে কি? এই জীবনকে প্রলম্বিত করার জন্যে খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন কি? জীবন সম্বন্ধে এত হৈ-হট্টগোলের দরকার কি?

ভাবছিলাম, আমার মনে এই মুহূর্তে যে-ভাবনা ঝড় তুলেছে সে-ভাবনা কি সকলের মনেই ঝড় তোলে? না আমিই অন্যরকম? আমি একাই ব্যতিক্রম?

পেঁপে গাছে একটা দাঁড়কাক বসে লালটাগরা দেখিয়ে হাঁ করে খা—খুা খুা—খা করে ডাকছিল। একটা হলুদ প্রজাপতি উড়ছিল পেয়ারাগাছের ছায়ায়। দূর থেকে ব্রেইন-ফিভার পাখি ডাকছিল—ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। পি-উ কাঁহা, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা।

সেই মুহূর্তে, সেই অবশ মনে ও বিবশ শরীরে বসে হঠাৎ ছুটির জন্যে, ছুটির কথা মনে পড়ে, আমার সমস্ত ভিতরটা হু-হু করে উঠল গরমের দুপুরের হাওয়ার মত। আমার কেঁদে কেঁদে বলতে ইচ্ছা করল: ছুটি ও ছুটি, তোমাকে আমি ভালবাসি ছুটি; তোমাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। বলতে ইচ্ছে করল, আমি বড় নরম ছুটি, আমাকে তুমি জোর দাও, আমাকে হাত ধরে তুমি আমার সুখের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে নিয়ে চল। সে ঘরে আমি চিরদিন নিজেকে বন্দী করে রাখব। তোমার মুখোমুখী।

তুমি এমন কিছু কর, যাতে তোমাকে আর কখনও না হারাতে হয়। আমি তোমার উপর সব ব্যাপারে নির্ভর করব। আমার সুখ, আমার সম্পদ, আমার শান্তি সবকিছু ব্যাপারে; শুধু আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করো না ছুটি। আমার জীবনে তুমি ভগবানের আশীর্বাদী ফুলের মত এসেছিলে; তুমি সেই আশীর্বাদ হয়ে চিরদিন আমার কাছে থেকো।

আমাকে ভুল বুঝো না, আমাকে ছেড়ে যেও না।

তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই ছুটি, তোমার উপর আমি কতখানি নির্ভর করে আছি তুমি জানো না, তুমি জানো না তোমার উপর আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। আমি কিছু কখনও কেড়ে নিতে শিখিনি ছুটি, কাউকে আঘাত দিয়ে নিজের সুখ ছিনিয়ে নিতে শিখিনি। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, তুমি আমার সমস্ত দোষ সত্ত্বেও আমাকে এমন করে অভিমানে ত্যাগ কোরো না।

ছুটি, আমি তোমার কাছে আমার জীবন ভিক্ষা চাইছি।

আজকে এই মুহূর্তে তুমি আমার জীবনে না থাকলে আমার জীবনের কোনো মানে নে আমার কর্মক্ষেত্রে সার্থক হওয়ার কোনো তাগিদ নেই। কিছুই করার মত উৎসাহ আর আম অবশিষ্ট থাকবে না ছুটি।—তুমি যদি না থাকো।

আমি আমার একার জন্যে কখনও নিজেকে ভালো করতে বা সফল করতে চাইনি। কো পুরুষই হয়ত তা চায় না। কারণ কোনো পুরুষেরই তার নিজের জন্যে তেমন কিছুরই প্রয়োজ নেই। সহজেই সে নিজেকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে পারে।

আমরা যা-কিছু করি, যা-কিছু করতে চাই, তা অন্যের জন্যে, ভালোবাসার জনের জ ভালোবাসার সন্তানের জন্যে। তুমি যদি আমাকে এমন করে এই অবস্থায় বিসর্জন দাও, তাহ আমার চলা থেমে যাবে। কারণ, আমার নিজের কোনো গন্তব্য নেই।

তোমার কাছে আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি ছুটি—

একটু উষ্ণতা ভিক্ষা চাইছি।

আমার শরীর, আমার মন, আমার সমস্ত সত্তা বড়ই শীতার্ত। আমি সবসময়, বহুদিন হ সমস্ত সময় আমার ভিতরে একটা টোকা-খাওয়া টাকা-কেন্নোর মত কুঁকড়ে আছি। আমাকে তু তোমার সুন্দর সহজ ভালোবাসার উষ্ণতার আঙুলে আমার এই শীতার্ত কুঠুরী থেকে মু করো, আমাকে উদার উষ্ণতার রোদে তোমার হাত ধরে তোমার যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে চল

কোনো প্রশ্ন করব না আমি, কোনোরকম জেরা করব না তোমাকে। তুমি আমাকে এই শীতে দিন থেকে বাঁচাও। আমার লক্ষ্মী সোনা, আমার জন্মজন্মের ছুটি, তুমি আমাকে এমন ক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিও না অবহেলায়! তোমার কাছে আমি আমার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। ভিক্ষ চাইছি আমার জীবন।

কতক্ষণ ওখানে বসেছিলাম হুঁশ ছিলো না।

লালি এসে যখন চান করার কথা বলে গেল তখন খেয়াল হলো।

যে কথা ভাবা যায়, যে কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করা যায়, সেই সব নগ্ন বুভুক্ষ ভিখারীকে অন্য কারো সামনে আনা যায় না। আনতে লজ্জা করে। আত্মম্ভরিতায়, মিথ্যা হাস্যক গর্বে আটকায়। সব ভাবনা দেখানো গেলে, দেখাতে পারলে, দুঃখ পেত না কেউই এমন কে যেমন করে সকলেই পায়, সকলের প্রিয়জনের কাছে।

তক্ষুনি ছুটিকে চিঠি লিখতে বসলাম।

লিখলাম।

কঙ্কা
ম্যাকল্যাস্কিগঃ

ছুটি,

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম।

তোমার কাছে একটু সময় চেয়েছিলাম মাত্র। সেই সময়-চাওয়া চিঠি পড়ে এত কথা লিখে তুমি, তা বুঝতে পারিনি।

রুদ্রর চিঠির বক্তব্য বা শালীনতার দায়িত্ব আমার নয়। আমার ধারণা ছিল তুমি যথে বুদ্ধিমতী এবং লোকভয় বা সমালোচনার ভয় তোমার নেই। কেউ অন্যায় করে তোমাকে কিছ বললে, তা তুমি ন্যায়ত অবহেলা করতে পারো বলেই আমার বিশ্বাস ছিল।

তুমি যে-ধরনের চিঠি লিখেছ, তার পরে তোমাকে আমার কিছু বলার নেই।

তুমি যদি সম্পর্ক শেষ করে দিতে চাও, আমাকে আমার বক্তব্য জানানোর সুযোগ না দিয়ে তাহলে আমিই বা কেন তোমাকে আমার বক্তব্য জানাতে যাব?

তুমি যেমন কারো দয়া চাও না, আমিও তেমনই কারো দয়া চাই না। তাতে আমার যা হবে তা হবে। তুমি নিজে যা ভাল বোঝ তাইই করবে।

তোমার সঙ্গে শীগগীরই একবার দেখা করব। দু'চার দিনের মধ্যে। আশাকরি এই সময়টুকু তুমি আমাকে দেবে। তুমি যদি মনে করো যে, দু'চার দিন সময়ও তুমি আমাকে দিতে রাজী নও তাহলে তোমার যা মন চায় তাইই কোরো।

আমার না হয় তুমি ছাড়া কেউই নেই, কিন্তু তোমার ত এ্যাডমায়ারারের অভাব নেই। রাঁচীতেও রুদ্র-টুদ্র তোমার কত বন্ধুই ত আছে। তুমিও ভেবো না যে, আমি তোমার বক্তব্য বুঝতে পারি না

হঠাৎ যদি এতাদিনের সম্পর্ক নষ্ট করতে চাও তার জন্যে কোনো ছুতোর দরকার কি? তোমার লজ্জা কিসের? ছলের আশ্রয়ই বা নেওয়ার দরকার কি? তুমি ত পরাধীন নও?

তোমার একমাত্র দোষ এই যে, তুমি নিজেকে বড় বেশী বুদ্ধিমতী বলে মনে করো। নিজে যা ভাব তাইই ঠিক, অন্য কারো কথাই কথা নয় তোমার কাছে।

তুমি চাও, তোমাকে সকলে বুঝুক, ভুল-না-বুঝুক। কিন্তু তুমি নিজের সম্বন্ধে এতই কনফিডেন্ট যে, অন্যকে ভুল-বুঝতে তোমার একটুও সময় লাগে না।

রাঁচীতে আমি তোমাকে একলা চাই একদিন।

তোমার অগণিত বন্ধুবান্ধব এ্যাডমায়ারারেরা যেন সেদিন তোমার কাছে না থাকে। তুমি যেমন মনে করো আমার উপর তোমার দাবী আছে, আমাকে যা খুশী তাই বলার অধিকার আছে, আমিও তাই মনে করি। অন্ততঃ সেদিন সেই দাবী নিয়েই যাব তোমার কাছে। আমি তখন তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

ইতি—সুকুমার বোস।

মালু পেয়ারা গাছের তলা খুঁড়ছিল।

ওকে তক্ষুনি ডেকে বললাম, চিঠিটা দৌড়ে গিয়ে ডাকে দিয়ে আসতে। যাতে এগারটার গাড়ি ধরতে পারে।

চিঠি পোস্ট করতে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে, আমি চান করতে গেলাম।

বাথরুমে ঢুকেছি প্রায় দশ মিনিট, গায়ে জলও ঢেলেছি এমন সময় আমার মাথার মধ্যে একশ দাঁড়কাক একসঙ্গে ডেকে উঠল।

বিদ্যুৎচমকের মত আমার মনে পড়ল আমি একটু আগেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।

মনে হল, যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে বহুদিন লেগেছিল তা ভাঙ্গা হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগের একটি হঠকারী চিঠিতে।

আমার অনেক অনেক পাতাভরানো লেখা পড়ে একদিন যে আমার মনের কাছে এসেছিল, তাকে এক পাতার একটি চিঠিতে আমিই আবার মনের বহুদূরে পাঠিয়ে দিয়েছি। একজন ভালোবাসার জনের অভিমানকে আমি ভুল বুঝে, সেই নরম অভিমানের উত্তর দিয়েছি নোংরা কর্কশ রাগে।

যত তাড়াতাড়ি পারি বাথরুম থেকে বেরিয়ে ছাড়া-পায়জামা-পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েই পায়ে চটি গলিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম পাকদণ্ডী পথ দিয়ে পোস্ট-অফিসের দিকে।

অত জোরে আমার অসুখের পর আমি কখনও দৌড়ইনি। কিছুদূর যেতেই আমার বুকে হাঁফ ধরতে লাগল। অনেকখানি পথ। উঁচুনীচু পাহাড়ি পাকদণ্ডীতে।

পোস্ট-অফিস তখনও বেশ দূর।

কিন্তু সেই ঝর্ণাটার কাছেই দেখা হয়ে গেল মালুর সঙ্গে। সে ফিরছিল।

আমাকে দেখে অবাক হয়ে ও তাড়াতাড়ি বলল, চিঠি সে ফেলে দিয়েছে। শুধু তাইই নয়, চিঠির থলি নিয়ে ট্রেনও চলে গেছে।

মালু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল অবাক চোখে।

একটা কর্তব্যকর্ম সুষ্ঠুভাবে করে আসার পরও এমন ভর্ৎসনার চোখে আমি কেন ওর দিকে চেয়ে রইলাম ও বোধহয় বুঝতে পারল না।

মালু আর আমি দুজনে পাশাপাশি আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে আসতে লাগলাম।

যখন সেই মহুয়াতলার টাঁড়ে এসে পোঁছলাম, তখন আমার ছুটির কথা মনে হল বারেবারে।

প্রথম শীতে যখন এ মাঠ হলুদ হয়েছিল, ছুটি নরম সকালের রোদে আমার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে বলেছিল,

"সুখ নেইকো মনে,

নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।"......

ভাবছিলাম, ছুটি কি আর কখনও আমার সঙ্গে, আর কোনো শীতে এই মাঠ কিংবা অন্য কোনো হলুদ মাঠ পেরোবে? আমার হাতে হাত রেখে, ও কি আমার বুক ঘেঁষে পরম স্বস্তিতে, শান্ত ভালোলাগায় আর কোনোদিনও দাঁড়াবে?

আমার এই অভিশপ্ত জীবনে?

॥ তেইশ ॥

শীতটা কমে আসার সংগে সংগেই যাতে শীত আর কমতে না পারে সে জন্যেই বোধ গতরাতে আবার ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল।

রাতারাতি তাপমাত্রা অনেক নীচের অঙ্কে নেমে গেল। সকাল হয়ে যাবার পরও বৃষ্টি থা লক্ষণ দেখা গেল না। তবে ঝপঝপে নয়, ফিসফিসে বৃষ্টি।

হাওয়াটাই বৃষ্টি না বৃষ্টিটাই হাওয়া বোঝা যায় না। হাওয়ায় দাঁড়ালে গা ভিজে যায়।

চারদিকের বন পাহাড়ের গাছগাছালির ধুলো ধুয়ে গেছে। এই হিমেল সকালে চতুর্দি প্রকৃতি শান্ত; সিক্ত। গোলাপগুলোর খাঁজে খাঁজে যে লাল ধুলোর সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়েছিল সব মুছে গেছে। তারা এখন সকলেই নির্মলমুখে চেয়ে আছে।

আমি বসবার ঘরে বসে জুনিয়রদের চিঠি লিখলাম। এখানের তল্পি গোটানোর সময় হ এলো আমার। আবার কবে আসতে পারব জানি না। কোলকাতার কাজের ঘূর্ণী-ঝড়ে কে লোক একবার গিয়ে পেঁছলে তার আর মুক্তি নেই। ঝড়ে-ওড়া পাতার মত সে তখন ঘুরে মর কখনও-সখনও কোনো হঠাৎ অবকাশের বিকেলে মনে পড়বে এই দিনগুলোর কথা। কানে ভা কাঠ-কাটার আওয়াজ, টিয়ার গলার তীক্ষ্ম সবুজ স্বর, শেষ রাতের কোকিলের কুহু কু মাঝরাতের ডিজেল এঞ্জিনের বুকমোচড়ানো একটানা দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু যা মনে পড়বে, তা সবই মুহূর্তের জন্যে।

পরক্ষণেই ডুবে যেতে হবে ব্রিফের মধ্যে।

টু-টুয়েণ্টি-সিক্স-এর পিটিশান, রুলের আবেদন, এ্যাডজোর্নমেণ্ট মোশান, ডিভিসান বে সামনে সওয়ালের নোটিশ—লাল নীল পেন্সিল, নানারকম কলম, পাইপের তামাকের গন্ধ।

কোর্টের জজসাহেবদের জবরজং পোশাকের খসখসানিতে ডুবে যাবে টুনটুনি পাখির গল স্বর, উকীল ব্যারিস্টারের কালো জোব্বাতে মুছে যাবে হলুদ বসন্ত পাখির হলুদ গায়ের রং।

কয়েকদিন হল মনটা ভারী খারাপ লাগে।

আমি কি তবে এসকেপিসট্? আমি কি কেবলি কাজ থেকে কর্তব্য থেকে পালিয়ে যে চাই? কিন্তু মনে হয়, এসকেপিসট্ হয়ে দোষেরই বা কি? তাছাড়া কাজ আমি করবই বা কে কিসের জন্যে? কার জন্যে?

যার জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কারো কাছেই কিছু পাওনা নেই, নেই কোনো নগ্ন নিজ কোমল হাতের পরশ, নেই কোনো সহানুভূতির শান্ত ছোঁয়া; নেই কারো সুগন্ধি কো মাথা দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে ক্লান্তি অপনোদনের উপায়; তার কর্তব্য কার জন্যে?

কর্তব্য কি শুধু আজীবন অন্যদের জন্যেই? অন্য সকলের প্রতিই? নিজের প্রতি কি আম কোনো কর্তব্য নেই? অথবা ছিলো না? নিজেকে সুখী করা, ভরিয়ে তোলাও কি একটা কর্ত নয়?

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি শরৎবাবুর উপন্যাসের বালবিধবাদের চেয়েও অসহা তাঁদের চেয়েও বেশী নিরুপায় ও পরিণতিহীন কর্তব্যভাবে পীড়িত। আজকাল কেবলি মনে হ এই কঠোর শুকনো কর্তব্যের কোনো শেষ নেই, এর কোনো মানে নেই।

সব জানি, সব বুঝি; তবুও আমাকে ফিরে যেতেই হবে কোলকাতায়। কারণ অন্য দশজ পুরুষের মত আমিও একজন পুরুষমানুষ। যে-পুরুষ কাজের মধ্যে না থাকে তার মন নো হাওয়ায় ফেলে-রাখা লোহার মত মরচেতে ভরে যায়। পুরুষের মন যদি ইস্পাতের মত ঝকঝ তীক্ষ্ম না হয় তাহলে তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার কিছু পাওয় থাক বা নাই-ই থাক, তবু তার নিজের জন্যেই তাকে কাজ করতেই হয়, শুধুমাত্র নিজের কা নিজে ফুরিয়ে-যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই।

কাজ আছে বলেই হয়ত আমার মত অনেক হতভাগ্য পুরুষ বাইরের জগতের কৃতি মেডেল বুকে ঝুলিয়ে, হাহাকার-তোলা অন্তর্জগতে সস্তা যাদুকরের মত এখনও বেঁচে আ বেঁচে থাকে, এই নির্দয় সহানুভূতিহীন পৃথিবীতে। যেদিন আমাদের কাজ থাকবে না, কা করার ক্ষমতা থাকবে না, সেদিন আমাদের বাঁচাও আর হবে না। আমাদের মত লোকের বাঁচ সেদিন কোনো মানে থাকবে না।

চিঠিটা প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় দেখি প্যাট আসছে।
প্যাটের গায়ে সেই আর্মি ডিসপোজালের উইন্ড-চিটার।
প্যাট নিজের মনে কি একটা গান গুন্-গুন্ করতে করতে আসছে।
ওর একপা ফেলার তালে তালে গানটা গাইছে। মার্চিং সং-এর মত করে।
কাছে আসতেই প্যাট বলল, গুড মর্নিং মিস্টার বোস্।
আমি লেখার কাগজ মুড়ে রেখে বললাম, ভেরী গুড মর্নিং প্যাট।
প্যাট ভিতরে ঢুকে ওর ক্রাচটা ঠেস দিয়ে রেখে একপায়ে এক লাফে এসে চেয়ারে বসল।
প্যাটকে শুধোলাম, আজ খুব খুশী মনে হচ্ছে তোমাকে প্যাট, কি ব্যাপার?
প্যাট হাসল। একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তাই বুঝি? আমাকে খুশী খুশী দেখাচ্ছে বুঝি?
তারপরই বলল, আমি ত সবসময়ই খুশী। আমাকে অখুশী দেখেছ কখনও?
বললাম, না। তবুও আজ যেন বিশেষ খুশী বলে মনে হচ্ছে।
প্যাট হাসল। ওর ঝকঝকে দাঁতে হাসিটা ঝিলিক মেরে গেল।
বলল, কফি খাওয়াও। ঠান্ডাটা আবার জোর পড়েছে। ঠান্ডা না থাকলে আমার আবার ভালও লাগে না। ঠান্ডা না থাকলে রোদের দাম, আগুনের দাম এসব কিছুই বুঝি জানা যেত না। তাই না?
আমি লালিকে কফি বানাতে বলে এলাম।
ফিরে শুধোলাম, কি গান গাইছিলে তুমি? গানটার সুরটা ভারী ভাল ত?
প্যাট হাসল। বলল, তুমি শুনতে পেয়েছ?
এ জায়গাটার এই একটা অসুবিধা। জায়গাটা এত নির্জন যে, হানি-মুনিং কাপল্স-এর ফিস্ফিসানিও সারা বাড়ি থেকে শোনা যায়।
আমি বললাম, গাও না গানটা আবার। কোথায় শিখলে গানটা?
প্যাট বলল, এই গানের একটা ইতিহাস আছে। বলছি শোনো।
এখানে মিস্টার টিক্সারা বলে এক ভদ্রলোক থাকতেন। একলা।
ভদ্রলোকের ডাইভোর্স হয়ে গেছিল। অল্প বয়সে। তারপর বিয়ে করার মত ভুল আর দ্বিতীয় বার করবেন না বলে মনস্থ করেছিলেন। খুব ড্রিঙ্ক করতেন ভদ্রলোক। প্রতি সন্ধ্যায়ই কোথাও না কোথাও বসে যেতেন।
যেদিন কোথাও, মানে কোনো বাড়িতে বসতেন না, সেদিন জঙ্গলের মধ্যে কোনো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়তেন একা। তারপর বোতল শেষ করে এই গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যেতেন।
উনিও একলা ছিলেন। আমি ত চিরদিনই একলা। তাই আমার বাড়িতে ওঁর ছিল অবারিত দ্বার। মনে আছে, একদিন রাত একটার সময় জঙ্গল থেকে ফিরে এসে দরজায় লাথি মেরে আমাকে তুললেন। বললেন, সন্ধ্যে রাতে ঘুমাও কি করতে? তোমার জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার মত কেউ ত নেই। তবে? আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখবে তেমন কেউও নেই তোমার—তাহলে আর ঘুমের জন্যে এত কাতর কেন?
বলে হিপ-পকেট থেকে একটা রামের বোতল বের করে বললেন, বোসো, দুজনে মিলে এটাকে শেষ করে যারা এই মুহূর্তে আরামের ঘরে কাউকে জড়িয়ে শুয়ে আছে তাদের সেই মিথ্যা-সুখের মুখে থুথু দিয়ে এসো আমরা দুজনে স্বাধীনতার আনন্দে বুঁদ হয়ে যাই।
একটু থেমে প্যাট বলল, জানো, এখানের সমস্ত লোকই একদিন ওই গানটা গাইতে পারতেন। কারণ, এমন কোনো বাড়ি ছিলো না এখানে, যে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে নিশুতি রাতে একা একা গভীর অন্ধকারে এই গান গাইতে গাইতে মিস্টার টিক্সারা কোনো না কোনোদিন ঘরে ফিরতেন।
ভারী ভাল লোক ছিলেন ভদ্রলোক। নির্বিরোধী দিল-খোলা সহজ সরল মানুষ। হাঃ হাঃ করে জমাট হাসি হাসতেন।
আমি বললাম, ছিলেন মানে? এখন নেই?
—না। উনি মারা গেছেন। তাঁকে কে বা কারা যেন খুন করে যায় তাঁর বাড়িতেই। ফায়ার প্লেসের পাশে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় পরদিন। টাঙ্গী দিয়ে মাথাটা দু ফাঁক করে কাটা ছিল।

প্যাট একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, উনি নেই; কিন্তু গানটা রয়ে গেছে। ভীষণ ভাবে রয়ে গেছে। এ গানটা আমার খুব ফেভারিট্ গান।

আমি বললাম, শোনাও না প্যাট। গাও আর একবার গানটা?

প্যাট একবার গলা খাঁকরে নিয়ে নীচু গলায় সুরু করল।

প্যাট গাইছিল—

"Show me the way to go home
I'm tired and I want to go to bed.
I had a little drink about an hour ago
Which has gone right to my head."

পুরনো-দিনের অপেরার গানের সুরের মত সুরটা।

ওই অবধি গেয়েই প্যাট থেমে গেল।

আমি বললাম, কি হল? আর নেই? থামলে কেন?

প্যাট আবার অন্তরা ধরল।

No matter where I roam.
May be on land, on sea or on foam.
You will always hear me singing that song;
Show me the way to go home......

গানটা শেষ করে প্যাট আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, গানটার সুরটা কিন্তু বড় করুণ। যদিও কথার মধ্যে একথা বলা নেই। তবুও আমাদের রবিঠাকুরের একটা গানের সংগে এ গানের মূলগত একটা মিল আছে।

প্যাট বলল, কি গান?

বললাম, পংকজ মল্লিকের রেকর্ড আছে। ডিরেকটর প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি 'মুক্তিতে' এই গানটা ছিল।

ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনের শেষে শেষ খেয়ায়।
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়...।

প্যাটকে গানটা অনুবাদ করে শোনালাম।

প্যাট বলল, কথার ত কোনো মিলই নেই।

—কথায় নেই, কিন্তু ভাবের আছে। সুরের গভীরতায় আছে। দুটো গানই একজন হারিয়ে-যাওয়া মানুষের আকুতিতে ভরা।

Show me the way to go home.

এর মধ্যে গায়কের ঘর বলতে যে কিছু নেই এ কথাটাই সুরের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, যেমন ফুটেছে, রবিঠাকুরের সেই গানে। যে ঘরেও নেই এবং পারেও নেই, যে নদী পেরুবার জন্যে বেরিয়েছিলো, অথচ যাকে চিরদিন মাঝ-দরিয়াতেই থেকে যেতে হল, যাকে কেউ নরম হাতে হাতছানি দিয়ে কোনো ঘরেই ডাকল না, সে আসন্ন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাবার ভয়ে যেন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে।

প্যাট বলল, তোমার টেগোরের গানের কি এইই ব্যাখ্যা?

আমি বললাম, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা এর কি ব্যাখ্যা করবেন জানি না, ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি...সন্ধ্যের সময় যার মুখেই যতবারই এ গান শুনেছি, ততবারই আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে পাখির গলার ক্ষীণ স্বরে বারবার এই কথাই মনে হয়েছে। আজ বহুদিন পর তোমার এই গান শুনে ঐ গানের কথা মনে পড়ে গেল।

লালি কফি নিয়ে এসেছিল।

প্যাটকে কফি ঢেলে দিলাম আমি, ইতিমধ্যে লালি প্যাটের জন্যে একটা ওমলেট বানিয়ে, টোস্টও করে আনল।

প্যাট যত্ন করে ওগুলো খেল। এত সকালে ও নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট করে বেরোয়নি।

কফি শেষ করে প্যাট সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

এমন সময় গেট খুলে একজন স্থানীয় লোককে দৌড়ে আসতে দেখলাম।

লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম না।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে প্যাট ওদিকে তাকাল।

তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দেওয়ালের দিকে গিয়ে ওর ক্রাচ দুটো বগলে লাগাল।

লোকটা হাঁপাচ্ছিল। লোকটা কোনোরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বয়েল সাব, গিদ্ধড়, গিদ্ধড়। বয়েল সাব।

আমিও ওর কথার মানে বুঝলাম না।

প্যাট বোধহয় মানে বুঝবার জন্যে দাঁড়াতেও চাইল না।

প্যাট প্রায় উড়ে গিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে বাইরে পড়ল। আমাকে বলল, কাম মিস্টার বোস, লেটস রান ফর মিস্টার বয়েলস্ প্লেস।

প্যাট ওর ক্রাচে ভর করে যে অতজোড়ে দৌড়তে পারে, তা না দেখলে আমার বিশ্বাস হতো না।

প্যাট যেন পুরোনো দিনের রণ-পা-চড়া কোনো ডাকাত হয়ে গেল। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যেতে রীতিমত হাঁপিয়ে পড়ছিলাম।

পথে কোনো কথা হলো না।

প্যাটের দ্রুতগতি ক্রাচের সুষম ও এক লয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আমার কানে আসছিল না।

কতক্ষণ আমরা দৌড়ে গেলাম আমাদের হুঁশ ছিল না। দূর থেকে মিস্টার বয়েলস্-এর বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটা বৃষ্টি-ভেজা মেঘলা আবহাওয়ায় উথাল-পাথাল হাওয়ার মধ্যে কোনো স্থবির অনড় প্রাচীন বিশ্বাসেব মত দাঁড়িয়েছিল।

একটা বাঁক ঘুরে বাড়িটার সামনে আসতেই আমরা দুজনে থমকে দাঁড়ালাম।

প্যাট স্বগতোক্তি করল, মাই গড! হোয়াট ইজ ইট?

প্যাট আবার বলল, আই ডোণ্ট নো, হোয়াই হ্যাড ইট টু হ্যাপেন—এণ্ড হ্যাপেন টু দিস পুওর ওল্ড ম্যান।

আমাদের চোখকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

মিস্টার বয়েলস্ বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গায় পা সামনে টান-টান করে সেই ইজিচেয়ারটিতে বসে ছিলেন।

তাঁর পায়ের কাছে লুসি। আর ওদের চারধারে, মাটিতে, গাছের ডালে ডালে প্রায় পঞ্চাশটা শকুন।

আমরা এগিয়ে যেতেই শকুনগুলো ওদের কুৎসিত ভারী শরীর নিয়ে অশ্ভুতভাবে পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যেতে লাগল।

আর একটু এগিয়েই প্যাট রাগে পাগলের মত হয়ে গেল। পাগল হয়ে গিয়ে, ওর ডান হাতের ক্রাচটা বর্শার মত করে ছুঁড়ে দিল সেদিকে।

যে-কটা শকুন তখনও মিস্টার বয়েলসের কাছে ছিল, তারা সরে গেল। কিন্তু উড়ে দূরে গেল না। কাছাকাছি গাছে তাদের লোমহীন কদর্য লম্বা লম্বা গলাগুলো বের করে বসে রইল।

আমরা আর একটু এগিয়ে গিয়েই আঁৎকে উঠলাম।

মিস্টার বয়েলস-এর চোখ দুটো ওরা খুবলে খেয়ে নিয়েছে।

যেখানে এক সময় চোখ ছিল, সেখানে এখন দুটি কালো কোটর দেখা যাচ্ছে। শুধু চোখেই নয়, শকুনগুলো কুরে কুরে মুখ, গলা, বুক এসবও খেয়েছে। সবসুদ্ধ মিলে এমন একটা বীভৎস দৃশ্য হয়েছে যে তা চোখে দেখা যায় না। সহ্য করা যায় না। পরিচিত-জনের এই পরিণতি বিশ্বাস করা যায় না।

প্যাট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এক ক্রাচে ভর করেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে বলে চলল, ও গড, ও গড, আই কাণ্ট বিলিভ ইট।

সঙ্গের দেহাতী লোকটিই সেদিন আমাদের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়েছিল। সেও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর লোকটির হুঁশ এল।

সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে সেখান থেকে একটা বাঁশের লাঠি এনে শকুনগুলোকে ধাওয়া করতে

লাগল।

যেগুলো নীচের ডালে ছিল, সেগুলোকে ধপ্ ধপ্ করে দু-চার ঘা লাগিয়েও দিল।

তখন শকুনগুলো এক এক করে গাছের ডাল ছেড়ে অনিচ্ছায় ভারী দুর্গন্ধ পাখা মে উড়ে যেতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা থেকে ঐ মৃত্যুর দূতগুলো উধাও হয়ে গেল।

লুসিও শুয়ে ছিল। কিন্তু অর্ধমৃত হয়ে ছিল। সে তার প্রভুকে এই শ্মশানের চরগুলো হাত থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে সে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তই হয়েছিল। তা প্রভুর মৃতদেহকে তবুও সে অক্ষত রাখতে পারে নি।

আমরা অনুমান করলাম, তিন কি চারদিন আগে সকালে অথবা বিকেলে রোদ পোয়াবা জন্যে মিস্টার বয়েলস্ এইখানে এসে বসেছিলেন। তারপর হার্টফেল করেই হোক অথবা যেভাবে হোক কোনো স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তখনও তাঁর কোলের উপর বাইবেলটা খোলা পড়ে ছিল।

যমদূত তাঁর কালো আলখাল্লা পরে এসে তাঁকে কোথায় কোন দেশে ডাক দিয়ে নিয়ে গেছিব জানি না, কিন্তু যমদূত যে এসেছিল তা নিশ্চিত!

সেই থেকে তাঁর মৃতদেহ ওখানে ওরকম ভাবেই পড়ে ছিল। এদিকে তিন চারিদিনের মধে কারোরই এবং আমাদেরও আসার অবকাশ হয়নি।

শকুনগুলো নিশ্চয়ই আজ সকাল থেকেই তাদের ভোজ শুরু করেছিল, নইলে এতক্ষণে ওঁ হাড় কখানা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকার কথা ছিল না।

প্যাট লুসিকে তুলে নিয়ে ঘরে গেল। আমাকে বলল, পাহারায় থাকতে।

আমি মিস্টার বয়েলস-এর নিস্তব্ধ বীভৎস মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্যাট চিঠি লিখে যাদের যাদের জানাবার সবাইকে এই খবর জানিয়ে সেই লোকটির হাতে সব চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

তারপর একটা চাদর এনে ঢেকে দিল মিস্টার বয়েলস-এর নিপীড়িত শরীরটিকে।

মৃত্যু ত সকলেরই হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরও এমন বীভৎসতার মধ্যে এই শীতার্ত একাক বৃদ্ধকে কেন ভগবান টেনে আনলেন জানি না।

একটা পাথরে বসে ও একটা সিগারেট ধরাল। ও কোনো কথা বলছিল না। ওকে এমন বিচলিত আমি কখনই দেখিনি।

সিগারেটটা শেষ করে ও আবার মিস্টার বয়েলস-এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর কোল থেকে বাইবেলটা তুলে আনল।

বাইবেলটা রক্তে ও কিমার মত মাংসের কুচিতে ভরে গেছিল।

প্যাট বাইবেলটা খুলল। ঝড়বৃষ্টিতে বাইবেলের পাতাগুলো নেতিয়ে গেছিল। কোনো অক্ষর আর পড়া যাচ্ছিল না।

যার এই জগত থেকে ছুটি হয়ে গেছে তার নিজের কোনো কাজে লাগে না এসব বই। শুধু বাইবেল কেন, যে কোনো ধর্মপুস্তকই দুয়োর পেরোবার পর আর কাজে লাগে না। চিরদিনের মত ছুটি হয়ে যাবার পর এসবই নিছক অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই প্যাট আবার বাইবেলটাকে নিয়ে গিয়ে মিস্টার বয়েলসের কোলে রেখে এল।

দেখতে দেখতে অনেক লোক এসে জমা হলেন। কাছে এসেই প্রত্যেকে মাথার টুপী খুলে ফেললেন।

একজন পাদ্রী সাহেবও এলেন।

তারপর কেউ কোনো কথা না বলে মিস্টার বয়েলসকে চেয়ারসুদ্ধ ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

এত লোক দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, মিস্টার বয়েলস-এর জন্যে এত লোকের দয়া ও সহানুভূতি ছিল। নাকি এঁদের মধ্যে অনেকেই ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করবেন বলেই এসেছিলেন, যদিও জীবিতাবস্থায় ওঁর জীবন্ত ব্যথাতুর আত্মাকে কোনোরকম সহানুভূতি দেখাবার প্রয়োজন মনে করেননি এঁরা কেউই?

সমবেত শোকার্তদের মধ্যে কে-কে এই বৃদ্ধকে বেশী ভালোবাসতেন, বেশী করে জানতেন,

তা দেখানোর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

চুপ করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম।

লুসিকে ইতিমধ্যেই চেয়ারে বসিয়ে অন্যত্র পাঠানো হল তাকে চিকিৎসা করাবার জন্যে।

দেখতে দেখতে মিস্টার বয়েলস-এর মৃতদেহকে চান করানো হল সুগন্ধি ঢেলে বাথটবে। তারপর আলমারী খুলে তার সবচেয়ে ভাল যে শতছিন্ন স্যুটখানি ছিল তা পরানো হলো।

কারা যেন শিমুলকাঠে তৈরী একটা মস্ত কফিন এনে হাজির করলেন। অন্যরা ওঁর বাড়ির পাশে একটা তেঁতুলগাছের তলায় কবর খুঁড়তে শুরু করলেন।

এখানের যে-কোন সাহেব মরলে তাকে কবরখানাতেই নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়, কিন্তু উনি নাকি জীবদ্দশাতেই ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে তাঁর নিজের বাড়ির কম্পাউণ্ডেই সমাধিস্থ হবার অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন। তাই তাঁর জন্যে এই ব্যবস্থা।

কফিনের মধ্যে তুলো দিয়ে চতুর্দিক মোড়া হল। তারপর ধীরে ধীরে মিস্টার বয়েলস-এর শরীরকে বয়ে এনে কফিনের মধ্যে শোয়ানো হল।

সমস্ত কিছু ঘটতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশী সময় লাগল না।

তারপর কফিনটাকে কালো কাপড়ে মুড়ে উপরে সাদা তুলো দিয়ে একটি ক্রস আঁকা হল।

কফিনটিকে বইবার জন্যে অনেকে এগিয়ে গেলেন।

প্যাট এক কোণায় আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল।

ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও জীবিত মিস্টার বয়েলসের বড় আপনার লোক ছিল। এই মৃত লোকটির সঙ্গে ওর যেন কোনো যোগ নেই। মৃত লোকটির প্রতি দরদ দেখাতে আজ এত লোক উপস্থিত যে, সেখানে যেন ও বেমানান।

কফিনটা ওরা তুলতে যাবে এমন সময় প্যাট পাদ্রীসাহেবকে গিয়ে কি যেন বলল।

পাদ্রীসাহেব আমাকে ডাকলেন, ডেকে কফিনটি অন্যদের সঙ্গে বইবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

আমি ক্রীশ্চান নই, মিস্টার বয়েলস-এর আপনজন নই, ওঁর নিজের গোষ্ঠীর লোক নই; তবুও আমাকে এই সম্মান দেওয়াতে রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়লাম।

মনে পড়ে গেল মিস্টার বয়েলস্ প্রথম দিন আলাপ হবার পর বলেছিলেন, প্লিজ ডু মী আ ফেভার। লেণ্ড প্যাট আ হ্যাণ্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই ব্যেরীয়াল।

সকলের সঙ্গে আমিও কফিন কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালাম।

পাদ্রী সাহেব আগে আগে বাইবেল থেকে অনেক কিছু পড়তে পড়তে হাঁটছিলেন। পড়ছিলেন, শান্ত গম্ভীর গলায়। পাদ্রীসাহেবের হাঁটা-চলা, হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে উনিও যেন মিস্টার বয়েলস-এর মত অন্য কোনো জগতের লোক।

কবরের সামনে পেঁছে কফিনটি নামিয়ে রেখে আবার অনেক কিছু পড়লেন পাদ্রীসাহেব। আমার কানে কিছুই যাচ্ছিল না! কতগুলো শর্তহীন শীতার্ত শব্দ বাতাসের মত কানে এসে লাগছিল।

উনি আমাদের বললেন, এবার কফিন নামানো হোক।

কিছুক্ষণ পর দড়ি বেঁধে কফিন নামিয়ে দেওয়া হল গহ্বরে।

তারপর আর সকলের সঙ্গে আমিও মুঠো মুঠো লতাপাতাফুল সমেত ভেজা মাটি কবরের উপর চাপা দিতে লাগলাম।

প্যাট এবারও এদিকে এলো না। যে পাথরে বসেছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে উঠল শুধু।

পাদ্রীসাহেব তখন পড়ছিলেন,

"Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts, shut not thy merciful ears to our prayer, but spare us, Lord most holy, O God most mighty, O holy and merciful saviour, thou most worthy Judge eternal suffer us not, at our last hour, for any pains of death to fall from thee".

তারপর মাটি পড়ে পড়ে যখন কবর প্রায় ভরে এল, পাদ্রীসাহেব বললেন,

"We therefore commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust in sure and eternal hope of resurrection to eternal life..."

আমার খুব ইচ্ছে করছিল জানতে যে, মাটির নীচে শুয়ে-থাকা মিস্টার বয়েলস্ কি
কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন!

শুনতে পেলে কি তাঁর মুখ অবিশ্বাসে কুঁচকে যেত না?

দেখতে দেখতে সব শেষ হয়ে গেল। একে একে সকলেই চলে গেলেন সেই চত্বর ছেড়ে।

সব শেষে গেলেন পাদ্রীসাহেব।

প্রথম দিন প্যাটের সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিলাম। এখানের সকলেই এ বাড়িকে মিস্টার বয়েল
প্লেস বলে জানত।

কিন্তু আজ থেকে অনেকদিন পরে, আমি যেমন ছুটির হাত ধরে সেই পোড়োবাড়ি 'নাইটিংগেে
বেড়াতে গেছিলাম, তেমনি কোনো বেড়াতে-আসা যুবক তার যুবতী বান্ধবীর হাত ধরে বেড়া
একদিন এখানে আসবে।

তখন এ বাড়ির দরজা জানালা কিছুই থাকবে না, অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠবে দেওয়া
দেওয়ালে। সাপের খোলস পড়ে থাকবে এদিকে ওদিকে।

সেদিনও এমনি করে হাওয়া বইবে ঝুঁকে-পড়া গাছগাছালির পাতায় পাতায়। অথবা হয়
আকাশে ঝকঝক করবে রোদ্দুর। হয়ত সেই যুবক ও যুবতী হাতে হাত রেখে মিস্টার বয়েলসে
কবরের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তারা কখনও জানবে না যে, এখানে একজন মানুষ এক
উষ্ণতার জন্যে কি অপরিসীম কাঙ্গালপনা নিয়ে একদিন বেঁচে ছিল—যে এই শীতল মাটির নী
ঘুমিয়ে আছে।

ওদের অল্পবয়সী উত্তাল ভালোবাসায়, এই নির্জন শান্ত পরিত্যক্ত পরিবেশে ওরা হয়
একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে, উষ্ণতায় ভরে দেবে দুজন দুজনকে; অথচ একবারও ভ
হবে না, ওরা কখনও জানবে না যে, সমস্ত উষ্ণতাই একদিন নিভে যায়। সমস্ত উষ্ণতার স্বা
উষ্ণতর সাধ, সব নিঃশেষে নিয়তির এই অমোঘ পরিণতির দিকে গড়িয়ে যায়ই যায়।

ওরা তা যদি জানত, তবে এক মুহূর্তের জন্যেও একে অন্যকে ছাড়তো না, অন্যের হা
থেকে কখনও তবে হাত সরাতো না।

ওরা জানবে না, আমি জানি না, আমরা কেউই জানি না যে, যতক্ষণ যৌবন থাকে, জীব
ভোগ করার সহজ সরল অধিকার থাকে, ততক্ষণ জীবনকে আমার ছুটির বুকের মত সবসম
মুঠিভরে ধরে রাখতে হয়—এক পরম সুগন্ধি উষ্ণতায়।

তাকে এক মুহূর্তও বুঝি হাতছাড়া করতে নেই।

প্যাট সেই পাথরের উপরই বসে ছিল, পাশে ক্রাচটা হেলান দিয়ে রেখে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে প্যাট উঠে দাঁড়াল।

তারপর আস্তে আস্তে কবরটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, প্যাটের দু চোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

প্যাট দাঁত দিয়ে ওর নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

তারপর বিড়বিড় করে বলল, অল রাইট ওল্ড ম্যান। অল দা বেস্ট টু ড্যু। হ্যাভ আ নাই
টাইম ইন দা ওয়ার্ল্ড ড্যু হ্যাভ জাস্ট রীচড্।

বলেই, প্যাট ঘুরে দাঁড়াল।

তারপরই কোনো কথা না বলে ফিরে চলল।

মিস্টার বয়েলস-এর বাড়ির বাইরের দরজাটা হাঁ করে খোলা পড়ে রইল। হাওয়াটা বাঁশ
বাজিয়ে, টালির ছাদে, শূন্য বাড়িময় খেলে বেড়াতে লাগল।

একটু দূরে গিয়ে প্যাট আমার দিকে ফিরে বলল, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমারও আপনজ
যদি কেউ থাকত, বেশ হত তাহলে।

আমি বললাম, আপনজন মানে?

প্যাট হাসল।

ওর গালে চোখের জলের দাগ তখনও শুকোয়নি। সেই কান্নাভরা মুখে ওর চোখ দুটে
হেসে উঠল।

ও বলল, আই মীন, আ বিচ অফ আই ওওন। এক্সক্লুসিভলি মাই ওওন।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

প্যাট আবার পুরোনো প্যাট হয়ে বলল, ওয়েল, হেল্ উইথ ইট। আই অ্যাম ভেরী হ্যাপী এজ আই এ্যাম।

দেখলাম, এ কথা বলতে বলতে প্যাটের চোখ দুটো আবার জলে ভরে গেল।

আমি ওকে লজ্জার, দুঃখের একাকীত্বর গ্লানির হাতে এমন ভাবে কষ্ট পেতে দেখতে চাইনি। ওকে দেখে আমার এতদিন মনে হয়েছিল এমন পুরুষও থাকে, আছে, যার কোনো নারীর নরম হাতের উষ্ণতার জন্যে কাঙালপনা না করলেও চলে।

আজ নিশ্চিন্তভাবে জানলাম, আমি যা ভাবতাম, তা ঠিক নয়। কোনো পুরুষই বোধহয় কোনো ভালোবাসার নারীর সঙ্গ ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। সে-সব পুরুষ, মানুষ হিসেবে কখনই সম্পূর্ণ নয়।

আমি প্যাটের মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে, প্যাটের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম।

॥ চল্লিশ ॥

সকালবেলার হাঁটা সেরে ফিরে আসছিলাম একা একা।

আজকাল হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি সবই এমন অক্লেশে করি যে মনেও পড়ে না কখনও আমি ভীষণ অসুস্থ হয়েছিলাম। সেইসব অন্ধকার দিনগুলোর কথা এখন মনে করতেও খারাপ লাগে।

পথের বাঁদিকে পাহাড়ের খোলে একটা দোলা মত দু-তিনটি ন্যাড়া পাথরের টিলা। সবচেয়ে নীচু জায়গায় এখনও জল আছে। জল, বসন্ত অবধি থাকবে। তারপর গ্রীষ্মের দাবদাহে সে জল শুকিয়ে যাবে।

জলের পাশে একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ। তাতে একদল হরিয়াল ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। তাদের হলদেটে সবুজ গায়ে সকালের রোদ এসে পড়েছিল।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার লাবুর কথা মনে পড়ে গেল। লাবু বলেছিল হরিয়ালেরা কখনও মাটিতে পা দেয় না। যদি বা কখনও ওরা জল খেতেও নামে তবে মুখে করে পাতা নিয়ে নামে, পাতার উপর পা ফেলে জলের পাশে দাঁড়িয়ে জলে ঠোঁট ডুবিয়ে জল খায়।

আমি তন্ময় হয়ে হরিয়ালদের দেখছি, এমন সময় চামার দিক থেকে একটা গাড়ি আসার আওয়াজ শোনা গেল।

দেখতে দেখতে আওয়াজটা একেবারে কাছে এসে গেল।

দেখলাম একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটা যখন আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে এমন সময় হঠাৎ সশব্দে ব্রেক কষে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটি মেয়েলি হাত জানালা দিয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তারপর কে যেন বলল, এ্যাই। উঠে এসো।

কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখি রমা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি? কোনো খবর না দিয়ে?

রমা বলল, খবর দিয়েই আসা উচিত ছিল। আমার স্বামীর ঘরে আমার স্লিপ দিয়েই ঢোকা উচিত। সে ঘরে কে কখন থাকে ঠিক থাকে না ত।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রমা বলল, পথের মধ্যে সীন কোরো না, উঠে এসো। বলেই এক ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে দিল।

আমি উঠে বসলাম রমার পাশে।

রমার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ-বসা, রাতে বোধহয় ঘুমোয়নি।

আমি বললাম, রাঁচী এক্সপ্রেসে এলে বুঝি?

রমা বলল, না। এসেছি কালকে। প্লেনে এসেছিলাম।

সে কি? প্লেনে এসেছিলে, তাহলে ত কাল দুপুরেই পৌঁছে গেছিলে রাঁচী। কাল সারাদিন কোথায় ছিলে?

বি. এন. আর হোটেলে ছিলাম।

কেন? রাঁচীতেই যদি এলে তবে এখানে এলে না কেন? বললাম আমি।

রমা উত্তরে কোনো কথা বললো না। আমার দিকে খুব রহস্যময় চোখে তাকালো। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার সতীনের বাড়ি গেছিলাম। বলেই হাসল।

কেন জানি না, রমা যদিও আমার স্ত্রী, তবুও ওর হাসিটা ডাইনীর হাসির মত মনে হল।

আমি মুখ তুলে বললাম, মানে?

রমা বলল, মানে, তুমি জানো না?

আমি বললাম, না, জানি না।

তবে আর কি! জানবে, বিস্তারিতই জানবে। সবই জানবে।

দেখতে দেখতে বাড়ি এসে গেল।

রমা ট্যাকসিওয়ালাকে বিদায় দিল না। টাকা দিয়ে বলল, স্টেশনে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে বিকেল তিনটের পর যেন আবার আসে—ওয়েটিং চার্জ যা লাগবে তা ও দিয়ে দেবে। বিকেলের রাঁচী-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরিয়ে দিয়ে তবে ট্যাকসিওয়ালার ডিউটি শেষ।

আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার কিছু বলার ছিলো না।

রমা পেয়ারাতলার বেতের চেয়ারে গিয়ে বসে, পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা ছোট স্যুটকেসটার উপর মেক-আপ বাক্সটা রাখল। তারপর বলল, তোমার চেলা-চামুণ্ডাদের ডাক। একটু চা খাব।

আমি মালিকে ডেকে আমাদের চা ও ব্রেকফাস্ট দিতে বললাম।

রমা আমাকে আর কিছু না বলে মেক-আপ বাক্সটা হাতে করে নিয়ে উঠে ভিতরে চলে গেল।

রমা নিশ্চয়ই বাথরুমে গেছিল।

আমি জানি, বাথরুমে গিয়েই রমার চোখ পড়বে একটা নাইটির উপর। নাইটিটা ছুটির। গতবার তাড়াতাড়িতে যাবার সময় ছুটি ফেলে গেছিল। সেই অবধি ওটা ওখানেই আছে। আমি অনেক দিন ভেবেছি যে ওটাকে কাচিয়ে তুলে রাখব। প্রতিদিন চান করার সময় ওটাকে দেখে সেকথা ভেবেছি, কিন্তু বাথরুম থেকে বেরিয়েই আবার ভুলে গেছি।

বসে বসে রমার আসার কারণটা অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম। গতবার যাবার সময় ওকে যে মুডে দেখেছিলাম, তা থেকে এখনকার মুড সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাছাড়া ও গতকাল রাঁচীতেই যে থেকে গেল কেন তাও বুঝে উঠতে পারছি না।

আপাতত আমার কতগুলো অনুমান নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই।

ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে, সামান্য প্রসাধন করে বাইরে এল। ও বিয়ের এক বছর পর থেকে শুধু আমার জন্যে বা নিজের জন্যে কখনও প্রসাধন করেনি; করেছে, বাইরে যাবার সময়, (আমার সঙ্গ ছাড়া, কারণ আমার সঙ্গে গত বহু বছর সে কোথাওই যায়নি) এবং বিশেষ কারো সঙ্গে (যেমন সীতেশ) দেখা করতে যাবার সময়। তাই ওকে প্রসাধিত অবস্থায় কেমন দেখতে লাগে তা প্রায় ভুলেই গেছিলাম আমি।

রমা এসে বসল।

মালি এসে রমার স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে গেল।

রমা ওকে একবার অপাঙ্গে দেখল।

তারপর নিজের মনেই যেন বলল, নাইটিটা বেশ ভালো। ছুটিকে পরলে নিশ্চয়ই ভারী সুন্দর দেখায়, না?

আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

রমা বলল, 'বেহায়া' কথাটার মানে জানো তুমি?

আমি তেমনই চুপ করে থাকলাম।

রমা আবার বলল, তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমাকে আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে কি বলেছিলাম গতবারে, বলেছিলাম, ওদের মধ্যে গভীরতা বলে কোনো বস্তু নেই। এই ওরা গলা ধরে ঝোলে, অমনি ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে দৌড় দেয়। মনে আছে?

তারপর বলল, বোধহয় আমার কথাটা তুমি তখন মনোযোগ দিয়ে শোনোনি। এখন যা বলছি শোনো। তোমার প্রেমিকা, তোমার একনিষ্ঠ পাঠিকা ছুটি, বিয়ে করেছে। এবং এখন হানি-মুন করছে। অবশ্য রাঁচীতেই। রাঁচীতেই আছে। রাঁচী ছেড়ে দূরে চলে গেলে তোমার মুখে এমন করে চুনকালি ত মাখানো যেত না। তোমাকে দুঃখও দেওয়া যেত না।

আমি কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। কিন্তু রমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেলাম যে রমা

মিথ্যা কথা বলছে।

কারণে অকারণে মিথ্যা কথাটা ও এমন ভাবে বলা রপ্ত করেছে যে, যে-কোনো মিথ্যা কথাই আর ওর মুখে আটকায় না। ওর চোখ কাঁপে না এতটুকু।

আমি তবুও কোনো কথা বললাম না।

রমা এবার বলল, কি? চুপ করে আছ যে? কিছু একটা বল? তুমি ভেবেছিলে, গাছেরটাও খাবে তলারটাও কুড়োবে, তাই না? তুমি মেয়েদের নিয়ে মনগড়া গল্প লিখে নিজেকে খুব একটা কেউকেটা মনে কর। মেয়েদের তুমি কিছুই জানো না, চেনো না।

এমন কোনো বোকা ও নিঃস্বার্থ মেয়ে এ পৃথিবীতে নেই, যে-শুধু ভালোবাসার জন্যেই ভালোবাসা দিতে পারে। জীবনে নেই; তোমার থার্ডরেট লেখকের গল্প-উপন্যাসে হয়ত থাকতে পারে। মেয়েরা ঘর চায়, স্বামীর পরিচয় চায়, সন্তান চায়, তার দেওয়া হোক কি নাই-ই হোক, স্বামীর সামাজিক শীলমোহরটা চায়। এ নইলে কোনো মেয়ে বাঁচতে পারে না। পোশাকী ভালোবাসা কখোনোই টেকে না যে তা দেখলে ত!

একটু চুপ করে থেকে রমা বলল, ফুঃ, ভালোবাসা! কী ভালোবাসাই না দেখালো। ভালোবাসা না ছাই। ভালোবাসার ঢং করে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার তাল! যেই দেখল উদ্দেশ্য সাধন হয়েছে অমনি স্বমূর্তি ধারণ করল। লেখকের অনুপ্রেরণা হবার সাধ তার শেষ হয়ে গেল। ঘর গোছাতে লাগল স্বামীর সঙ্গে, বিছানা পাততে লাগল ফুল ছিটিয়ে। ছিঃ ছিঃ! আমি ত ভাবতেই পারি না যে কোনো মেয়ে এমন ঢং করতে পারে; এতখানি ঢং। এতখানি ইর্নাসিনসিয়র কোনো মানুষ হয়?

আমি হঠাৎ রমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রমার দু চোখ জলে ভিজে গেছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কি করা উচিত আমার তা বুঝতে পারলাম না। ভেবে পেলাম না, এ চোখের জল কার জন্যে? রমাব নিজের জন্যে? ছুটির জন্যে? নাকি আমারই জন্যে? আমার জন্যে কেন রমা কাঁদতে যাবে? আমি বললাম, তুমি কাঁদছ কেন?

রমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার সঙ্গে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছ, কিন্তু সেটা আমাদের ব্যাপার। ঝগড়া হোক, ভাব হোক, ভুল বোঝাবুঝি হোক, সেটা আমাদের একান্ত ব্যাপার। কিন্তু বাইরের একটা সস্তা বাজে, একরত্তি মেয়ের কাছে তুমি এমন ভাবে অপমানিত হবে এটা আমার ভাবলেও কষ্ট হয়। তোমার মান-সম্মান বলে কি কিছুই নেই? কি তুমি দেখেছিলে ওর মধ্যে? কি খাইয়ে বশ করেছিল ও তোমায় কোন মন্ত্রে? যার জন্যে তুমি এমনভাবে নিজের সব কিছু নিজেকে, তার সঙ্গে আমাকেও মাটিব সঙ্গে মিশিয়ে দিলে? কেন তুমি এরকম করলে?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আমার ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছিল যে, ছুটি আমাকে চিরদিনের মত বা আমি ছুটিকে চিরদিনের মত পেয়েছি একথা জানলেও কি রমা খুশী হত? তার পরও কি এমন করেই এত কথা বলত না?

আমি কিছু বলার আগে রমা নিজেই বলল, এর চেয়ে ও তোমার সঙ্গে থাকলেও আমি খুশী হতাম। আমি জানতাম, জীবনে একবার অন্তত তুমি জিতলে, নিজের বুদ্ধিমত কাজ করে। তোমাকে বোকা পেয়ে, তোমার টাকার জন্যে, তোমার দেওয়া সুযোগের জন্যে তোমার কাছে মুখোশ পরে এ পর্যন্ত কত বন্ধু, কত প্রেমিকা, মত আত্মীয়ই ত এল, তুমি তাদের সকলের কাছেই বোকার মত ঠকে গেলে। ও-ও যদি তোমাকে না ঠকাত তবে বুঝতাম ও সৎ। ওর মধ্যের মানুষটা খাঁটি। আসলে ও-ও আর একজন সস্তা ফোর-টোয়েন্টি।

আমি কুয়োতলার দিকে চেয়ে বসেছিলাম। আমার মাথায় কোনো কথা ঢুকছিল না।

লালি এসে একসময়ে চা ও ব্রেকফাস্ট নামিয়ে রেখে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

রমাকে ওরকমভাবে কাঁদতে দেখে ও নিজেই খুব অপ্রতিভ বোধ করছিল।

রমা বলল, কি? তুমি এখনও কোনো কথা বলছ না যে? তোমার কি বলার কিছুই নেই?

আমি বললাম, না।

ছুটি বিয়ে করেছে শুনেও না?

আমি বললাম, আমি ও কথা বিশ্বাস করি না। ছুটি কেমন মেয়ে তা আমি জানি; ছুটিকে আমি চিনি। তুমি ছোট করলেই ত সে আর ছোট হয়ে গেল না। আমি কেবলি ভাবছি, একজনের

নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে যাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসব চিরদিন, তাকে ছোট করে তোমার কি লাভ? তুমি কি পাবে তাতে?

রমা একটা টোস্টে কামড় দিয়েছিল। টোস্টটা ঠোঁট থেকে বের করে বলল, তোমার শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ভেবেছিলাম আমার দেওয়া শিক্ষাই তোমাকে শুধরাতে পারবে, এখন দেখতে পাচ্ছি তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আরো অনেক দুঃখ।

আমি চুপ করেই থাকলুম।

কেন জানি না, আমার বার বার রুণের মুখটা মনে পড়তে লাগল। ওর চোখ দুটো বড় করুণ। কাটা কাটা নাক-চিবুক। কিন্তু বড় দুর্বল ও। গালের ও কপালের শিরাগুলো গোনা যায়। ও সবসময় ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো দিয়ে আমাদের মধ্যে এই বৈষম্য বোঝবার চেষ্টা করে, নিজে হেসে আমাদের হাসাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেচারী রুণ! ওর এই ছেলেবেলার জীবনে শান্তি কাকে বলে ও জানল না। বাবা-মার আদর কাকে বলে, বাবা-মার সুস্থ স্বাভাবিক সহজ সম্পর্ক কাকে বলে তা ও জানল না।

মাঝে মাঝে রুণের জন্যে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়। অন্ততঃ ওর মুখ চেয়েও রমার ও আমার মানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল দুজনে দুজনকে। কিন্তু এখন যে বড় দেরী হয়ে গেছে।

রমার খাওয়া শেষ হলে আমি বললাম, এবার বলো, তুমি কেন এসেছ এমনভাবে হঠাৎ? কিছু কি চাই তোমার?

রমা চীৎকার করে উঠল। বলল, না! কিছুই চাই না। তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না। রমার চীৎকার শুনে কুয়োতলায় জল নেওয়া মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে এদিকে দেখতে লাগল।

আমি বললাম, একদিন আমি পুরোপুরি তোমারই ছিলাম, একমাত্র তোমারই। কিন্তু সেই আমি আর আজকের আমি এক লোক নই। তোমাকে সুখী করার—কোনো-ভাবেই সুখী করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। যা ভেঙে গেছে, তা ভেঙে গেছে। তোমাকে এর আগেও বলেছি, তুমি আমার বাড়িতে থাকতে পারো, যতদিন থাকবে বাইরের সব লোকের কাছে তুমি আমার স্ত্রীর মর্যাদা পাবে, কিন্তু আমার কাছে কিছু চেও না। তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই আমার। বাকি নেই কিছু।

ছুঁটি ত তোমাকে অপমান করেছে, তোমার মুখে থুথু দিয়েছে। এখন তোমার যাবার জায়গা কোথায় দেখি। শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া তোমার কে থাকে তা আমি দেখব।

আমি হাসলাম, বললাম, কোনো জায়গাই যদি আমার না থাকে, নাইই বা থাকল। তাছাড়া শেষ বলতে তুমি কি বোঝ জানি না। আমার ত মনে হয় শেষটা একটা ইচ্ছাধীন ব্যাপার। যে কোনো মুহূর্তই শেষের মুহূর্ত হতে পারে।

রমা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। ঠাট্টার হাসি হাসল। তারপর বলল: এ কথাটা এর আগেও বহুবার বলেছো। বলল, তুমি কি আত্মহত্যার কথা বলছ? যে-লোক মুখে বলে আত্মহত্যা করব, সে কখনও তা করতে পারে না। আত্মহত্যা করতে সাহস লাগে। তুমি কোনোদিনও মারতে পারবে না নিজেকে নিজে হাতে।

আমি চুপ করে থাকলাম অনেকক্ষণ। তারপর বললাম, ঝগড়া ত অনেকদিন, অনেকবার করেছ রমা, এখন ঝগড়া থাক। তোমার যা বলার তা কি শান্তভাবে বলতে পারো না? তুমি কি মনে করতে পারো না আমরা দুজন বাইরের লোক, বাইরের লোকের মত ভদ্রব্যবহারও কি একে অন্যের সঙ্গে একেবারেই করা যায় না? আমি ত তোমার কাছে আর কিছুই চাইনি—শুধু শান্তি ছাড়া। তবু তুমি এখান অবধি ধেয়ে এসে সেই শান্তি বিঘ্নিত করে কি আনন্দ পাও?

পাই, পাই; অনেক আনন্দ পাই। সে কথা কি বুঝবে? তোমার মত যেসব স্বার্থপর লোক শুধু নিজেদেরই ভালবাসে, নিজের প্রফেশান, নিজের লেখা, নিজের যশ ছাড়া জীবনে আর কিছু ভাবার যাদের সময় হয় না, তাদের এমনি করে তিলে তিলেই মরতে হয়। এটুকু জেনো, মরবার সময়ও তোমাকে আমি শান্তিতে মরতে দেব না। শকুনের মত তোমাকে আমি কুরে কুরে খাব। তবে আমার সাধ মিটবে।

কেন জানি না, রমার এই কথায় সেদিন সকালে দেখা মিস্টার বয়েলসের ঠাণ্ডা রক্তাক্ত মৃতদেহটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

রমা বলল, তোমাকে বলতে এসেছি যে, সীতেশকে আমি বিয়ে করছি। সীতেশকে যা ভাবতাম,

সীতেশ তা নয়। ও বড়লোকের ছেলে হতে পারে, কিন্তু বড়লোকের লালু ছেলে নয়। ও নিজের জীবনে অনেক কিছু করেছে। ওর নিজের একটা পজিটিভ দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে জীবনের প্রতি। আমি ওর পাশে থাকলে আরো অনেক কিছু করবে বলেই আমার বিশ্বাস। ও আমাকে কাঙালের মত চায়; আমাকে ভালবাসে। সীতেশ মানুষটা বড় ভাল। ও জীবনে একটু কাজ, একটু অবকাশ, ঘরের মধ্যে শান্তি এইসব চায়। ও তোমার মত মিথ্যে নামের পিছনে—দশজনের মধ্যে একজন হবার মিথ্যে মোহে নিজের এবং অন্য কারু জীবন নষ্ট করে না।

আমি জানি, কোনো পার্টিতে, সমাজে, তোমার স্ত্রী বলে পরিচিত হতে আমার যতখানি ভাল লাগত, ওর স্ত্রী বলে পরিচিত হতে ততখানি ভাল লাগবে না। কিন্তু সমাজ ত জীবনের একটা অংশমাত্র। জীবনের বেশীটাই ত ঘরের মধ্যে। সেই ঘরের মধ্যে সবসময় আমাকে দেখাশোনা করবে সীতেশ। ও কথা দিয়েছে, রোজ সকাল থেকে লাঞ্চ অবধি কাজ করবে—তারপরই বাড়ি চলে আসবে। আমরা দুজনে অনেক মজা করব। রেসে যাব, সুইম্ করব, কখনো বোলিং করব, ছবি দেখব, ক্লাবে যাব। জীবনের যতটুকু বাকী আছে সেটুকুকে এখনও স্যালভেজ করার সময় আছে। যতটুকু পারি, তা করব সাধ মিটিয়ে।

আমি শুনছিলাম। বললাম, তোমাকে এখনও বুঝতে পারছি না। ঠিক করে বলো। ব্যাপারটা ত ছেলেখেলার নয়।

রমা বলল, আমি জানি যে, নয়, ছেলেখেলা করতে আমি এখানে আসিনি। আমি দুটো সিদ্ধান্তই খোলা রেখেছি এখনও। চয়েসটা তোমার। সীতেশকে আমার কাল কথা দিতে হবে। কথা পেয়েই ও ওর স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা আনবে। এরপর আর আমার ফেরার পথ থাকবে না। আমাকে দোষ দিও না।

আমি বললাম, সীতেশের স্ত্রীর কি হবে?

রমা বিরক্ত গলায় বলল, সে ভাবনা তোমার নয়। সে ছুটিরই মত। টাকা পেলেই খুশী। তাছাড়া চেহারা দেখে যেমন গোবেচারা মনে হয় ওকে, ও তেমন নয়। ও একটি ভিজে বেড়াল। ওর এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের আগে থাকতেই এ্যাফেয়ার ছিল। ছেলেটি ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স-এর পাইলট। ওরা দুজনে ডাইভোর্স পেলেই বিয়ে করবে। সীতেশের অনেক দুঃখ। বেচারীকে দেখবার, ওর জন্যে ফীল করবার কেউ নেই। এর জন্যে সত্যিই আমার খারাপ লাগে।

আমি বললাম, তাহলে তুমি যা ঠিক করেছ, তাইই করো। তাছাড়া কালকের মধ্যে আমার কিছু বলা সম্ভব নয় তোমাকে।

কেন সম্ভব নয়? ছুটির সঙ্গে পরামর্শ করবে? পরামর্শ করার কি আছে? সে ত এখন জমিয়ে হানিমুন করছে, তোমার প্রেমিকা ছুটি। ফুঃ, প্রেমিকা।

আমি বললাম, বারে বারে একটা মিথ্যা কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেই সেটা সত্যি হয়ে যায় না। যতবারই তুমি ওকে ছোট করার চেষ্টা করছ, ততবার তুমি নিজেকেই ছোট করছ। এতে তোমার কি লাভ? যার সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে সে ধারণা নিজে থেকে না ভাঙলে অন্য কেউ এমন করে ভাঙাতে পারে না। কেন তুমি নিজেকে এত ছোট করছ? তোমাকে ত বলেইছি, নিজে চোখে দেখলেও আমি বিশ্বাস করি না যে ছুটি আমাকে কিছুমাত্র না জানিয়ে বিয়ে করতে পারে। আমি মরে গেলেও একথা বিশ্বাস করব না।

তাহলে তোমার উত্তর কি? রমা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধোল।

আমার কোনো উত্তর নেই। তুমি আমাকে নিয়ে সুখী হওনি। দোষটা আমার। আমার মত করে আমি চেষ্টা করেছিলাম; সুখী করতে পারিনি তোমাকে। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি আমার মতই থাকতে চাই। আমি সীতেশের মত কি আর-কারো মতই হতে চাই না। তুমি যাকে সুখ বলে জেনেছো, পুরুষমানুষের সংজ্ঞাকে যদি তুমি সীতেশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছ বলে মনে করো তবে তুমি সুখী হও। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

ওরকম করে বললে হবে না। ন্যাকা-ন্যাকা কাব্য-করা কথা আমি শুনতে চাই না। পরিষ্কার করে বলো।

পরিষ্কার করেই বলছি। তুমি ডাইভোর্স চাও বা নাই চাও, আমি কোনোরকম বাধা দেব না। একদিন তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, সারা জীবন তোমাকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চেয়েছিলাম, তা যখন হলো না, তখন তোমার প্রতি আমার যা-কিছু করণীয় থাকে তা শুধু কর্তব্য। সে সবই

আমি করব! যতদিন বিয়ে না কর। যদি চাও, বিয়ের পরও তোমার দেখাশোনা করব।

ঈস্‌স্‌। কত্ত সাহস। ফোঁস করে উঠল রমা। বলল, সীতেশ কি তোমার কাছে চাঁদা নিয়ে আমাকে রাখবে? মুখ সামলে কথা বল। তাকে, তার মত সরল, উঁচু মনের মানুষকে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই। নিজের স্ত্রীকে দেখতে পারে না তেমন পুরুষমানুষ সীতেশ নয়।

অপমান করিনি। আমি আমার কথা বললাম। আমি কি করতে রাজী আছি তাইই বললাম।

রমা বলল, আর রুণ? রুণের কি হবে? সে কি ছুটি দিদিমণির কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি হবে?

কেন? রুণকে তুমি নেবে না?

রমা বলল, না। নেব না। যার রক্তে তোমার রক্ত তাকে আমার দরকার নেই। তোমার কোনো-রকম স্মৃতি আমি রাখতে চাই না। ছেলে তোমারই রাখতে হবে।

তাকে কোথায় রাখবে? আমাকে শুধোলো রমা।

বললাম, সে যখন আমার দায়িত্ব, আমিই বুঝব। তুমি বৃথা এ নিয়ে উত্তেজিত হয়ো না।

রমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বলল, তাহলে সব চুকেবুকে গেল? ঠিক ত?

আমি চুপ করে রইলাম।

রমা দাঁড়িয়েই রইল। তারপর বলল, তোমার এখানে আজ দুপুরে লাঞ্চ করে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি তাহলে যাই।

রমার মুখে হাসির আভাস দেখা গেল। ঠাট্টার হাসি। ঠাট্টা, না ঠাট্টার সঙ্গে অন্য কিছুও ছিল বুঝলাম না।

আমি বললাম, তা কেন? স্বামী-স্ত্রী নাই-ই বা রইলাম, পরিচিত বন্ধুর মত সম্পর্কটা রাখতে ত বাধা নেই কোনো। অপরিচিত লোকও ত অন্যের বাড়ি থাকে, খায়; ব্যাপারটাকে না হয় সেরকমভাবেই দেখলে। সম্পর্ক শেষ হলেও ত সুন্দরভাবে শেষ হতে পারে?

তারপর আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কারো মুখেই কোনো কথা ছিলো না। শুধু মনের মধ্যে উথাল-পাথাল করছিল স্মৃতির হাওয়া।

'ডাইভোর্স' কথাটা দুজনেই বহুদিন শুনেছি, দুজনেই নানাভাবে ভেবেছি, কিন্তু বিয়ের এতদিন পরে যখন অন্য একজনকে জীবনের একটা অবিসংবাদী অংশ বলে মেনে নিয়েছি, তাকে কোন এক মুহূর্তে হঠাৎ অস্বীকার করতে কেমন লাগে তা আমাদের কারোরই জানা ছিল না।

ব্যাপারটার গভীর অভাবনীয়তায়, ব্যাপারটার এক অবিশ্বাস্য দুঃখময়তায় রমা এবং আমি, আমরা দুজনেই বোবা হয়ে গেছিলাম।

রমা বসে পেয়ারাতলা ছাড়িয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রমা বলল, ভাবতেই কেমন লাগছে।

অথচ তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি সব সময়ই ভাবছি গত কয়েক বছর ধরে। ভেবেছিলাম, ছেড়ে গেলে আমার সব কিছু ফিরে পাব।

এই মুহূর্তে ছাড়াছাড়ি হয়েও গেল। কিন্তু তেমন একটা আনন্দ কিছু লাগছে না ত! তোমার কি লাগছে?

আমি হাসলাম, বললাম, লোকে বড় লটারী জিতলে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে না। আনন্দেরও একটা শক্ আছে। পরে বোধহয় বুঝতে পারবে তুমি।

কি জানি, জানি না। রমা বলল। তারপর বলল, ক'দিন থেকেই অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে। তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিনের কথা। জাহাজের দিনগুলোর কথা। তুমি বলেছিলে, প্লেনে না ফিরে জাহাজে ফিরতে—জাহাজেই মজা হবে। বেশ লাগে ভাবলে, না? বলে, রমা হাসল।

পরক্ষণেই বলল, ভাবতে পারছি না, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। মানে, ভাবাটা কঠিন।

আমি বললাম, সম্পর্কটা ত' আজকে শেষ হয়নি রমা। হয়েছে বহু বছর আগেই। তার পরের এই ক'টা বছর শুধুই সংস্কারের বছর, অভ্যাসের বছর! তবুও আমি কিন্তু কোনোদিনই ভাবতে পারিনি যে, আমাদের সম্পর্কটা সত্যিই এমন পর্যায়ে কখনও আসবে যে, ছাড়াছাড়ি হবে

আমাদের।

তারপর বললাম, কিন্তু তুমি বড় কষ্ট পেতে। তোমার জন্যে সত্যিই আমি কিছু করিনি, তুমি যা চেয়েছ, যেমন করে চেয়েছ। কেন পারিনি সে কথা অবান্তর। তুমি বলেছ এই না করতে পারাটা স্বার্থপরতা। জানি না; হয়তো তাই। সে যাই হোক, এটা ঠিক যে, তুমি যে ভাবে বাঁচছিলে তাকে বাঁচা বলে না।

রমা বলল, আর তুমি ?

বললাম, আমার কথা থাক। তারপর বললাম, জানো রমা, বিয়ের এই সম্পর্কটা ত কোনো তেজারতি কারবারের মুচলেকা নয় যে যা কবুল করেছি, তা না দিতে পারলেই জেল হবে। আইন-আদালতে যাবার অনেক আগেই এ-সম্পর্কের ফয়সালা হয়ে যায়। দুজনের মনে যে মুহূর্তে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, সেই মুহূর্তেই সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তারপর যা বাকি ছিল, তা শুধু নিজেদের নিজেরা ঠকানো। অভিনয়, সংস্কার, লোকভয়, এসব ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহসের অভাব। তুমি যা করেছ, ঠিকই করেছ। তোমার নিশ্চয়ই অধিকার আছে তোমার নিজের ইচ্ছেমত জীবনে বাঁচবার।

একটু হেসে বললাম, আমার কিন্তু খুব হালকা লাগছে নিজেকে, তোমাকে যে সুখী করতে পারিনি আমার সর্বস্ব দিয়েও; এ কথাটাই সবসময় আমাকে বড় পীড়ন করত। এই পীড়নটাকে ছাপিয়ে নিজের সুখের দিকে কখনও তাকাবার অবকাশ হয়নি। তুমি কেন আমার জন্যে তোমার জীবন নষ্ট করবে ? তা কখনই করা উচিত নয়। অন্য কারো জন্যে তুমি নিজেকে কেন ফাঁকি দেবে ?

রমা বলল, আর তুমি ?

আমি হাসলাম। বললাম, আমার ব্যক্তিগত জীবনটা এত ছোট যে, সেটা একটা বড় সমস্যা নয়। তুমি জানো যে, সেখানে পরিসর এত কম যে সেটা ভরিয়ে তোলা কিছু কঠিন নয়। তাছাড়া শেষ যখন...

থাক, বলে রমা আমার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল।

রমাকে ভারী ভাল দেখাচ্ছিল।

আমার হঠাৎ মনে হল, অনেক অনেকদিন আমি রমার মুখের দিকে ভাল করে তাকাইনি। রমার মুখ ভারী সুশ্রী এবং অভিজাত। বিশেষ করে ও যখন হাসে, তখন ওকে ভারী পবিত্র ও মিষ্টি দেখায়। আমার রমা যদি কখনও জানত যে মেয়েদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য তাদের শান্ত নম্র ব্যবহার! যদি কখনও তা জানত, তবে আজ ওকে এমন করে আমার হারাতে হত না।

রমা আবার বলল, তুমি নিশ্চয়ই ছুটিকে বিয়ে করতে। কিন্তু বেচারী তুমি। কোনো মেয়েই কি তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবে ? মনে হয় না। তোমার আরও একটু সাধারণ হওয়া উচিত ছিল। তোমার মত পুরুষদের বিয়ে করা উচিত নয়—কারণ তোমরা সাধারণের ব্যতিক্রম। বিয়েটা একটা সস্তা দৈনন্দিন, একঘেয়ে হিহি-হা-হা জীবন। সেখানে তোমার মত সবসময় চশমা-নাকে সিরীয়াস গম্ভীর গুণী লোককে মানায় না। মেয়েরা এমন লোককে দূর থেকে পুজো করে, কিন্তু তাদের পক্ষে এরকম লোকের সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়।

একটু থেমে রমা বলল, বিশ্বাস করো, তোমাকে কিন্তু মিথ্যা বলিনি। তুমি দেখো। ছুটি সত্যিই বিয়ে করেছে। তোমাকে মিথ্যা বলে আমার কি লাভ বলো ?

আমি রমার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

আমার মাথার মধ্যে অনেক ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

কিছুক্ষণ পর রমা উঠে, চানটান করে নিতে গেল।

ওর চান হয়ে যাবার পর আমিও চান করে নিলাম।

খেতে বসে রমা আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল, শোনো, মাঝে মাঝে এসে তোমাকে আমি রান্না করে খাইয়ে যাব। তোমার নতুন স্ত্রী ত জানে না, তুমি কি কি খেতে ভালবাস।

চোখ তুলে দেখলাম, রমার দু চোখ জলে ভরে গেছে। আমি বললাম, একি হচ্ছে ? একি ?

তারপর বললাম, জানো, এরকম হয়; এত বছর একসঙ্গে ছিলে। গুণ্ডা বদমাসের সঙ্গে থাকলেও মন খারাপ হয়—আমি ত গুণ্ডা বদমাসের চেয়ে একটু ভাল, বল ? বাড়ির কুকুর-বেড়ালকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হয়, আর আমি ত একটা মানুষ।

কিন্তু এই চোখের জলটা কিছু নয়। বিয়ের পরদিন যেদিন তোমাকে তোমাদের বাড়ি থেকে

নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন বাড়িসুদ্ধ সকলের কান্না এবং তোমার কান্না দেখে নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমিই যত অনিষ্টের কারণ। গাড়িতে তুমি কি কান্নাই না কাঁদলে, মনে আছে। অথচ বৌভাতের পরদিনই যখন আবার গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি, তখন কি হাসি কি হাসি। তখন কে বলবে যে এ বাড়িতে তিন-চারদিন আগে অমন কান্নাকাটি হয়েছিল। তা-ই বলছি, এ চোখের জল নিয়ে ভেবো না। তুমি এবার আমার খারাপ-সঙ্গ, খারাপ বাড়ি, সব ছেড়ে ভাল সঙ্গ, চমৎকার স্বামী, আনন্দ মজা কত কিছুর মধ্যে গিয়ে পড়বে। গিয়ে পড়লেই, পুরনো সব কথা ভুলে যাবে। তখন দেখবে, ফেলে আসা এতগুলো বছর কোথায় চলে গেছে। মনে করতে চাইলেও হয়ত তোমার মনেই পড়বে না। দেখবে আমি এবং আমার সবকিছু তোমার স্মৃতি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

খাবার ঘরের পাশের পেঁপে গাছের উপর কতগুলো শালিক এসে বসেছিল।

দুপুরের শান্ত রোদ আলতো ভাবে বাবুর্চিখানার প্যাটকিলে-রঙা দেওয়াল, কারিপাতা গাছগুলোয়, শালিকের গ্রীবায় এসে পড়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রমার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ এতদিন এতবছর পরে আমার মন বলল, রমাকে আমি দারুণ ভালবাসি। মন বলল, দুটো আশ্চর্য জীবন তোমরা নষ্ট করলে। একটু চেষ্টা করলেই, সময়মত এই দুর্ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করলেই, এটা ঘটতো না।

রমা মুখ নীচু করে বসে প্লেটের উপর কাঁটা চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। হঠাৎ ও বলে উঠল, তোমার সঙ্গে হয়ত হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে কোনো ছুটির দিনে, পার্ক স্ট্রীটের লাল বাতির সামনে। আমি সীতেশের পাশে বসে থাকব, তুমি তোমার নতুন স্ত্রীর পাশে বসে থাকবে স্টিয়ারিং-এ।

তুমি ঘাড় হেলিয়ে বলবে, ভালো?

আমি হেসে বলব, ভাল। ভাবা যায় না, না? সত্যিই ভাবা যায় না? তোমার কাছে আমি এবং আমার কাছে তুমি এত চেনা, এত কাছের, আমাদের মধ্যে গোপনীয় বলতে কিছুই নেই; অথচ সেদিন তুমি আমাকে একজন বাইরের লোক ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারবে না।

আমি চুপ করে ছিলাম। হেসে বললাম, মনে হচ্ছে, তুমি বাইরে যতখানি শক্ত, ভিতরে ততখানি নও। এখন তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার সিদ্ধান্তে পেঁছে তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ!

রমা চোখ তুলে চাইল। ওর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ও বলল, মোটেই তা নয়। তবে কি জানো, আমার বাইরেটা চিরদিনই শক্ত, ভিতরটা কোনদিনই নয়। আমার দুঃখ এইটুকুই যে তুমি চিরদিন আমার বাইরেটা দেখেই আমাকে বিচার করলে, আমার ভিতরটা কখনও দেখতে চাইলে না। যদি আমি উদ্ধত হয়ে থাকি, আদুরে, একগুঁয়ে, অবাধ্য হয়ে থাকি, তা তোমার জন্যে গর্বিত ছিলাম বলেই হয়েছিলাম। তোমার জন্যে গর্বিত হওয়াটা যে তোমাকে অপমানিত করবে কখনও তা বুঝতে পারিনি; তোমার উপর সমস্ত অভিমান যে তোমার কাছে নোংরা রাগ বলে মনে হবে, এও বুঝতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ হিসাবে বিয়ের আগে তুমি যেমন ছিলে, যেমন রসিক, যেমন হাসি-খুসী, যেমন সূক্ষ্ম, এখন আর তেমন নেই। তুমি যেন এখন কেমন হয়ে গেছ। তোমাকে দেখলে সত্যিই আমার কষ্ট হয়।

আমি বললাম, চল, বাইরে রোদে গিয়ে বসি। তোমার ট্যাক্সি আসার সময় হয়ে গেল।

বাইরে যেতে যেতে বললাম, ভাবছি, তোমাকে রাঁচী অবধি পেঁছে দিয়ে আসি। জঙ্গলের পথ আছে অনেকটা, তারপর রাত হয়ে যাবে পেঁছতে পেঁছতে, তুমি একেবারে একা যাবে। তাছাড়া এরপর তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে ত সীতেশের পারমিশান লাগবে।

রমা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, আমারও খুব ইচ্ছে করছিল তোমাকে বলতে, কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছিল। এখন তুমি আমার কেউ নও। তোমার উপর আমার জোর কোথায়? অবশ্য যখন কেউ ছিলে, তখনও জোর ছিল না।

আমি বললাম, না। আমি যাব।

সকালবেলার রমা আর এখনকার রমা যেন একেবারে অন্য লোক। কেমন মিষ্টি করে হাসছে রমা—কেমন লাজুক চোখে তাকাচ্ছে, যেন এই মাত্র ওর সঙ্গে আমার আলাপ হল।

রমা হঠাৎ বলল, তুমি ছুটিকে খুব ভালবাস, না?

বললাম, মিথ্যা বলব না; বাসি।

আমার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাস, না? মানে যখন আমাকে ভালোবাসতে।

বললাম, কোনো সম্পর্কের সঙ্গে অন্য সম্পর্কের তুলনা কোরো না। তুলনা হয় না ওরকম। প্রতিটি সম্পর্কই আলাদা।

রমা বলল, আজ তোমাকে বলা দরকার। কোনোদিন পরিষ্কারভাবে বলিনি, বলতে সংকোচ হয়েছিল। অপমানের ভয় ছিল। কিন্তু আজ ত আর সে-সব ভয় নেই। আজকে তোমার এবং আমার সম্পর্কের এই পরিণতির কারণ কিন্তু ছুটি। ছুটির জন্যেই এটা ঘটল।

আমি বললাম, সীতেশ নয় কেন?

রমা বলল, বিশ্বাস করো, সীতেশ ছেলেটা খারাপ নয়। ওর মনটা বড় নরম। নার্সিং হোমে তুমি আমার হাতে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখেই খারাপ ভেবেছিলে, কিন্তু ও বন্ধুত্বের অমর্যাদা কখনও করেনি তোমার। তখন আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, তুমি আসার আগে সেদিন ও আমার মাথাও টিপে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো রোম্যান্স ছিল না। ওর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার কোনোদিনও অমন ছিলো না। ছুটির হ্যাংলামি ও তোমার ওর সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছিল। সীতেশের সঙ্গে সম্পর্কটা অন্য রকম করার মূলে আমি। ওতে ওর কোনো দোষ নেই। আমি চাই, তুমি সীতেশকে ভুল বুঝবে না! ছুটি তোমার জীবনে না এলে আজকে আমার এবং তোমার এই অবস্থা হতো না। এমন করে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেত না। তবুও বুঝতাম ও যদি তোমাকে খুশী করত। চেষ্টা করত খুশী করাব।

আমি চুপ করে থাকলাম।

রমা আবার বলল, তুমি দেখো, আমার অভিশাপ কি করে লাগে ওর জীবনে। ও কোনোদিন সুখী হবে না। ও সারাজীবন জ্বলে-পুড়ে মরবে। একের পর এক ভুল করবে ও। ওর মনে কখনও শান্তি থাকবে না। ও লোককে দেখাবে, জানাবে যে ও সুখী। বাইরে ও সুখের ডংকা বাজাবে কিন্তু সারাজীবন ওর হাহাকারে কাটবে। মনের মধ্যে ও কখনও শান্তি পাবে না। অন্যকে এমন করে ঠকিয়ে কেউ কোনোদিনও শান্তি পায়নি। সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওকে করে যেতেই হবে। এ জন্যেই ও তোমাকে যেমনি করে ঠকিয়েছে, ওকেও সবাই তেমনি করে ঠকাবে।

আমি বললাম, রমা, থাক না এসব কথা।

রমা হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বলল, তুমি বিয়ে করবে ত? বিয়ে না করলে কিন্তু তোমাকে ছেড়ে গিয়েও নিজেকে ভীষণ অপরাধী লাগবে আমার। কথা দাও। এবারে খুব দেখেশুনে বিয়ে কোরো।

কেন? আমি বললাম।

কেন না, তুমি মেয়েদের উপর ঠিক কতখানি নির্ভরশীল তা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। কারো নরম ভালোবাসার মন, কারো ইচ্ছুক শরীর তোমার হাতের কাছে না থাকলে তুমি কতখানি কষ্ট পাবে তা আমি অন্ততঃ বুঝতে পারি।

আমি বললাম, করব। ছুটি যদি রাজী থাকে, ছুটিকে বিয়ে করব। অন্য কাউকে নয়। আর নতুন করে বাঁধনে জড়াতে ইচ্ছা নেই আমার। বাঁধনের যন্ত্রণার চেয়ে মুক্তির যন্ত্রণা অনেক ভাল।

রমা অবাক গলায় বলল, ছুটিকে বিয়ে করবে? তোমার এখনও বিশ্বাস হল না যে, ছুটি বিয়ে করেছে?

আমি বললাম, না। তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছ, ভুল দেখেছ।

রমা আশ্চর্য চোখে আমার দিকে চাইল। বলল, এই মেয়েটাই তোমার জীবনের শনি। তুমি দেখে নিও। ওকে আমি কোনোদিনও ক্ষমা করব না।

তারপর বলল, একটা কথা বলব? এ পর্যন্ত কত টাকা তুমি দিয়েছ ওকে? রাঁচীতে কি তুমি ওকে বাড়ি কিনে দিয়েছ? ব্যাংকে ওর নামে নাকি অনেক টাকা রেখে দিয়েছ? অন্য কোনো ভালো মেয়ের জন্য করতে যদি, আমার আপত্তি ছিল না। ও ত যারা শরীর বিক্রী করে, তাদের চেয়েও নীচ। সে সব মেয়ে বদলে তবু কিছু দেয়। তারা তবু একটা দেওয়া-নেওয়ায় বিশ্বাস করে। সে বিষয়ে তারা সৎ অন্ততঃ। কিন্তু এরা ত ঠগী, এরা ত নীচ; জোচ্চোর। তুমি কি করে যে এর হাতে পড়লে, আমি ভেবেই পাই না।

আমি এবার রীতিমত বিরক্ত হলাম। বললাম, রমা, তুমি এবার থামো। তোমার যাবার সময় হয়ে এল। অন্য কথা বলো। আমি ত সীতেশ সম্বন্ধে কোনো কথা বলিনি, বলবও না, অথচ

সীতেশকে তুমি কতটুকু জানো তা আমি জানি না। আমি শুধু চাই যে, তুমি যেভাবে হতে চাও সেভাবেই সুখী হও। তুমি নিজে সুখী হলেই ত হল। ছুটির সুখ নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?

একটু পরে ট্যাক্সিটা এসে গেল।

মালপত্র তুলে রমাকে নিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

পথের দুপাশে শেষ বিকেলের রোদ ছড়িয়েছে। এখানে ওখানে ঘুঘুরা পথের উপর কি যেন খুঁটে খাচ্ছে। বাসারীয়ার কাছে এক ঝাঁক তিতিরের সঙ্গে দেখা হল। গাড়ি দেখে তরতরিয়ে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

রমা জিগ্যেস করল, আমি কি কালই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব?

তোমার যেদিন খুশী। আমি বললাম।

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার।

আমার শাড়ি গয়না (যা আমার) সব থাকবে। তুমি কোলকাতা ফিরলে একদিন এসে তোমার সামনে নিয়ে যাব। হিসেব করে।

আমি হাসলাম, বললাম, তুমি ত এখনও পর হওনি। আইনত। তোমাকে আমি একদিন যা কিছু দিয়েছি, সবই ত তোমার। তাছাড়া আরো তুমি যা নিতে চাও সবই তোমারই জন্যে, শুধু লাইব্রেরীর চাবিটা রেখে যেও। আর সব ঘরের মালিক তুমি। তোমার প্ল্যানে করা বাড়ি, তোমার সাজানো ফার্ণিচার, তোমার টাঙ্গানো ছবি, এ সবে কি অন্য কারো অধিকার জন্মাতে পারে? এ সবই বরাবরের তোমার। যদি অন্য কেউ আমার জীবনে আসেই, যদি আসে, সে নিজের পছন্দমত নিজের বাড়ি সাজাবে। তোমার বাড়িতে তার ত কোনো অধিকার নেই।

রমা আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি নেব কেন?

বললাম, একদিন আমাকে ভালোবেসেছিলে, আমার ভালোবাসা পেয়েছিলে, সে জন্যে নেবে। যা পেয়েছিলে এবং দিয়েছিলে তা কি কিছুই নয়? তা কি একেবারেই ধুলোয় ফেলার?

রমা কথা না বলে আমার হাতটা ওর কোলে নিল।

রমা এবং আমি দুজনেই বুঝতে পারছিলাম না আমাদের দুজনের ,জীবনের এই দারুণ পরিবর্তনটা আমরা কি করে মেনে নেব। অথচ এখন মেনে না-নেওয়া ছাড়াও অন্য কোনো উপায় নেই।

ট্রেনের সময়ের একটু আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম।

রমা এয়ার-কণ্ডিশানড্ কোচের টিকিট কেটেছিল। একটা কুপেও পেয়েছিল। ওকে তুলে দিয়ে, ওর রাতের খাবারেব অর্ডার দিয়ে দিলাম।

যখন ট্রেন ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এল, রমা হঠাৎ উঠে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। বন্ধ করে দিয়ে, আমার বুকে মুখ গুঁজে দাঁড়াল। দরজাটা আমিই বন্ধ করতাম, কিন্তু যদি ও কিছু মনে করে, এই ভেবে করিনি।

রমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর কপালে, গলায়, ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম আমি।

রমার চোখের জলে আমার কোটের একটা জায়গা ভিজে গেল।

রমা অস্ফুটে বলল, তুমি ভীষণ খারাপ, তুমি ভীষণ খারাপ।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি এখন নতুন জীবনে প্রবেশ করছ, আমার পুরোনো বৌ। অমন কোরো না। নিজের মন থেকে যা করেছ, সেটাকে ঠিক বলে জেনো। তোমার নিজেকে বাঁচতে হবে। তুমি তোমার মত করে বাঁচবে। এতে ত কোনো লজ্জা নেই। তোমার সমস্ত অধিকার আছে তোমার নিজের ইচ্ছামত বাঁচার।

তারপর বললাম, সারা রাস্তা আমার সমস্ত খারাপ ব্যবহার, আমার অবহেলা, আমার অত্যাচারের কথা ভাবতে ভাবতে যেও। তাহলে দেখবে, ভাল লাগছে। তুমি যে আমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ এ জীবনের মত, একথা জেনেই ভাল লাগবে। তুমি দেখো, ভাল লাগে কিনা।

রমা আবার বলল, তুমি খারাপ। ভীষণ, ভীষণ; বোকা তুমি।

॥ পঁচিশ ॥

আমি তৈরি হয়ে বাড়ির বাইরে বসেছিলাম।

এখন সকাল আটটা বাজে।

একটা ট্যাক্‌সি আসার কথা আছে। এলে তাতে রাঁচী যাব। ছুটির কাছে। প্যাটও বলেছে সঙ্গে যাবে, ওর নাকি কি দরকার আছে রাঁচিতে।

আমি আজ রাতেই ফিরে আসব শুনে ও বলেছিল ও-ও যাবে।

ট্যাক্সিটা এসে গেলে, প্যাটকে তুলে নিয়ে যাব।

সে-রাতে যখন বাঁশী বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে রাঁচী-হাওড়া এক্‌সপ্রেসটা রাঁচী স্টেশান ছেড়ে চলে গেল, তখন আমার বুকের মধ্যে থেকেও একটা নিঃশব্দ নরম ট্রেন, যে এতদিন অন্ধকারে সাইডিং-এর অস্পষ্টতার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল এবং যে ছিল বলে ইদানিং বুঝতে পর্যন্ত পারতাম না, সেও রমার ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

সে এতদিন আমার ছিল বলেই বোধহয় সে যে ছিল এ-কথা কখনও মনে হয়নি। যে-মুহূর্তে সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেল, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে, জীবনে এমন অনেক থাকা থাকে যা থাকাকালীন তাদের অস্তিত্ব বা দাম আমরা বুঝতে পারি না। হয়ত কেউই পারে না। যখন তা আর আমাদের থাকে না, তখনই টুকরো টুকরো কথা, বাসি ফুলের গন্ধের মত চাপা স্মৃতি ফিরে ফিরে মনে আসে। মনে না আসলে, যে-কোনো বিচ্ছেদই অনেক সুখকর হত। কিন্তু আমরা যতই কঠোর স্বার্থপর বা আধুনিক হই না কেন, তবুও তা আসে। স্মৃতির ফেউ কিছুতেই দ্রুতধাবমান অনিশ্চয় বর্তমানের পিছন ছাড়ে না।

এখন এ-দেশেও অসংখ্য বিবাহিত দম্পতির ছাড়াছাড়ি হয়, নানা কারণে। আমি জানি না, যাদের জীবনে এ-অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা কি বলবেন। কিন্তু আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এইটুকু বলতে পারি যে, খারাপতম সঙ্গী বা সঙ্গিনীকেও হারিয়ে ফেলা নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে দেওয়ার পরও মনে বড় কষ্ট লাগে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, যা কখনও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই সম্পর্কটা যখন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়, তখন অত্যন্ত নির্দয় মানুষের মনও দারুণভাবে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। অথচ সম্পর্ক যখন শেষ হয় নিজেদের ইচ্ছায়, তখন তা নিয়ে কিছুমাত্র খেদ থাকার কথা নয় কারো মনেই, অথচ আশ্চর্য! তবুও খেদ থাকে। বড় খেদ থাকে।

এক সময় ট্যাক্‌সিটা সত্যি সত্যিই এল। এ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে ট্যাক্‌সিতে উঠে বসলাম।

প্যাটের বাড়ির সামনে প্যাট দাঁড়িয়েই ছিল। গায়ে ওর সেই উইণ্ড-চিটার, পরনে খাকি ফুল প্যাণ্ট, হাতে একটা বাজারের থলে। প্যাট ট্যাক্‌সিতে উঠে আমার পাশে বসল। ক্রাচ দুটোকে পায়ের কাছে শুইয়ে রাখল।

ট্যাক্‌সি ছুটে চলল অসমান জঙ্গলের পথ দিয়ে রাঁচীর দিকে।

আমরা দুজনেই চুপচাপ বসেছিলাম। কারোরই বোধহয় কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

হঠাৎ প্যাট বলল, লুসিটাকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবে না।

শুধোলাম, কেন? ওর ঘা শুকোয়নি?

প্যাট বলল, না, সেজন্যে নয়। ওর মরার সময় হয়েছে বলে। এত বয়স হয়ে গেছে লুসির যে, এমনিই আর বাঁচবে না। কাল থেকে ত কিছু খাচ্ছে না। চুপ করে শুয়ে থাকে। ডাকলে জবাব দেয় না। মাঝে মাঝে শুধু চোখ মেলে চায়, এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার চোখ বুঁজে ফেলে।

—কোনো ভেটকে কি দেখিয়েছ?

—এখানে আর ভেট কোথায়। তবে ডেকে এনেছিলাম আমার এক বন্ধুকে, সে এসব বিষয়ে জানে শোনে। সেই বলল, কোমা সেট করে গেছে—ও আর বাঁচবে না। ওর অন্তিম সময় এসে গেছে।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি? ওকে দেখাশোনা করার জন্যে বলে এসেছি। আমি ফিরে আসা অবধি যদি বেঁচে থাকে তাহলেই যথেষ্ট জানব। দেখি কি হয়।

তারপরই প্যাট বলল, একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম জানো?

বললাম, কি?

—আশেপাশের বাড়ির যতগুলো মন্দা কুকুর আছে তারা সবাই লুসি আসার পর পরই লুসির খোঁজ নিতে এসেছিল।

—আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, বল কি? তাই নাকি?

—প্যাট বলল, হাঁ, তাই। তবে কি জানো, কেউ-ই দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসেনি।

—কেন? এবার অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

প্যাট একবার আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, তারপর বলল, Because, they are the sons of bitches। এল, দৌড়ে দৌড়ে এল, লুসির চারপাশে ঘুরল। তারপর লুসির কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কোনো যুবতী কুকুরীর খোঁজে উধাও হয়ে গেল। সব কটা। একসঙ্গে।

আমি চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। প্যাটও চুপ করে রইল। আমি এবং প্যাট আমরা দুজনে দুদিকের জানালায় তাকিয়ে দুজনের পৃথক পৃথক অনেক ব্যবধানের চিন্তার মাঠে চেয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ পর প্যাট বলল, তোমার কতক্ষণের কাজ রাঁচীতে?

আমি বললাম, আমার জন্যে ভেবো না, তোমার যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণই সময় নিতে পারো। আমার জন্যে তাড়া কোরো না। তুমি ত আর রোজ রোজ আসো না রাঁচীতে, তোমার যা কাজকর্ম, তা সব শেষ করে নিও। বিকেলের দিকে ফিরব। ঠিক আছে?

ও বলল, তাহলে ত খুবই ভাল হয়। আমার অনেকের সঙ্গে দেখা করার আছে।

আমি বললাম, আমি ত একদিন না একদিন কোলকাতায় ফিরে যাবই। আজ আর কাল। তুমি একবার কোলকাতা এসো। আমার কাছে থেকে যাবে ক'দিন। তুমি শেষ কবে কোলকাতায় গেছ?

প্যাট সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলল, ওঃ সে অনেক দিনের কথা। যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় দুদিন ছিলাম। তা বছর তিরিশের কাছাকাছি হতে চলল। সেই টমি আর আমেরিকান সাদাকালো সোলজার এবং ওয়াকাই ভরা কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার নিশ্চয়ই মিল নেই কোনো।

বললাম, একবার এসো। নিজের চোখেই দেখে যাও।

প্যাট বলল, আসব।

দেখতে দেখতে আমরা চামার মোড়ে এসে পীচ রাস্তায় পড়লাম। সেখান থেকে বিজুপাড়া, মান্দার হয়ে রাঁচী।

ফিরাইলালের চওক'এ এসে যখন ট্যাক্সি মেইন রোড ধরে ডুরাণ্ডার দিকে এগোতে লাগল, আমি তখন প্যাটকে বললাম, তোমাকে একটা জিনিস প্রেজেণ্ট করতে চাই।

প্যাট অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, হঠাৎ অব্ অল পার্সনস্ আমাকে প্রেজেণ্ট? ওসব অভ্যাস আমার বহু দিন হল নষ্ট হয়ে গেছে, কেন আবার ভুলে যাওয়া অভ্যেসকে জাগাবে। বেশ ত আছি এমনি একা একা ভুলে থাকা জীবন নিয়ে।

আমি বললাম, এটা আমার আনন্দের জন্যে করছি, মানে করব। তোমার আনন্দের জন্যে নয়। বল? কি নেবে?

প্যাট একটু ভাবল। তারপর বলল, প্রেজেণ্টই যদি দেবে ত পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা প্রেজেণ্ট দিও।

সেটা কি?

প্যাট আবার হাসল। বলল, এক বোতল স্কচ্ হুইস্কী। তিরিশ বছর আগে খেয়েছিলাম, তারপর আর খাইনি।

আমি হাসলাম, বললাম, ফেয়ার-এনাফ্। তারপর বললাম, কোনো পার্টিকুলার ব্রাণ্ডের উপর দুর্বলতা আছে?

ও বলল, আরে না না, স্কচ্ হলেই হল। এমনি স্কচ্ ইজ গুড এনাফ ফর মি।

ট্যাক্সিটা তখন বাজারের কাছে গুপ্ত ব্রাদার্সের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে প্যাটের জন্যে একটা হুইস্কী কিনলাম। শুধু জন হেইগ ছিল দোকানে। জন হেইগ-ই নিলাম এক বোতল। আর ছুটির জন্যে কিছু ক্যাডবেরীর ক্রিসপ্ চকোলেট

কিনলাম।

প্যাট বলল, ও এই বাজারেই নেমে যাবে। কথা হল, বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফিরাইলালের চওকের সামনে ও দাঁড়িয়ে থাকবে। আমিও ওখানে পেঁছিব। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফেরা যাবে।

ছুটির বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটাকে যখন ছেড়ে দিলাম, তখন বেলা পৌনে এগারোটা বাজে।

দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে ছুটির বুনে-দেওয়া সোয়েটার গায়ে দিয়ে খাটিয়ায় বসেছিল।

আমি শুধোলাম, দিদিমণি আছেন?

ও বলল, হ্যাঁ আছেন। চলে যান উপরে।

জানি না, কেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আমার ভারী ভয় করছিল। মনের মধ্যে একরাশ ভাবনা ভিড় করে আসছিল।

যেদিন রমাকে তুলে দিতে আসি রাঁচী স্টেশানে, সেদিন ফেরার পথে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটির বাড়ি অবধি এসেছিলাম। বাড়ির হাতায় অনেক অনেকক্ষণ ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ছুটির দোতলার ঘরের দিকে চেয়ে ট্যাক্সির মধ্যেই বসেছিলাম। ওর ঘরের দরজা খোলা ছিল। আলো জ্বলছিল ঘরে। খুব ইচ্ছা করছিল, উঠে গিয়ে যাচাই করে আসি রমা যা বলেছিল তা সত্যি কি না। জেনে আসি, নতুন করে যে আমার ছুটি, আমার জন্ম-জন্মের ছুটি শুধু আমার, আমার একারই আছে।

কিন্তু পারলাম না। সেদিন আমার গায়ে এমন জোর ছিল না যে, দোতলায় উঠি।

সে রাতে রমাকে বিদায় দেওয়ার পর আমার মন এমনিতেই এত বিষণ্ণ ও ক্লান্ত ছিল যে, সেদিন নতুন করে আর কোনো ধাক্কা সইত না হয়ত।

সিঁড়ি পেরোতে পেরোতে ভাবছিলাম যে, সেদিন যাইনি ভালোই করেছি, কারণ সেদিন আমার নিজের উপর আর কোনো বিশ্বাস ছিল না। গিয়ে যদি দেখতাম যে রমা যা বলেছে, তা সত্যি, তবে আমি কি করতাম নিজেই জানি না। রমা আমাকে যাই-ই বলুক, আমার সমস্ত মন বার বার বলেছিল যে, সে-কথা সত্যি নয়। আমি ত কোনো ক্ষতি করিনি কারো। ভালো ভেবেছি, ভাল করেছি; ভালোবেসেছি। তবে কেন ছুটি আমাকে এমন করে শাস্তি দেবে? আমি যে ভগবান মানি; ভগবান থাকতে এমন কি হতে পারে?

এ কদিন ম্যাকলাস্কিগঞ্জে একা একা সকালে-বিকেলে জঙ্গলের পথে হেঁটে নিজেকে বার বার একই প্রশ্ন শুধিয়েছি। এও কি সম্ভব? আমার জীবনের শেষ ও একমাত্র অবলম্বন ছুটিও কি আমাকে এমন ধুলোয় ফেলে যাবে? আকাশের তারাদের জিজ্ঞেস করেছি একা একা। বলেছি, তোমরা বল, তোমরা জবাব দাও আমার জন্মলগ্নে তোমরা কে কে সাক্ষী ছিলে—কোন্ অপয়া তারার সমষ্টি তোমরা? কোন্ ব্যর্থ সর্বনাশা পরিমণ্ডল?

কোনো জবাব মেলেনি তাদের কাছ থেকে।

তবে নীরবতাও একরকমের জবাব। প্রত্যেক নীরবতার মধ্যেই অনেক সশব্দ সাহসী উত্তর চাপা থাকে। সেই উত্তরের মধ্যে আমি জেনেছিলাম যে, আমার মন যা বলছে তা ঠিক। আমার ছুটি কখনও এতখানি খারাপ হতে পারে না। এত বোকা হতে পারে না। কোনো দারুণ অভিমানে ভর করেও সে এমন অভিশাপ আমাকে কখনোই দিতে পারে না যে, সে বিষয়ে আমার মন নিঃসন্দেহ ছিল।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ছুটির দরজায় পেঁছে গেছি বুঝতেই পারিনি।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কড়া নাড়লাম।

ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হল না।

অনেকক্ষণ পর ছুটির সেই মহিমাময়ী লোকাল গার্জেন এসে দরজা খুলল। নীরস কণ্ঠে বলল, দিদিমণি কাজে গেছেন। তিনটের সময় ফিরবেন।

তারপরই কি ভেবে সে দয়াপরবশ হয়ে বলল, আপনি কি বসবেন?

আমার যা জানার তা স্পষ্টভাবে জানার কোনো উপায় ছিল না ওর কাছ থেকে।

আমি ঘুরিয়ে বললাম, বাড়িতে আর কেউ নেই?

ও বলল, এ সময় আমি ছাড়া আর কেউ ত থাকে না।

আমি বললাম, ও।

তারপর বললাম, আমি তাহলে বসি একটু।

ও বলল, এখানে বসলে তিনটে অবধি বসতে হবে। আমি ত আজ এক্ষুনি চাবি বন্ধ করে চলে যাব। দিদিমণির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, দিদিমণি যখন আসবে তখন ঘর খুলে ঢুকবে। অতক্ষণ কি আপনি বসবেন?

আমি বললাম, না, তাহলে আমি ঘুরেই আসছি। বলেই চলে এলাম।

চলে এলাম বটে কিন্তু আমার এখানে যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। চেনাপরিচিত লোক অনেক ছিল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কারো কাছেই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আমার।

এগারোটা থেকে বেলা তিনটে অবধি রাঁচী শহরের এই শান্ত নিরিবিলি কোণে আমি ঘুরে বেড়ালাম। সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা, ক্বচিৎ মোটরের হর্ন, কিছুই যেন আমার কানে লাগছিল না। পথের ধুলো, পথচারীদের কথাবার্তা, মন্থর গরুর গায়ের গঁুতো এ সমস্ত আমি সেদিন অবলীলায় অগ্রাহ্য করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম এই সমস্ত শীতার্ত ধুলিমলিন নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতার পরই আমি এক দারুণ উষ্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত হব।

আমার এত বয়স হয়েছে, জীবনে কত শত ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে ছোটবেলা থেকে, তবু আজকে আমার মনের যা অবস্থা তার মত কোনো অবস্থায় আগে কখনও পড়িনি। এমন অসহায় কখনও বোধ করিনি। কখনও জানিনি যে, আমাদের সমস্ত সুখ, সমস্ত অস্তিত্ব এত পরনির্ভর। এমন নিশ্চয় করে কোনোদিনও বুঝিনি যে, একজনের নরম হাত এবং ভালোবাসার ঘরের অভয়ারণ্যের ভরসাতেই দিনরাত শিকারীর তাড়া-খাওয়া সম্বরের মত আমরা বেঁচে থাকি। আমরা প্রত্যেকে।

বড়লোকের ছেলে বলতে যা বোঝায় তা আমি কখনও ছিলাম না। তাই অন্য দশজন আত্ম-সম্মানজ্ঞানী ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষমানুষের মত নিজের পায়ে দাঁড়াতে, নিজের অধিকারে এ জীবনে অধিষ্ঠিত হতে প্রতিদিনই অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। সেসব পরীক্ষাকে আমি কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু ফেইলিউরস্ আর দি পিলারস্ অব সাকসেস্। এ কথাটা জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সমস্ত প্রার্থিত বস্তুরই কোনো-না-কোনো বিকল্প থাকে। কিন্তু ছুটিকে আমার, চিরদিনের মত আমার করে পাওয়ার যে প্রার্থনা আজকের, তার কোনো বিকল্প আমার জানা নেই। আমার জীবনের একটা বড় অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেছে সেদিন রমা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ভাল করেছি কি মন্দ করেছি বুঝিনি, শুধু জেনেছি যে, ছুটির হাত ধরে আমি নিশ্চয়ই এক নতুন তরুণ সুগন্ধী জীবনে প্রবেশ করব। তারপর খুব ভাল লিখব আমি। যারা আমার লেখা পড়বে, তাদের খুশী মনই হবে আমার সবচেয়ে বড় শিরোপা। লেখার মধ্যে আমি প্রমাণ করব যে, একজন ভালো মেয়ের অকৃত্রিম, আন্তরিক, ভণ্ডামীহীন ভালোবাস আমার মত একজন সাধারণ লোককেও সত্যিকারের বড় লেখকে পরিণত করতে পারে। তাছাড়া একথা যে আমি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছি, জেনেছি প্রেম একজনকে কি না দিতে পারে। কি ন নিতে পারে অন্যজনের কাছ থেকে? ভালোবাসাকেই যে আমার জীবনের একমাত্র সঞ্জীবনী সুধ বলে জেনে এসেছি আমি এতদিন। ভালোবাসার মত এমন অন্য কোনো বোধের প্রতিই ত আমি এমন করে সমর্পিত হইনি—বরঞ্চ ভালোবাসার জন্যে অন্যসব বোধকে জলাঞ্জলি দিতে রাজী হয়েছি। চিরদিন; চিরদিন।

এখন সময় বড় ভারী হয়ে বসে আছে আমার ভীরু বুকের উপর। একটা পুরী-তরকারী দোকানে বসে একটু সময় নষ্ট করলাম। দুটো পুরী-তরকারীও খেলাম।

খেতে খেতে ভাবছিলাম, ছুটি বোধহয় জানে না, ছুটি বোধহয় এখনও জানে নি, ওর উপরে এ জীবনে আমি কতখানি নির্ভর করেছিলাম।

আবার ভাবছিলাম, এতদিনেও এ কথা কি না জেনে ও পারে? ও ত বোকা নয়। আমার সেই সময়-চাওয়া চিঠিটা ত শুধু আমার সুস্থ ভদ্রতাই প্রকাশ করেছিল। ছুটির কাছে যে কোনোরকম মালিন্য নিয়ে আমি পৌঁছতে চাইনি। ও যেমন চিরদিন ওর মনে চিলকার রাজহাঁসের মত নিষ্কলঙ্ক, আমিও যে তাকে তেমনি নিষ্কলঙ্কতার মধ্যেই বুকে পেতে চেয়েছিলাম। কোনোরকম সংশয়, দ্বিধা, কোনোরকম কিন্তু-কিন্তু বোধ যেন আমাদের পরিশুদ্ধিকে বিঘ্নিত না করে, আমি যে শুধু তাই-ই চেয়েছিলাম।

মুখ ধুয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে খুচরো পয়সা ফেরত নিতে নিতে নিজের মনেই বলে উঠলাম, না না। এ হতে পারে না। ছুটি কখনও অমন হতে পারে না। এ সম্ভব নয়।

দোকানী অবাক হয়ে বলল, 'ইতনাই তা হুয়া বাবু। আপসে দাম জাদা নেহি লিয়া।"

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পয়সা পকেটে ফেলে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি যখন ছুটির বন্ধ দরজার সামনে আবার এসে দাঁড়ালাম তখন সোয়া তিনটে বেজেছে। দরজার কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল যেন কত যুগ পেরিয়ে গেল।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে বলছিলাম, ও ছুটি, ও আমার জন্ম-জন্মের ছুটি, তুমি কি কখনও শুনতে পাও তোমাকে আমি কত ডাকি, কতবার ডাকি। তুমি কি কখনও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে জানালায় এসে দাঁড়াও, জানালায় দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে তুমি কি একবারও জানতে পাও যে একজন হতভাগা লোক তার গোলমেলে রুক্ষ জীবনের মধ্যে এই রাতের জানালায় দাঁড়িয়ে তোমার দিকে, তোমার ধ্রুবতারার মত নীল ও শান্ত সহজ সত্তার দিকে চেয়ে আছে। সে তোমাকে তার জীবনে অনুক্ষণ যেমনভাবে উপলব্ধি করে, তোমার অস্তিত্ব তার সমস্ত মনকে যেমন করে প্রতি মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখে, তুমি কি তাকেও তেমনি করে উপলব্ধি কর? নাকি কখনও করো না ছুটি? কখনও বোঝ না, সে তোমাকে এ জীবনে কি দিয়েছিল!

ভাবছিলাম, এ জীবনে সকলের প্রেমের প্রকাশ একরকম নয়। কিন্তু প্রেম প্রেমই। তোমার প্রেমে কোনো দ্বিধা নেই, ধারালো ইস্পাতের মত তোমার মন। কিন্তু তুমি তাই বলে কি কারো নরম ভালোবাসায় জরজর অন্তর্মুখী নরম মনকে কোনো মুহূর্তের অভিমানে দ্বিখণ্ডিত করতে পারো? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর ছুটি?

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

দেখলাম, ছুটি দাঁড়িয়ে আছে। ছুটি হাসছে, ওর সহজ, সরল, সংস্কারহীন হাসি।

ছুটি বলল, সুকুদা। আসুন আসুন। কি ব্যাপার? পথ ভুলে?

ছুটির পিছন পিছন ওর ঘরে ঢুকলাম।

ও তখনও অফিসের জামাকাপড় ছাড়েনি। বোধহয় এক্ষুনি এসেছে।

কি ভেবে ছুটি বলল, বসুন। এক সেকেন্ড। আমি এক্ষুনি আসছি।

এর আগে কখনও ছুটির কাছে এসে বাইরের লোকের মত আমার বাইরের ঘরে বসে থাকতে হয়নি। এই প্রথম আমি বাইরের ঘরে বসলাম।

দু এক মিনিট পরেই ছুটি ডাকল, বলল, আসুন এইবার এই ঘরে। একটু বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি।

ছুটি বোধহয় শাড়ি ছাড়ছিল।

ছুটির ঘরে ঢুকে আবার ছুটির ঘরে বসে আমার মন নতুন করে আশ্বস্ত হল, খুশীতে ঝলমল করে উঠল। আমার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, রমা, তুমি একটা সস্তা অবাস্তব মিথ্যে কথা বলে নিজেকেই শুধু আমার কাছে ছোট করলে, ছুটির কাছেই ছোট হয়ে গেলে নিজে। বলতে ইচ্ছে করল, এ ঘরকে ছুটি কেবল আমারই করে রেখেছে; রাখবে চিরদিন। আর সকলে এখানে আসতে পারে যতবার খুশী, বসতে পারে বাইরের ঘরে কিন্তু তাদের সীমা এ ঘরের বাইরের চৌকাঠ পর্যন্ত। তার বেশী নয়।

বারান্দায় টুং-টাং শব্দ হচ্ছিল।

আমি বসেছিলাম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল বেড সাইড টেবলে একটা বইয়ের উপর। বইটায় পেজমার্ক দেওয়া ছিল। বইটি হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের বই।

যেখানে চিহ্ন দেওয়া ছিল সে জায়গাটা খুললাম। খুলে পড়তেই দেখলাম ছুটি আন্ডারলাইন করেছে 'সানাই' থেকে।

'প্রত্যেক মানুষেই আছে একজন আমি, সেই অপরিমেয় রহস্যের অসীম মূল্য জোগায় ভালোবাসায়। অহংকারের মেকি পয়সা তুচ্ছ হয়ে যায় এর কাছে। ওর নিখিল জগতের মর্মস্থান অধিকার করে আছি আমি, সেজন্যে আমাকে আর কিছু হতে হয়নি সাধারণ জগতের যে-কেউ হওয়া ছাড়া। সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা।'

আবার আন্ডারলাইন করেছে,

'মনের কথা সে বোঝে না তা নয়; কিন্তু তার বিশ্বাস ও সমস্তই 'প্রভাতে মেঘডম্বরম্',

বেলা হলেই যাবে মিলিয়ে। ঐ খানেই আমার মতের অনৈক্য। খিদে মিটতে না দিয়ে মেরে দেওয়া যায় না তা নয় কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন পাত পড়বে তখন হৃদয়ের রসনায় নবীন ভালোবাসার স্বাদ যাবে মরে। মধ্যাহ্নে ভোরের সুর লাগাতে গেলে আর লাগে না। হায়রে...। বিবেচনা করার বয়স ভালোবাসার বয়সের উল্টোপিঠে।'

বইটা জায়গায় রেখে দিয়ে আমি মুখ নীচু করে বসে রইলাম।

এমন সময় ছুটি কি যেন বলল বারান্দা থেকে।

আমি শুধোলাম, কি বলছ?

ও বলল, বলছি এখানে আসুন না—বারান্দায় এখনও রোদ আছে। এখানেই চা খাব। চলে আসুন।

বারান্দায় পা দিতেই আমার চোখ দুটো চমকে উঠল। দেখলাম বারান্দার দড়িতে ক্লিপ-করা অবস্থায় একটা পুরুষের আন্ডার-ওয়ার ঝুলছে, তার পাশে একটা চকরা-বকরা স্লিপিং-স্যুট।

ছুটির চোখ পড়েছিল আমার চোখে।

ছুটি মুখ তুলে বলল, কি হলো? বসুন, ক' চামচ চিনি দেব বলুন?

আমার কাছ থেকে ছুটি জবাব পেল না। তাই নিজের খুশিমত চিনি দিয়ে চা বানিয়ে, প্লাম কেক কেটে, কাজুবাদাম সাজিয়ে খাবারের প্লেট আর চা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

বলল, খান। আর খেতে খেতে গল্প করুন। তারপরেই বলল, কতদিন পরে আপনাকে দেখলাম।

আমি তবুও কোনো কথা বললাম না দেখে ছুটি বলল, আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু আপনার ত অবাক হবার কথা নয়। রমাদি আপনাকে সব বলেন নি? আপনার স্ত্রী ত আপনার হয়ে আমার কাছে অনেক ওকালতি করে গেলেন সেদিন। যতভাবে যতখানি অপমান করা যায় করলেন নতুন করে। আপনাকে কোন কুক্ষণে ভালবেসে ফেলেছিলাম জানি না। যাক্ যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। আপনি ত এই-ই চেয়েছিলেন। তাই না?

তারপর ছুটি বলল, রমাদি বললেন যে, পরদিনই আপনার কাছে যাচ্ছেন। কেন? রমাদি যাননি?

তবুও আমি উত্তর না দেওয়ায় ছুটি অত্যন্ত বিরক্তির গলায় বলল, সুকুদা, চুপ করেই থাকবেন ত এতদূর কণ্ট করে এলেন কেন? আপনার কি কিছুই বলার নেই? যা বলার আছে সব আমি শুনতে রাজী আছি। আপনি বলতে পারেন। বলুন, কথা বলুন।

আমি বললাম, রমা আমাকে বলেছিল।

তবে? তবে আর এত অবাক হওয়া কেন? আপনার ত তৈরী হয়েই আসা উচিত ছিল। কি? তাই না?

বললাম, হ্যাঁ। তাই। তবে আমি কথাটা বিশ্বাস করিনি।

ছুটি হেসে উঠল। বলল, বিশ্বাস করেন নি কেন? আপনার মত লোকের ত স্ত্রীর কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

আমি ছুটির মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু আমার মনে হল এ ছুটি নয়; এ অন্য কেউ। একে আমি কোনোদিনও চিনতাম না।

রাগলে ছুটিকে একটুও ভাল দেখায় না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম।

তারপরে বললাম, তুমি কি সুখী হয়েছ?

ছুটি বলল, তা জেনে আপনার কি কোনো দরকার আছে সুকুদা? আপনি ত সুখী হয়েছেন। তা হলেই হল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হয়েছ এর চেয়ে সুখের আর কি থাকতে পারে। আমার কাছে আপনার একা আসা উচিত হয়নি। আপনার মত গোঁড়া সংস্কারবন্ধ লোকদের কখনোই উচিত না স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সংগে এমন একা একা দেখা করতে আসা।

আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। অথচ এটুকু আমার বোঝা উচিত ছিল যে, এমন হতেও পারে।

আমি বললাম, তোমার স্বামী কে?

ছুটি এবার হাসল। বলল, আমি বিয়ে করিনি। বিয়ের মত মান্ধাতার আমলের সম্পর্কে আমি কখনও বিশ্বাস করিনি। উই আর লিভিং টুগেদার। দ্যাটস্ অল। যত দিন ভাল লাগে থাকব।

যখন ভাল লাগবে না, স্যুটকেস হাতে করে বেরিয়ে পড়ব।

আর ছেলেমেয়ে? তাদের কি হবে? বললাম আমি।

ছুটি বলল, ছেলেমেয়ে চায় কে? আমি চাই না। আমি আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসি। আমার সব সুখকে। আমার শরীরের সুখ, আমার মনের সুখ। অন্য কারো জন্যেই আমি আমার জীবনের কোন আনন্দ নষ্ট করতে রাজী নই। আমি স্বার্থপর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তবু, তুমি যার সঙ্গে আছ, সে কে?

ছুটি বলল, এমন কেউ নয় যে নাম করলেই চিনবেন। আপনার মত কেউ নয়। আমারই মত সে। একজন সাধারণ লোক।

আবার বললাম, সে কে?

ছুটি বলল, রুদ্র। রুদ্র রায়। আপনি কি চিনলেন? তাহলে নাম জেনে লাভ কি আপনার? তারপরই ছুটি বলল, বলুন, আপনার কি কি জিজ্ঞাসা আছে?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তারপর বললাম, আমাকে আর একটু সময় কি তুমি দিতে পারতে না? তা যদি পারতেই না, তবে এতদিন আমাকে দিলে কেন?

ছুটি হাসল। বলল, সুকুদা, আপনি লেখক মানুষ, এত জানেন, আর এটুকু জানেন না? সময় কেউ কাউকে দিতে পারে না। তারপর একটু থেমে বলল, ভরা নদীতে কি করে ব্রিজের পিলার তৈরী করে দেখেছেন কখনও? চার দিকের জল আগে পাম্প করে তুলে নেয়, তারপর কংক্রিট ঢালে। সময়ও হচ্ছে জলের মত। সময়কে নিজে হাতে শূন্য না করলে জলের মতই সময় চতুর্দিকে গড়িয়ে যায়। সময় কারো জন্যেই বসে থাকে না। তাছাড়া আমি সময় দিলেই কি লাভ হত আপনার? রমাদি যা বললেন এবং তাঁকে দেখে যা বুঝলাম তাতে ত মনে হল ভাগ্যিস আমি ঝুপ করে ডিসিশানটা নিয়ে ফেলেছিলাম। নইলে আপনার কাছে আজ মুখ দেখাতাম কি করে? সেদিন আপনার দেওয়া অপমান কি করে সহ্য করতাম?

আমি বললাম, এমন কেন বলছ ছুটি? যা করেছ ত করেছই, কিন্তু অন্য একজন তোমায় কি বলেছে, কি ভেবেছে, তার সমস্ত দায়িত্বটা তুমি আমার উপর চাপাচ্ছ কেন এমন করে? আমি ত তোমাকে খারাপ বলিনি। তুমি বড় হয়েছ, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, নিজের জীবনে নিজের মত করে বাঁচবার ইচ্ছা তোমার আছেই, নিজের বুদ্ধিতে তুমি যা ভাল বুঝেছ করেছ, তার জন্যে আমার কাছে ত তোমার জবাবদিহি করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, তোমার কাছে তোমার নিজের জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইবার আমি কে? যতদিন জানতাম সে অধিকার আমার আছে, ততদিন অন্য কথা ছিল। আজ যখন জানি যে তা নেই, তখন সে কৈফিয়ত চেয়ে আমি নিজেকে ছোটই বা করব কেন?

একথা ঠিক। আমি আগে বিশ্বাস করিনি। এখন যখন বিশ্বাস করেছি, নিজের চোখে দেখেছি তোমাকে, আমার ছুটির মুখ, ছুটির ভাষা সব কিছু নিজের চোখে বদলে যেতে দেখছি ও শুনছি, তখন ত আর কিছু শুধোবার নেই।

ছুটি অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, রমাদি এখন কোথায়?

কোলকাতায়।

আপনাকে সঙ্গে না নিয়েই চলে গেলেন কেন? বেশ লোক ত উনি।

আমি জবাব দিলাম না। মুখ নীচু করে রইলাম।

ছুটি বলল, পুরোনো স্ত্রীর ভালবাসা নতুন করে পাচ্ছেন বলে লজ্জিত বুঝি সুকুদা? আরে! তাতে লজ্জার কি? আপনার স্ত্রী ত আর আমার মত একটা সস্তা হ্যাংলা মেয়ে নন।

আমি বললাম, ছুটি, আমি একটু পরেই চলে যাব। তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না। অন্য কথা বল। এসব কথা ছাড়া যে-কোন কথা।

ছুটি বলল, এখন অন্য কোন কথা আর মনে আসছে না সুকুদা। আচ্ছা বলুন ত? আমার সম্বন্ধে আপনারও মত কি রমাদির মতই? আমি বড় হ্যাংলা, না সুকুদা? যেহেতু আপনাকে ভালবেসেছিলাম, যেহেতু সেই ভালবাসার জন্যে সব কিছু ছাড়তে তৈরী ছিলাম, যেহেতু সমাজের মুখে থু-থু দিয়েছিলাম, তাই-ই আপনার কাছে বড় সস্তা হয়ে গেছিলাম আমি, না? একথা সত্যিই! ঢঙ করতে না জানলে, ন্যাকামি করতে না জানলে পুরুষদের চোখে মেয়েদের কোন দামই থাকে না। তাই না? তবে এও বলব সুকুদা, আপনারও অন্যায় এটা; ভীষণ অন্যায়।

আমি ত একবারও বলি নি যে, আপনি রমাদিকে আমার জন্যে ত্যাগ করুন। রমাদিই আপনাকে ত্যাগ করেছিলেন, আপনার জীবনের সেই-সময়ের কথা আজ আর হয়ত আপনার মনে নেই। আমি নিজের ভাল চাইলে এত দিন অন্য দশটা মেয়ের মতই বহু শতাব্দীর পুরোনো বিয়ে নামক সহজ সুখের জলে জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতাম। কখনও জানতে চাইতাম না, জীবনের মানে কি? বেঁচে থাকার মানে কি?

কিন্তু আমি ত তা চাই নি। আমি ত শুধু আপনাকেই চেয়েছিলাম। শুধু লেখক সুকুমার বোসকে। ব্যারিস্টার সুকুমার বোসকেও আমি চাই নি।

যাকগে, এসব কথা। আমি চাই আপনি ও রমাদি সুখী হোন। সুখে থাকুন। ছুটির মত কত সস্তা মেয়ে আসবে আপনার জীবনে। এই গলা জড়িয়ে ধরবে, আবার পরক্ষণেই ঝুপ করে নেমে পড়ে দৌড় লাগাবে। যখনি এমন কোন মেয়ে আসবে, আপনার হয়ত আমার কথা মনে পড়বে। কি? পড়বে না?

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বেলা পড়ে এসেছিল। রোদটা বারান্দা থেকে সরে এসেছিল। ঘরের মধ্যেও শীত শীত করছিল।

আমি বললাম, আমি এবার উঠব ছুটি।

আর একটু বসবেন না?

কাঠ-কাঠ ফর্মালিটির গলায় ছুটি বলল।

আমি বললাম, নাঃ। আমার জন্যে প্যাট দাঁড়িয়ে থাকবে।

ছুটি বলল, ও, প্যাট এসেছে বুঝি? তারপরই বলল, ওকে নিয়ে এলেন না কেন?

আমি বললাম, না এনে বোধ হয় ভালই করেছি।

ছুটি বলল, তা অবশ্য ঠিক।

তারপরই বলল, আমাকে আর কিছু জিগগেস করবেন আপনি?

আমি বললাম, না। শুধু জিগগেস করব, তুমি কি সুখী হয়েছ ছুটি? আমার প্রতি তোমার মনোভাব যা তা ত জানলাম, কিন্তু তুমি শুধু আমার চোখের দিয়ে চেয়ে বল, তুমি কি সুখী হয়েছ? বল ছুটি? সত্যি করে বল?

ছুটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, সুখের কথা কি কাউকে বলা যায়? সুখ থাকে মনে মনে। এত তাড়াতাড়ি কি করে বলব? তবে ধরে নিন, সুখী হয়েছি। যা কিছু করেছিলাম এতদিন, তাও সুখের জন্যেই। রুদ্রকে আমার ঘরে থাকার অনুমতিও দিয়েছি সুখেরই জন্যে। হয়ত দুটো সুখ অন্য রকম। হয়ত সমস্ত সুখেরই রকম বিভিন্ন।

আমি বললাম, সে যাই-ই হোক। সুখী হয়েছ, সুখী থাকবে, একথা জানতে পেলেই হল। তার বেশী কিছু আমার জানার নেই তোমার কাছে।

আমি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

ছুটি বলল, এক সেকেণ্ড বসুন। বলেই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল।

কালো ফ্ল্যানেলের সুট পরে একটি হ্যাণ্ডসাম ছেলে ঘরে ঢুকল, ঢুকেই চেঁচিয়ে বলল, আরে ছুটি, জোর খবর আছে। রাঁচী ক্লাবে গেছিলাম আমাদের সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে। সেখানে কোলকাতার এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে আলাপ হল। এখানে এসেছেন হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কি কাজে। বলছিলেন, তোমার প্রিয় লেখক সুকুমার বোসের সঙ্গে নাকি ওঁর স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এলাম। গরম গরম কথা। বলেই ছেলেটি হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগল। নোংরা হাসি।

ছুটি চাপা গলায় বলল, আস্তে, আস্তে; বারান্দায় লোক আছেন। তারপর বিরক্তিতে বলল, তোমার তাতে এত উত্তেজনা কেন?

ইতিমধ্যে আমি উঠে পড়েছিলাম।

ছুটিই রুদ্রকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিল।

আমি নমস্কার করলাম।

ছুটি বলল, এই যে রুদ্র রায়, আর ইনি আমাদের কলকাতার পাড়ার দাদা; নরেশদা!

আমি চমকে চাইলাম ছুটির চোখের দিকে।

দেখলাম, ছুটির চোখ দুটো সম্পূর্ণ বদলে গেছে। একটু আগের ছুটি আর এ ছুটি এক নয়।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ছুটি রুদ্রকে বলল, নরেশদা একদিনের জন্যে কাজে এসেছিলেন কোলকাতা থেকে, দেখা করতে এসেছিলেন আমার সংগে।

রুদ্র বলল, নরেশদাকে চা-টা খাইয়েছ?

ছুটি বলল, শুধু চা-ই। বসলেন না মোটে। আজই নাকি ফিরে যাবেন।

আমি বললাম, আমি এবার আসি। আমার তাড়া আছে।

রুদ্র সাহেবী কায়দায় ঝুঁকে পড়ে হ্যান্ডসেক করল। বলল, নাইস, মীটিং; উ্য।

ছুটি বলল, আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি নরেশদাকে, তুমি ততক্ষণ জামা-কাপড় ছাড়ো। আমি আসছি এক্ষুনি।

বারান্দা পেরোতেই আমি বললাম, আমার খুব খারাপ লাগছে, তুমি আমার মিথ্যা পরিচয় দিলে কেন? আমি কি চোর না ডাকাত?

ছুটি বলল, ওসব কথা পরে হবে। আগে বলুন রমাদির সংগে আপনার মিটমাট হয়ে গেছে কিনা?

আমি ছুটির দিকে তাকালাম। কথা বললাম না কোন।

ছুটি ব্যাকুল গলায় বলল, সুকুদা, কথা বলুন।

আমাকে কোন কথা না বলতে দেখে ছুটি তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখে তাকাল।

ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

মনে হল, আর কখনও বুঝি ও আমার চোখ থেকে চোখ সরাবে না।

শেষ বিকেলের রোদে বড় বড় গাছগুলোর ছায়া মাঠময় অন্ধকারের মোটা মোটা রেখা টেনে দিয়েছিল। তার মধ্যে সিঁড়ির পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে একটা লাল-কালো কটকী শাড়ি পরে ছুটি দাঁড়িয়েছিল।

বাড়ির এ দিকটার মাঠে বড় একটা কেউ আসে না—বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ। একটা পাতা-পড়া কুয়ো, কমলা-রঙা পিটিস ঝোপ। এই-ই—সব। বাড়ির সামনের দিকের কুয়ো থেকে কে যেন জল তুলছিল। লাটাখাম্বার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল একটানা কান্নার মত।

ছুটি ওর নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল।

আমি কথা না বলে ছুটির দিকে চেয়ে রইলাম।

ওকে কবে আবার এমন নিভৃতে দেখতে পাব জানি না। ও ত এখন পরস্ত্রী: পরের শয্যাসঙ্গিনী।

ছুটি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় বলল, আপনি আমাকে কিছু বলবেন না?

আমি মাথা নাড়লাম।

ছুটি আবার বলল, আমাকে তাহলে কিছুই বলার নেই আপনার?

আমি আবারও মাথা নাড়লাম।

আমি বললাম, এবার তুমি উপরে যাও।

ছুটি নড়ল না! যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

মুখ নিচু করে বলল, ঠিক আছে।

তারপর আর কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। বড় শীত করছিল আমার। ভীষণ শীত।

ছুটি বলল, সুকুদা, আবার কবে আসবেন বলুন, সেদিন আমি একা থাকব। সেদিন আমার ঘরে অন্য কেউ থাকবে না। শুধু আমি আর আপনি। বলুন। কবে আসবেন?

আমার ঘাড়টা শক্ত হয়ে গেছিল। আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আর আসব না। আর কখনও আসব না ছুটি।

ছুটি ফুঁসিয়ে উঠে বলল, আসবেন না ত আসবেন না। আমি এই রকমই। আই অ্যাম, হোয়াট আই অ্যাম।

আমি বললাম, তোমাকে আমি ভীষণ দামী ভাবতাম, ভাবতাম তুমি আমারই; আমার একান্ত। ভাবতাম, আমার সমস্ত জীবন দিয়েও তোমার দাম দেব। তোমার দাম আমার কাছে এত ছিল। তুমি যে এত সস্তা, এত সহজে তোমাকে যে কেউ পেতে পারে, আমি কখনও ভাবিনি।

ছুটি রাগে গন্‌গন্‌ করছিল। বলল, তাহলে আসবেন না। এলে মিছিমিছি অপমানিতই হবেন। আমার দরজা আপনার জন্যে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ফেড্‌-আপ। আপনাকে

নিয়ে আমি ফেড্-আপ।

আমার মাথার মধ্যে একরাশ রক্ত দৌড়ে এল। আমিই বললাম, না অন্য-কেউ বলল, জানি না, আমার মুখ বলল, আসব না, আসব না; আসব না। আমি কখনও কোনো সস্তা মেয়ের কাছে এ জীবনে যাইনি, তাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার নেই। তারপরই আমার ব্যথিত, বিক্ষুব্ধ, অশ্রুরুদ্ধ সত্তা তার বুকের মধ্যে থেকে ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। ঘৃণা করি ছুটি।

এই ঘৃণার কথা ছুটি কি ভাবে নিল জানি না, কিন্তু এ কথা বলে ফেলে আমার নিজের বুক খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এতদিন ছুটি যে আমারই বুকের, আমারই জীবনের এক অখণ্ড অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ছিল। ওকে ঘৃণা করা যে আমার অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত গর্ব, নিজের সম্মানবোধকেই ঘৃণা করা। ছুটিকে ঘৃণা করতে কি আমি কখনও পারব? ওকে ঘৃণা করে কি বেঁচে থাকতে পারব? ওতে যে আমি একাত্ম হয়েছিলাম। ওর বুকের মধ্যে আমার যে আসন ছিল সে আসন থেকে আমায় ধুলোয় ফেলে ও যে এত অবহেলায় এত সহজে অন্য কাউকে বসাতে পারে তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? ছুটিও কি শরীরসর্বস্ব?

জানি না।

আমার ছুটিকে তাহলে আমি এতদিন চিনতে পারিনি।

আমি যদি ছুটির চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝে থাকি তাহলে হয়ত অন্য কেউও কখনও বুঝবে না। ছুটি কি নিজেকেও চিনেছে? রুদ্রর মত অনেক রুদ্রর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে অনেক হাত ঘুরে ছুটি কি তার শেষ জীবনে, শেষের দিনে, আমার সত্যি-আমি-কে চিনে আবার আমার কাছেই ফিরে আসবে, চোখের জলে; তার সমস্ত হৃদয়ের ভালোবাসার শর্তহীন সমর্পণে?

আসবে কি? কোনোদিন?

কিন্তু যদি আসেও বা, তখনও কি আমার বেলা থাকবে? এই ভালোবাসায় জরজর রোম্যাণ্টিক বোকা অনাবিল সুকুমার বোসটা কি ততদিন বেঁচে থাকবে? বেঁচে কি থাকবে তার শরীর? শরীর যদি থাকেও সে কি এই লোকটাই থাকবে তখনও তার মনে?

ছুটি আর দাঁড়াল না। নিজে কিছু বলল না, আমাকেও আর কিছুমাত্র বলার সুযোগ দিল না।

শেষ বিকেলের একটি বিধুর, ব্যথাতুর অপস্রিয়মান ছায়ার মত সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

ফিরাইলালের চওকে প্যাট দাঁড়িয়েছিল এক পায়ে।

আমার পেঁছিতে প্রায় পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গেছিল।

আমরা দুজনে হেঁটে রাতু বাস স্ট্যাণ্ডে এসে যখন একটা ট্যাক্সি নিলাম, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

রাতু বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে যেতে প্যাট অনেক কথা বলছিল। কিছু আমার কানে গেছিল, কিছু যায়নি। আমার মন তখন প্যাটের কথা শোনার জন্যে তৈরী ছিল না।

প্যাটের সব ব্যাপারে খুঁতখুঁতি। বলল, এ ট্যাক্সিটায় যাব না, এর চেহারা ভাল না।

আমি ততক্ষণে উঠে বসেছিলাম।

বললাম, উঠে এসো, চেহারা দিয়ে আর কি হবে? শেষ পর্যন্ত না ডোবালেই ত হল।

ও বলল, আমার মন সায় দিচ্ছে না।

আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। ওকে বললাম উঠে আসতে।

অনিচ্ছাসহকারে প্যাট ভিতরে উঠে এল।

প্যাটের ঝোলাটা ভর্তি হয়ে গেছিল। নানা টুকিটাকি জিনিস কিনেছে ও। রাঁচী আসা ওর বিশেষ হয়ে ওঠে না। কারণ প্রয়োজন পড়ে না। আর যখন ওর প্রয়োজন পড়ে তখন গঙ্গা বাস চলার প্রয়োজন বোধ করে না।

রাতুর রাজার বাড়ি পেরিয়ে, মান্দার পেরিয়ে, যখন বিজুপাড়ার মোড়ে এসে পেঁছিলাম

তখন সাতটা বাজে।

প্যাট বলল, চা খাওয়া যাক।

প্যাট নেমে দোকানে চা ও গরম সিঙ্গাড়া অর্ডার দিয়ে এল।

আমি ট্যাক্সি থেকে নামলামই না।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দোকানগুলো থেকে বেরোনো আলোর ফালিগুলো সেই অন্ধকারকে আরো গাঢ় করেছে। একটা দোকানের ট্রানজিস্টারে উচ্চগ্রামে হিন্দী গান বাজছে। পানের দোকানের সামনে সাইকেলের জটলা। টায়ার সারানোর দোকানের সামনে আগুন করে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন লোক।

আজকে শীতটাও বেশী। সারাদিনই কনকনে হাওয়া বইছিল। সন্ধ্যের পর থেকে সে হাওয়ায় যেন বরফ-কুচি লেগেছে। কাছেই কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়।

উঁচু সুরের গান, টুকরো-টাকরা কথা চায়ের দোকানে, পেয়ালা-পিরিচের টুং-টাং—ও সমস্ত কিছু ছাপিয়ে আমার কানে ছুটির নীচু গলা বাজছিল শুধু। ছুটির অশ্রুরুদ্ধ নরম গলা—আমাকে তাহলে কিছুই বলার নেই আপনার?

কেন এরকম হল জানি না।

আমার জীবনেই কেন এরকম হল? অন্য অনেকের সঙ্গে আমার তফাত আছে। আমি কখনও তফাতটাকে ভাল বলে মনে করিনি। কিন্তু তফাতটা যে আছে, সে কথা জেনেছি। অন্য অনেক পুরুষমানুষই জীবনটা তাঁদের কাজ, তাঁদের জীবিকার গ্লানি, তাঁদের অভাব অথবা তাঁদের প্রাচুর্য নিয়ে কাটিয়ে দেন। কেউ কেউ বা তাঁদের তাস খেলা কি ক্লাব কি হুইস্কির বোতল নিয়েই জীবনটাকে বেশ ফুরিয়ে ফেলেন।

তাঁদের অনেকের জীবনেই কখনও-সখনও কোনো 'মেয়েমানুষের' প্রয়োজন হয়। বিবাহিত স্ত্রীরাও সেই সংজ্ঞার বাইরে পড়েন না তাঁদের কাছে। অন্দরমহলে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ বোধ করলেই তাঁরা অন্দরমহলে যান কখনও। আর বাদবাকী সময় অশান্তি এড়াতে অন্দরমহলের সমস্ত জাগতিক দাবী হয় মিটিয়ে দিয়ে আর মেটাবার সামর্থ্য না থাকলে, ভুলে থেকে, নিজের বন্ধু, নিজের তাস, নিজের সখ নিয়ে আনন্দে সময় কাটান।

আমি কাজের সময় কাজ করেছি চিরদিন, হয়ত বা কাজের সময়ের পরও করেছি, কিন্তু চিরদিনই আমার সমস্ত মন একজন নারী, সর্বার্থে নারীর জন্যে কেঁদেছে। যে চেহারায়, শরীরের, যে মনে মনে অত্যন্ত মেয়ে-সুলভ, এমন একজন মেয়ের জন্যে।

আমার মানসীর জন্যে।

রমা বহুবছর হল আমার সে সংজ্ঞাকে তছনছ করে এক প্রচন্ড পুলিশী প্রভাব বিস্তার করেছে আমার উপর। আর যাই হোক, পুলিশের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কথা ভাবা যায় না।

এই মরুভূমি, তৃষ্ণা, কাঁটাগাছের জীবনে বহুদিন পর ঘুরতে ঘুরতে খুঁজতে খুঁজতে ছুটিকে পেয়েছিলাম। যার নরম শরীর, যার মিষ্ট ব্যবহার, যার বুদ্ধিমতী লজ্জাবতী মনের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ মেয়েকে, আমার মানসীকে, আমার ছায়াঘেরা ওয়েসিসকে আবিষ্কার করেছিলাম। ভেবেছিলাম, জীবনের মধ্য পথে এসে ওর হাত ধরে এক নতুন রাস্তায় আবার চলতে শুরু করব। নতুন করে, দারুণ জীবন্তভাবে আবার বাঁচতে শুরু করব।

ভেবেছিলাম আমার বিক্ষুব্ধ অশান্ত জীবন ওর সান্নিধ্যে, ওর ভালোবাসায় স্নিগ্ধ হবে।

কিন্তু জানি না, কার অভিশাপে হল, কিন্তু আমার অমৃতের পাত্র ভেঙ্গে গেল। সমস্ত জীবন একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আমি যথেষ্ট শক্ত নই, আমি কারো নরম হাতে হাত না রেখে বাঁচতে চাইনি কখনও; বাঁচতে পারবও না। অথচ আমার ইদানীং দারুণ বাঁচতে ইচ্ছা করত। প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ প্রাণবন্ততার মধ্যে বাঁচতে ইচ্ছা করত।

দোকানের ছোকরা চা ও সিঙ্গাড়া দিয়ে গেল।

চাটা খেলাম, সিঙ্গাড়া ফেরত দিলাম।

প্যাটকে মুখ বাড়িয়ে তাড়া দিলাম। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ও সিগারেট খাচ্ছিল।

প্যাট আমার এই তাড়াহুড়ো দেখে বিরক্ত হল।

পয়সা চুকিয়ে ফিরে এসে হালকা গলায় প্যাট বলল, তোমার ভাঙ্গা বাড়িতে কে তোমার

প্রতীক্ষায় বসে আছে যে এত তাড়া?

আমার জবাব দেবার কিছু ছিল না। তবু কিছু বলতে হয়। বললাম, আজ বড় ঠাণ্ডা। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুমোব।

প্যাট আবার হাসল। বলল, তাও যদি বুঝতাম বিছানায় কেউ অপেক্ষা করে আছে।

অন্য সময় বা অন্যদিন হলে কথাটা আমায় এমন করে লাগত না। কিন্তু আমি হঠাৎ চটে উঠলাম, বললাম, সবসময় কি যে ইয়ার্কি কর, ভাল লাগে না প্যাট।

প্যাট অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। মুখে বলল, সরী! তারপর বলল, তুমি আজকে ভীষণ আপসেট হয়ে রয়েছ; কিন্তু কেন? কোথায় গেছিলে তুমি রাঁচীতে? কার সঙ্গে দেখা করতে?

আমি বললাম, কোথাও না।

প্যাট আর কথা না বলে ওর উইণ্ড-চিটাবের বুকপকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ায় ট্যাক্সির মধ্যেটা অন্ধকাব করে দিয়ে নিজের মনে 'ও মাই ডার্লিং ক্লেমেনটাইন' গান ধরল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুনগুনিয়ে পুরোনো গানটা গাইতে লাগল।

ট্যাক্সিটা বেশ জোরে যাচ্ছিল।

বাইরে প্রচণ্ড শীতের রাত। লোকজন গরু-বাছুর কিছুই নেই পথে। চামার মোড় অবধি যেতে যেতে একটা কয়লার ট্রাক এবং এ-সি-সি কোম্পানীর একটা প্রাইভেট গাড়ির সঙ্গে শুধু দেখা হল।

চামার মোড়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় ঢুকে গেলাম।

আজকে এত ঠাণ্ডা যে গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন বৃষ্টির জলের মত শিশিরে ভিজে গেছিল। মাঝে মাঝে ড্রাইভার ওয়াইপার চালিয়ে জল কাটিয়ে নিচ্ছিল।

রামদাগা পেরিয়ে আমরা কিছুদূর এসেছি। এমন সময় একটা পাথুরে জাযগা পেরুনোর পরই পেছনের একটি টায়ার ফেটে গেল।

প্যাট ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

আমি প্যাটের সঙ্গে রাস্তায় নামলাম। শিশির, পাথর, ধুলো পথ সব বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মনে হল একটু একটু বৃষ্টিও হচ্ছে। পাহাড় ও পাহাড়তলির সমস্ত জঙ্গল একটা মাতাল হাড়-কাঁপানো ভিজে হাওয়ায় আকুলি-বিকুলি, উথাল-পাতাল করছে।

ড্রাইভার ও তার হেলপার চাকা বদলাতে লাগল।

প্যাট ততক্ষণ টর্চ ধরে রইল ওদের জন্যে।

আমি অন্ধকারে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হাত দুটো পকেটে ঢুকিযে চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ভীষণ কান্নাও পাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল, আমি যদি আজ একা থাকতাম তাহলে এই রাতের জঙ্গলে হু-হু করে কেঁদে আমার মনের এই আশ্চর্য অসহায়তাকে একটু হালকা করতে পারতাম। পুরুষমানুষ যে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অন্যের সামনে কাঁদতে পারে না।

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার বার বার ছুটির মুখের কথা মনে পড়ছিল। ছুটি এখন তার সঙ্গীর সঙ্গে আরামে ঘরের মধ্যে বসে কম্বল গায়ে টেনে গল্প করছে। সে যাকে একদিন অনেক ভালোবাসায় আদর করে সুকুদা বলে ডাকত তার রিনরিনে গলায়, সে যে এমন অন্ধকার হিমের রাতে চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকবে আর ছুটির কথা ভাববে সে কথা ছুটির বোধহয একবারও মনে হবে না।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল, আজ প্যাট আমাকে একা ছেড়ে দিক। ছেড়ে দিলে আমি একা একা কাঁদতে কাঁদতে, হাঁটতে হাঁটতে এই উদ্দাম শীতার্ত প্রকৃতির মধ্যে আমার হারিয়ে-যাওয়া ছুটির কথা ভাবতে ভাবতে চলে যেতাম।

আমার আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ইচ্ছা করছে, সকলের কাছ থেকে ছুটি নিতে। রমার কাছে, ছুটির কাছে, আমার ত ছুটি হয়েই গেছে এ জন্মের মত। যে-কেউ আছে, কাছে দূরে; তাদেব সকলের কাছে আমার এই নিষ্ফল কর্তব্যের ভার থেকে এই মুহূর্তে আমার ভীষণ ছুটি চাইতে ইচ্ছে করছে। সকলে ছুটি দিলে, আমি দারুণ আরামে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে ঘুম রমা কি ছুটি কি তাদের মত আর কেউই ভাঙ্গাতে পারবে না। সেই

ছুটি, সব কর্তব্য থেকেই ছুটি; চিরদিনের ছুটি। সব যন্ত্রণা, সব জ্বালা থেকে ছুটি; সে বড় আরামের ঘুম।

ট্যাক্সিটা বাসারীয়া বস্তীর কাছাকাছি অবধি বেশ ভাল এল।

তারপর একটা উৎরাই পেরুনোর পরই আলোটা কমে এল, তারপর ধীরে ধীরে গাড়িটা থেমে গেল আবার।

ড্রাইভার নামল। আমরাও নামলাম। গাড়ির বনেট খুলে দেখা গেল গাড়ির ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গেছে। স্পেয়ার ফ্যানবেল্টও সঙ্গে নেই। অতএব সারা রাতের মত এখানেই থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ড্রাইভারের হেলপার ছেলেটি, কথাবার্তা না বলে জঙ্গলের মধ্যে টর্চ জ্বেলে কাঠকুটো জড়ো করে আনল এক জায়গায়। তারপর একটা রবারের নল বের করে পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে চুষে পেট্রল বার করে কুলকুচি করে সেই পেট্রোল ফেলল কাঠকুটোর উপর। তারপর দেশলাই জ্বেলে আগুন করল।

কেউই কোনো কথা না বলে আগুনের আশপাশের ছোট-বড় পাথরে বসে আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম আমরা।

প্যাটকে দেখে মনে হল ও আমার উপর খুব চটেছে, ওর কথা অমান্য করে এই ট্যাক্সিতে এসেছিলাম বলে।

মিনিট দুয়েক পাথরে বসে থাকার পর কথা না বলে প্যাট গাড়ি থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে আনল। তারপর পাথরে বসে এক মোচড়ে বোতলের সীল করা মুখটা খুলে ফেলে ঢকঢক করে অনেকখানি হুইস্কি খেয়ে ফেলল।

আমি বললাম, আগুনের পাশে বসে এমন করে খেও না, চট করে নেশা ধরে যাবে।

প্যাট বলল, তুমি একটা আজব লোক; এত দামী জিনিস খেয়ে যদি নেশাই না হল তবে খেয়ে লাভ কি? তাছাড়া কতগুলো দিন থাকে আত্মবিস্মৃত হবার দিন। নেশা করে নিজেকে ভুলবার ও ভোলাবার দিন। কিছু মনে কোরো না মিস্টার বোস, তোমার আজ কি হয়েছে জানি না, তবে এটুকু জানি যে আজ তোমারও নেশা করার দিন। বলেই প্যাট বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

বোতলটা হাতে নিয়ে দু-এক মুহূর্ত আমি ভাবলাম।

প্যাট বলল, কি হল?

আমি জবাব না দিয়ে ঢকঢক করে প্যাটের মতই র' হুইস্কি মুখে ঢেলে দিলাম। মনে হলো বুক পেট এবং যেখান যেখান দিয়ে ভিতরে তা গড়িয়ে গেল, সব জ্বলে যেতে লাগল।

প্যাট বোতলটা ফেরত নিয়ে বলল, মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান?

বললাম, কি?

মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্ত জীবনটাকে, জীবনের সুখ-দুঃখ চাওয়া-পাওয়া সব গলিয়ে ফেলে এমনি কোনো বোতলে ঢেলে এমনি ঢকঢকিয়ে খেতে পারলে কি ভালই না হত।

আমি জবাব দিলাম না।

প্যাট টুকিটাকি নানা কথা বলছিল। কথার ফাঁকে অমনি করে হুইস্কি ঢালছিল মুখে আর যতবার নিজে ঢালছিল ততবার আমার দিকেও বোতলটা এগিয়ে দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শীত কেটে গিয়ে মাথাটা হালকা হয়ে এল।

মাথাটি হালকা হয়ে যেতেই আমার সব লজ্জা, সব মান অপমান, সব সমাজ সংস্কারের ভয় কেটে গেল। লোকভয় মুছে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমার দু চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে।

আমার জিভটা ভারী হয়ে এল। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আমি শুধু চোখের জলে যা কিছু বলার ছিল সব বলছিলাম।

আগুনের আলোয় প্যাট ও আমি এখানে আমরা প্রায় এক ঘণ্টা বসেছিলাম। আমরা পরস্পরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম, ট্যাকসির ড্রাইভার এবং তার হেলপারও আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না আর। সকল মানুষই জীবনে এমন

কোনো-না-কোনো মুহূর্তের সম্মুখীন হয় যখন তার কিছুতেই আর কিছু মাত্র যায় আসে না।

প্যাট হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলল, হে'বোস, হোয়াটস্ রং উইথ উ্য?

আমি প্যাটের কথার উত্তর দিলাম না কোনো।

প্যাট আমার কাছে উঠে এল। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে জড়ানো গলায় বলল, আই ডোণ্ট নো, হোয়াটস্ রং উইথ উ্য। বাট আই অ্যাম অফুলি সরী, আই এ্যাম ভেরী সরী ফর উ্য। বিলিভ্ মী। আই মীন ইট। বাই দা নেম অফ গড, আই মীন ইট্।

প্যাটের বিলক্ষণ নেশা হয়ে গেছিল।

আমি হাসবার চেষ্টা করলাম। জানি না, সেই হাসি কেমন দেখালো। আমার জিভ জড়িয়ে গেছিল। আমি জড়িয়ে জড়িয়ে বললাম, লেটস মেক্ আ মুভ প্যাট। চলো, আমরা যাই।

প্যাট বলল, কোথায়?

আমি বললাম, বাড়ি।

প্যাট হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, ইট সাউণ্ডস ভেরী ফানী। আই মীন দা ওয়ার্ড হোম। আই ডোণ্ট হ্যাভ ওয়ান। ডু উ্য হ্যাভ এনি?

তারপর প্যাট একটা হে'চকি তুলে বলল, ওয়েল, আই ডোন্নো—মে বী, উ্য হ্যাভ ওয়ান।

ট্যাক্সি ড্রাইভার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের যদি ছুটি করে দেন ত আমরা চলে যাই?

আমি বললাম, কোথায়?

প্যাট মধ্যে থেকে বলল কোথায় আবার? টু দেয়ার রেসপেক্টিভ হোমস্।

ড্রাইভার বলল, সারা রাত এখানে থাকলে আমরা ঠাণ্ডায় মরে যাব। তাছাড়া জংলী জানোয়ারের ভয় আছে। বাসাবীয়া বস্তীতে আমার একজন জানা লোক আছে তার ওখানে রাত কাটাব। ভোরভোর ফিরে আসব। তারপর চামার মোড় থেকে লরী ধরে রাঁচী গিয়ে ফ্যানবেল্ট নিয়ে আসব।

আমি ওদের টাকা মিটিয়ে দিলাম।

ওরা আলোয়ানে ভাল করে গা-মুড়ে, স্টার্টার হ্যাণ্ডেলটা কাঁধে ফেলে বড় রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই বাসাবীয়া বস্তীর সুঁড়ি পথে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

প্যাট বোতলটা আবার আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি আবার ঢক্‌ঢকিয়ে খেলাম।

প্যাট বাকিটা খেয়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ক্রাচে ভর করে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে ওর এক পায়ে গাড়িটার বাম্পারে একটা লাথি মারল, সজোরে। বলল, বাস্টার্ড উ্য লেট আস ডাউন।

পরক্ষণেই গাড়িটার ছাদে একটা চুমু খেয়ে বলল, নেভারদিলেস, উ্য আর বেটার দ্যান এনি বিচ্।

আমি প্যাটের বোঁচকাটা তুলে নিলাম।

প্যাট আগে আগে ক্রাচের উপর টলতে টলতে চলতে লাগল।

আমিও ওর পিছনে পিছনে ঘোরের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম।

একটু গিয়েই প্যাট দাঁড়িয়ে পড়ে, খালি বোতলটাকে পথের পাশের খাদে ছুঁড়ে মারল।

ঝনঝনিয়ে বোতলটা পাথরে পড়ে টুকরো হয়ে গেল।

আমি পিছন থেকে বললাম, কি করলে প্যাট?

প্যাট বলল, আই এ্যাম সেলিব্রেটিং। উ্য নো হোয়াট?

আমি শুধোলাম, হোয়াটস্ দা অকেশান?

প্যাট আমার দিকে ঘুরে বলল, আই এ্যাম সেলিব্রেটিং মাই লোনলিনেস্—আমার একাকীত্বর উৎসব। ডোণ্ট উ্য লাইক ইট?

প্যাটের খুব নেশা হয়েছিল।

পরক্ষণেই প্যাট আমার দিকে দৌড়ে আসতে গেল।

পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে বেঁচে গিয়ে প্যাট আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাম ব্রাদার, লেটস্ সেলিব্রেট আওয়ার লোনলিনেস।

আমাকে ছেড়ে দিতেই প্যাট ডিগবাজী খেয়ে পাথরের উপর, ভিজে ধুলোর উপর পড়ে গেল।

আমি ওকে তুলতে যেতেই দেখলাম অন্ধকারে ওর নীল চোখ দুটো, গুলি-খাওয়া বাঘিনীর

অভিশাপের আগুনে জ্বলছে।

প্যাট শুয়ে শুয়েই দাঁত কড়মড়িয়ে বলল, স্টপ্ ইট, ড্যাম ইট্। ফর গডস্ সেক্, ডোন্ট পিটী মি। আই উইল হিট্ উ্য, ইফ উ্য উইল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথাগুলো আমার কানে ঝম্‌ঝম্ করে বাজছিল।

প্যাট ঘৃণার সঙ্গে থুথু ছিটিয়ে আমাকে বলেছিল, খবরদার, আমাকে করুণা কোরো না। কখনো যদি করো, ত মার খাবে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, প্যাট কি ভাবে মাতাল অবস্থায় মাটিতে, পাথরে গড়িয়ে গড়িয়ে ওর এক পায়ে আবার উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে, আমার দিকে ফিরে মাতালের হাসি হাসল, বলল, লেটস্ গো।

কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলার পর প্যাট দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে ফিরে বলল, বুঝলে বোস্, আমার একটাই পা। তবুও আমি চলতে পারি। জানো, যে সব লোক অন্যের করুণায় ভর করে বাঁচে, তারা দশটা পা থাকলেও চলতে পারে না। আই অ্যাম হ্যাপী দ্যাট আই ক্যান ম্যানেজ উইদাউট এনিবডি'জ হেল্প।

সামনের ধুলোমাখা অন্ধকার পথটাকে ফিকে সাদা দেখাচ্ছিল। দু'পাশে মাথা উঁচু গাছ-গাছালি। আকাশময় তারা। গভীর খাদ থেকে নাইটজারের গুব্ গুব্ গুব্ গুব্ আর পেঁচার কিঁচর-কিঁচর-কিঁচর-কিচি-কিচি-কিঁচর ডাক সেই গভীর গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় অন্ধকার রাতকে এক অদ্ভুত ভৌতিক মহিমায় ভরে দিয়েছিল।

প্যাটের ক্রাচের শব্দই শুধু শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকারে প্রায় বিলুপ্ত-শরীর প্যাটকে শুধু অনুভব করা যাচ্ছিল।

হঠাৎ সামনে একটা আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কান-খাড়া করে শুনলাম, মাটিতে কিছু পড়ে যাওয়ার এবং তারপর একটা ছটফটানির আওয়াজ। গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে হরিণ যেমন ছটফট করে, তেমনি আওয়াজ।

সামনেই একটা খাড়া উৎরাই।

উৎরাই-এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই বুঝতে পেলাম যে, খাড়া উৎরাই নামবার সময় অপ্রকৃতিস্থ প্যাট আবার পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে, উঠবার চেষ্টা করছে। পড়ে যাবার সময় ওর হাতের ক্রাচ দুটো বোধহয় দূরে ছিটকে পড়েছে। মাটিতে শরীর ঘষে ঘষে দাঁতে দাঁত চেপে, ও বুঝি অন্ধকারে ওর হাতের ক্রাচ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঐখানেই অপেক্ষা করলাম আমি অনেকক্ষণ।

প্যাট নিজের পায়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবার পর আমি উৎরাইটা নামতে শুরু করলাম। শুনতে পেলাম, সমান রাস্তায় পড়েই প্যাট বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল।

এখন রাত ন'টা বাজে, এমন শীতের রাতে এই-ই অনেক রাত। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, রমা এখন কি করছে, কোথায় আছে? ও কি সীতেশের সঙ্গে আছে? সীতেশের মধ্যে ও সত্যিই কি কিছু পেয়েছে যা আমার মধ্যে পায়নি? রমা কি সুখী হয়েছে?

ছুটি এখন পর্দা-টানা ঘরে নরম বেড-লাইটের আলোয় রুদ্রর বুকে অশেষ আশ্লেষে ঘুমিয়ে আছে, পরম নিশ্চিন্তিতে; উষ্ণতায়। ছুটি? আমার ছুটিও কি সত্যিই সুখী হয়েছে?

বড় জানতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ দূর থেকে প্যাটের গলার গান ভেসে আসতে লাগল।

প্রথমে কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে পড়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতেই, কথাগুলো পরিষ্কার হল।

ওর ক্রাচ ফেলার শব্দের তালে তালে প্যাট গাইছে--ঝোঁক দিয়ে দিয়ে জড়ানো গলায়, সেই গানটি—

"Show me the way to go home, I am tired and I want to go to bed"...

পরের লাইনগুলো এবার পরিষ্কার ভেসে আসতে লাগল সেই নির্জন নিস্তব্ধ রাতের বুক মথিত করে।

"I had a little drink about an hour ago which has gone right to my head"...

যতই এগোতে লাগলাম, ততই যেন প্যাটের উদাত্ত গলার গান সেই অন্ধকার রাতের প্রতি অণুতে অণুতে ভরে যেতে লাগল। আমার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষে কোষে ছড়িয়ে যেতে লাগল। প্রতি গাছে গাছে, পাথরে পাথরে, লতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত অনুরণিত হয়ে সে গান ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

প্যাট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে গাইছিল:

"Show me the way to go home,
I am tired,
And I want to go to bed;
Show me the way to go home".

একবারও পিছনে না ফিরে প্রতি পদক্ষেপে, এই পৃথিবীর সমস্ত করুণা, করুণার ভিক্ষা ও তার প্রতিশ্রুতিকে তার এক পায়ে লাথি মেরে মেরে স্বনির্ভর ঋজু প্যাট একটা আবছা ছায়ার মত আমার আগে আগে হাঁটতে লাগল।

রাতের বনের অন্ধকারে স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্বপ্নবিলাসী একজন অভিশপ্ত একাকী ভঙ্গুর পুরুষমানুষের গায়ের গন্ধ, কোনো বিযুক্ত বড় বাঘের গায়ের গন্ধের মত শীতের রাতের বনের ভেজা হাওয়ায় আলতো হয়ে ভাসতে লাগল ঘাসে পাতায়।